TOP OF THE LIFE

সফলতাই জীবন

মোস্তাক আহ্‌মাদ

আপনার মানসিকতা উন্নত,
চিন্তা চেতনা প্রগতিশীল, মননশীল,
আপনি কর্মে বিশ্বাসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী,
উচ্চাভিলাষী, বিজয়ী হওয়ার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
এ বইটি সত্যিই আপনার জন্য

- আমাদের সবারই কোন না কোন ব্যাপারে উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্য হচ্ছে লক্ষ্যের কাছে পৌঁছানোর প্রকৃত চাবিকাঠি।
- আমরা যা অর্জন করতে চাই তার চিত্রকে দৃশ্যপটায়নের মাধ্যমে আমাদের মনের মধ্যে স্থিতি অবস্থায় আনা দরকার।
- আমাদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য যে সমস্ত বিষয়গুলো সৃজনশীল ক্ষমতাকে পরিচালিত করে সেগুলোর মধ্যে আত্মোন্নয়নমূলক বই অন্যতম পথিকৃত।

সফলতাই জীবন
TOP OF THE LIFE

মোস্তাক আহ্‌মাদ

যারা জীবনে সফল হতে চান তাদের জন্য সেরা বই
সেল্‌ফ ইম্‌প্রুভমেন্ট খ্যাত জনপ্রিয় লেখকের
সাফল্য লাভের উপায় সম্বলিত
বিখ্যাত একটি বই।

নাঈম বুক্‌স ইন্টারন্যাশনাল
৩৮ বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা।

www.pathagar.com

প্রকাশক	মোঃ শরিফুর রহমান নাঈম বুক্স ইন্টারন্যাশনাল ৩৮ বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০ ফোন ঃ ৭১১৮২৭১, ০১৮১৭-০৫৪০২৩
স্বত্ব	লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত ০১৭১২-৮২৭২৬৭
প্রকাশকাল	তৃতীয় প্রকাশ জুন-২০০৭
প্রচ্ছদ	প্রতীক গ্রাফিক্স ইন্টারন্যাশনাল
অক্ষর বিন্যাস	ইয়াশা কম্পিউটার
মুদ্রণে	প্রতীক প্রিন্ট হাউস
মূল্য	একশত টাকা মাত্র

Top of the life by Mostaque Ahmad Published by Sharifur Rahman of Nayem Books International, 38 Banglabazar (3rd Floor), Dhaka-1100. 3rd Edition : June, Two Thousand Seven. Price : Tk. 100.00 Only.

ISBN. 984-8286-142-5

একমাত্র পরিবেশক

ইছামতি প্রকাশনী

www.pathagar.com

উ/ৎ/স/র্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় বড় ভাই
তসলিমুদ্দীন আহ্‌মাদ-কে
যাঁর প্রচেষ্টায় আমি
এতদূর এসেছি।

www.pathagar.com

ভূমিকা

আপনার সাফল্যের শুরু আপনার থেকেই—শেষও আপনার থেকেই।

মোটকথা সাফল্য কামনা করছেন আপনি নিজেই। সাফল্যের পেছনে ছোটাছুটি করছেন সেও আপনি—কাজেই জীবনে সফলতা কিংবা ব্যর্থতার জন্য আপনিই দায়ী—

যাঁরা সাফল্যের প্রত্যাশা করেন—তাঁরা প্রথম থেকেই নিজেদেরকে কর্মক্ষেত্রে বিজয়ী হওয়ার জন্য একান্তভাবে তৈরী করার প্রস্তুতি গ্রহণে তৎপর হন— এই রকম ইতিবাচক প্রত্যাশার সঙ্গে যখন, ইচ্ছাশক্তি, মেধাশক্তি, কল্পনাশক্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বিজয়ী হওয়ার মনোবলের সাথে সাফল্য লাভের সংযোগ ঘটে—তখন সাফল্য লাভের পথে সীমাহীন অগ্রগতি আসে।

আপনার কর্ম প্রেরণাকে শাণিত করার সীমাহীন শক্তি, দৃঢ় মনোবল ও বিজয়ী হওয়ার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে তৈরী করতে— **সফলতাই জীবন** একটি পর্যায় ক্রমিক অনুশীলন।

এ বই আপনার বুদ্ধি বৃত্তিক শক্তিকে বৃদ্ধি করার একান্ত সাহায্যকারী। মোটকথা আপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সফল করে কীভাবে জীবনে সফল হবেন তার ব্যবহারিক জ্ঞান ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধির উপায়ের নাম **সফলতাই জীবন**।

লেখক-

জুন-২০০৭ ইং

www.pathagar.com

লেখকের কথা

সফল হতে কে না চায়। সফল হওয়ার বিশেষ বিশেষ পথ আছে। যখন আপনার ইতিবাচক মনোভাব অন্যান্য উদ্যোগ উদ্যমের সঙ্গে যুক্ত হয়— তখনই আপনি সফলতার পথযাত্রী। মানুষের মনোভাবকে ইতিবাচক করতে এবং সাফল্যের প্রত্যাশা বাড়াতে সবচেয়ে বেশী কাজ দেয় তার কল্পনাশক্তি।

সীমাহীন কল্পনাশক্তির সাহায্যে যখন আপনি আপনার সাফল্য লাভের জন্য মানসিক প্রত্যাশার মুখোমুখি হবেন— তখনই আসবে সফলতার অভিব্যক্তি।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা সুপ্ত শক্তি ও সীমাহীন ক্ষমতার উৎস আছে। খুব কম লোকই এই উৎস সম্বন্ধে সচেতন। ফলে এই উৎস আমাদের অধিকাংশের জীবনেই অব্যবহৃত থেকে যায়। এই ক্ষমতার অধিকারী আপনি নিজেও—আপনার কল্পনার মধ্যে, আপনি যেভাবে জগৎকে অনুভব করবেন বাস্তবতায় তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে।

প্রতিটি মানুষের মধ্যে কম-বেশী এমন ক্ষমতা সত্যি সত্যিই রয়েছে— তা হল— আপনি নিজেকে যেভাবে কল্পনা করে নেবেন পরে দেখবেন বাস্তবে আপনি ঠিক তাই। আপনি যদি মনে মনে ভাবেন যে, আপনি বিফল হবেন— তা-হলে আপনার অবচেতন মন এমন সব অবস্থার সৃষ্টি করবে যে, শেষ পর্যন্ত আপনি সত্যি সত্যিই বিফলই হয়েছেন। আর যদি ভাবেন আপনি অবশ্যই সফল হবেন—তবে সত্যি সত্যিই বাস্তবে আপনি সফল। আপনার এ সফলতার জন্যেই আমি **সফলতাই জীবন** বইটি লিখেছি। বইটি অবশ্যই আপনাকে সফলতার জন্য একান্তভাবে সাহায্য করবে। এই কামনাই করি।

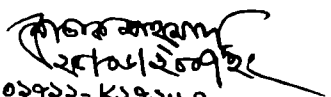

www.pathagar.com

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	
সফলতাই জীবন	১৩
লক্ষ্য নির্ধারণ করে লক্ষ্যে পৌছানোই সফলতার হাতছানি (Setting and achieving your goals to success)	২২
নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলুন	২৮
সাফল্য লাভের অভিপ্রায়	৩৩
বাস্তব জ্ঞানের জন্য ভ্রমণ	৫০
সময়কে কাজে লাগানোর কৌশল	৫৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	
সময় শ্রম ও কাজের গুরুত্ব (Time and work are most Important)	৬৩
কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ	৬৫
মানুষের জন্য মুক্তির পথ আছেই	৭১

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করুন	৭২
সময়ের গুরুত্ব ও কাজের প্রতি মনোযোগ দিন	৭৬
কীভাবে সম্মানিত হওয়া যায়	৭৯
বিজয়ী হওয়ার মনোবল	৮২
বই জ্ঞান ও জ্ঞানী	৮৭
সৌভাগ্যের জন্ম দিন	৯০
তৃতীয় অধ্যায়	
সফলতার সহজ উপায়	৯৪
সৃষ্টিশীলতাই প্রতিভা	৯৯
আলোকিত জীবনের সন্ধান করুন	১০৩
আত্ম-বিশ্লেষণ করুন	১০৬
প্রতিভা বিকাশের অনুশীলন	১০৮
পড়া মনে রাখার সহজ কৌশল	১০৯
সময় ও জীবনের কথা	১১২
পরিকল্পিত জীবনের কথা	১১৬
সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব	১১৮
ব্যক্তিত্ব ও মানবতার বিকাশ	১২২
নিজেকে উপস্থাপন করার দক্ষতা অর্জন	১২৬
ব্যক্তিত্বের বিকাশে মুক্ত বুদ্ধির অনুশীলন	১৩২

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

চতুর্থ অধ্যায়

বিজ্ঞানের যৌক্তিক ব্যাখ্যা	১৩৭
স্বল্পবুদ্ধি থাকার কারণ কি?	১৩৮
বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে কি আই-কিউ নির্ভুলভাবে বের করা যায়?	১৪০
'জড়বুদ্ধি বলতে কাদের বোঝায়?'	১৪১
আমরা স্বপ্ন দেখি কেন?	১৪২
শিশুরা দেয়ালা করে কেন?	১৪৩
ভোরের স্বপ্ন কি সত্যি হয়?	১৪৩
শারীরিক ও মানসিক অবস্থিতির সময়ে লোক বেশি স্বপ্ন দেখে কেন?	১৪৪
সদ্যোজাত শিশুদের কি বোধবুদ্ধি থাকে?	১৪৫
শিশুরা বড়দের অনুকরণ করে কেন?	১৪৬
শিশুর মুখে ভাষা ফোটে কীভাবে?	১৪৭
কোন্ বৈশিষ্ট্যের ফলে মানুষ কথা বলতে পারে?	১৪৮
সব মানুষের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ কি এক রকম?	১৪৯
এক আদর্শ মহা পুরুষের কথা	১৫০

www.pathagar.com

Chapter One

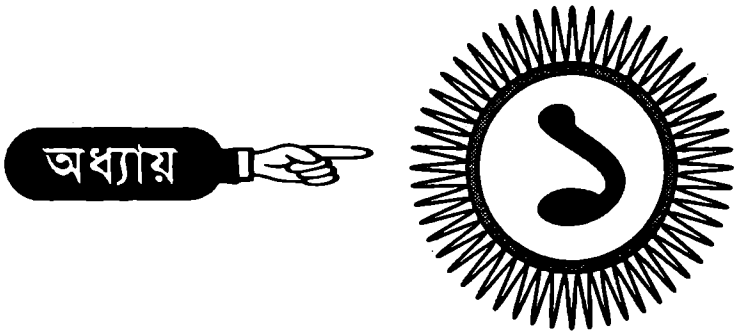

- ☆ সফলতাই জীবন
- ☆ লক্ষ্য নির্ধারণ করে লক্ষ্যে পৌঁছানোই সফলতার হাতছানি **(Setting and achieving your goals to success)**
- ☆ নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলুন
- ☆ সাফল্য লাভের অভিপ্রায়
- ☆ বাস্তব জ্ঞানের জন্য ভ্রমণ
- ☆ সময়কে কাজে লাগানোর কৌশল

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সফলতাই জীবন

সফলতাই জীবন। ব্যর্থতাকে কেউ মেনে নিতে চান না; তবুও মানুষের জীবনে বার বার ব্যর্থতা নেমে আসে। আর এ ব্যর্থতার জন্য ব্যক্তিই দায়ী। কেননা, পৃথিবীতে কারণ ব্যতীত কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ঘটনার পেছনেও নানা কারণ রয়েছে।

ঘরে বসে আছেন আলোর প্রয়োজন; কিন্তু মুখে মুখে বললেই কি আলো পাওয়া যাবে? অথবা মনে মনে আলোর প্রয়োজন অনুভব করছেন তাতেও আলো পাবেন না। আলো পেতে হলে ইলেকট্রিক বোর্ডের কাছে যেতে হবে, তারপর যদি সুইচ অন করেন তবেই বাতি জ্বলে উঠবে। এবার আপনি আলো পেয়ে গেলেন। অনুরূপ যেভাবে আলো পেয়ে গেলেন সেভাবেই সফলতাকে আলিঙ্গন করতে হবে তবেই আপনার জীবনে সফলতা আসবে।

আপনি যেমন আলো পেতে সুইচ বোর্ডের কাছে গেলেন এবং সুইচ অন করলেন ঠিক তেমনিভাবে জীবনে সফল হওয়ার জন্য সফলতার উপায়ের সন্ধান করলেই আপনি সফল।

জীবনে সফল কিংবা বিজয়ী হওয়ার মনোবাসনা নেই এমন একটি মানুষও পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ জগতে সবাই চায় সফল হতে, শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে কিন্তু জীবনে সফল হওয়ার জন্য চাই পরিকল্পনা। বাস্তব পদক্ষেপ, কঠোর সাধনা ও অধ্যবসায়। আমরা অনেকেই উপরোক্ত গুণগুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করি না। যে কারণে আমাদের চলার পথে ব্যর্থতার সাক্ষাত পাই। জীবনকে নয়তো ভাগ্যকে দোষারোপ করি। এগুলো আমাদের অজ্ঞতার জন্যেই হয়ে থাকে।

আপনার জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা যে আপনার হাতে এ পরম সত্য কথাটা যখন আপনার মাথায় চেপে বসবে; তখন কীভাবে জীবনে সফল হওয়া যায়। এর একটা সহজ পথ আপনি অবশ্যই খুঁজে পাবেন।

মানব জীবনের প্রতিটি কাজের পেছনে আত্ম-বিশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম। আত্ম-বিশ্বাস ব্যতীত কেউ-ই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। তাই আপনি আপনার কর্মের প্রতি কতটুকু আস্থাশীল। আপনার আত্ম-বিশ্বাস আপনাকে কতটুকু

www.pathagar.com

কর্মোদ্দীপনা দান করেছে। তা আগে বুঝে নিন। জেনে নিন, আত্মোপলব্ধি থেকেই আত্ম-বিশ্বাসের জন্ম হয়।

ভেবে-চিন্তে কাজ করুন। কোনো কিছু না ভেবে অন্ধকারের যাত্রী হয়ে অন্ধের মত পথ চলবেন না, আপনার সামান্য একটু ভুলের জন্য, ভুল সিদ্ধান্তের জন্য; জীবন থেকে অনেকগুলো বছর ঝরে যেতে পারে। তাই ভেবে চিন্তে কাজ করুন।

চিন্তাও এক প্রকার শক্তি। যাকে বলে চিন্তাশক্তি। সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করে আপনি যে উপায় খুঁজে পাবেন। তা আপনাকে সঠিকভাবে পথ চলতে সাহায্য করবে। মনে মনে নিশ্চিতভাবেই জেনে নিন, সবকিছুই নির্ভর করে সঠিক চিন্তা-ভাবনা করে যে ধারণা ও অনুভূতির সন্ধান লাভ হয় তার মধ্যদিয়ে নিজেকে দক্ষভাবে পরিচালনা করার উপর। তার পরেই আসে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে আত্মনিয়োগের অঙ্গীকার।

জীবন মানেই কাজ। আর এ কাজের জন্যেই আসে সফলতা। যারা সীমাহীন কর্মোদ্দীপনার সাথে কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তাদের জন্যে সফলতাই জীবন। প্রতিটি মানুষের ব্যস্ত থাকার উপায় হচ্ছে কাজ। কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকুন নয়তো নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। তাহলে দুশ্চিন্তা ও হতাশা কখনোই আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না। জীবনে যতটুকু সময় পাবেন কাজে ব্যয় করুন। ভাগ্য আপনাকে গড়বে না, বরং আপনি নিজেই ভাগ্যের মহা স্রষ্টা।

উপরোক্ত কথাটি মহা গ্রন্থ আল-কোরআনের। আপনার সাফল্য ও ব্যর্থতার ভাগীদার আপনি নিজেই।

হয়তো আপনারই অবজ্ঞা ও অলসতার দরুন জীবনে ব্যর্থতা নেমে এসেছে। এখন আপনার মুক্তির উপায়ের জন্য চাই কাজ। কঠোর পরিশ্রম, অনুশীলন, সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ। কীভাবে কাজ করলে আপনার সফলতার দিকটি দ্রুতভাবে সম্পন্ন হবে, কীভাবে সফলতার বীজ বপন হবে, আপনি অবশ্যই তা বুঝতে সক্ষম হবেন। যদি সঠিকভাবে (Action plan) কর্ম-পন্থা গ্রহণ করতে পারেন। প্রখ্যাত লেখক গ্রেনভিল ক্লিসার, তাঁর সফল হওয়ার সহজ উপায় বইটিতে এই উপদেশ দিয়েছেন যে, জীবনে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে একটা পরিকল্পনা ছকে নিন।

কিছু সময় ঘুমের জন্য, কিছু সময় খেলার জন্য, কিছু সময় বিনোদনের জন্য, আর বাকী সময় কাজের জন্য ব্যয় করুন। তাঁর উপদেশ হল ছক বা পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে চলুন, অলসতা করবেন না, সফলতা আপনার জীবনে আসবেই।

আমরা কখন কি কাজ করব প্রতিদিনের একটা ছক তৈরী করি। ছক অনুযায়ী অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করি। একদিন এই অভ্যাসই জীবনে কাজের সাথে মিশে যাবে। তখন মনে হবে কাজ আপনার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

www.pathagar.com

জীবনে সফল হওয়ার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করুন। কাজে যোগ দিন। জীবনে যারা সফল হয়েছেন তাদের ইতিহাস জেনে নিন।

সাফল্যের শুভাকাঙ্ক্ষীরা নিরন্তর সময়ের প্রান্তর হতে মণি-মুক্তা কুড়িয়ে নিচ্ছেন। সফল কর্মীরাও বসে নেই। কিন্তু আপনি সুযোগের অপেক্ষায়, সময় নেই, পারবেন না বলে দারিদ্র্যের মিথ্যে অজুহাতে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার কর্ম-প্রেরণার প্রয়োজন। কাজ করুন, সব অবস্থায়, সকল সময়; যে কোনো কাজই হোক না কেন তা যদি আপনার জীবনের উন্নতিতে একান্ত সহায়ক হয় তবেই তো আপনার সফলতা। প্রথম প্রথম হয়তো কাজে বাধা আসবে তাই বলে নিরাশ হলে চলবেনা। অসীম আগ্রহের সাথে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

আপনি একজন কর্মী। আপনার ধৈর্য্যের প্রয়োজন। কর্মের সাথে ধৈর্য্যের সংযোগ না হলে কর্মফল ভাল হয় না। পৃথিবীর সব সাফল্যের মূলে যেমন কঠোর শ্রমের হাতছানি তেমনি প্রতিভা, যশ, খ্যাতি সবকিছুর মূলে রয়েছে ধৈর্য্যের পরশ। কর্ম-প্রেরণাকে সক্রিয় করার প্রক্রিয়ায়ও ধৈর্য্যের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

এক পণ্ডিত বলতেন—**"যে ব্যক্তি ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা করে সে-ই সফল হতে পারে।"** কাজের ধারাতে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। পাদরী উইলিয়াম ক্যারি যেমন উদ্যমশীল কর্মী পুরুষ ছিলেন তেমনি তিনি তার কর্ম সম্বন্ধে গভীর আস্থা ও সফলতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

এক সময় তাকে এক ব্যক্তি মুচির ছেলে বলে উপহাস করেছিল। ক্যারি বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে উত্তর করলেন—এতে আমার লজ্জার কিছু নেই। কারণ মুচি হচ্ছে পেশাগতভাবে একটা কাজ। কাজে লজ্জাবোধ হবে কেন। লজ্জাবোধ হবে চুরি, মিথ্যায়, ঘুষে ও আত্মসাতে। কাজ করবেন। কাজে লোকজনকে অনুপ্রাণিত করে কল্যাণের জন্য উপযোগী করে তুলবেন—এটাই মানব কল্যাণের কাজ। এক প্রকার সেবা দান।

ইউলিয়াম ক্যারি ছোটবেলায় একবার গাছে উঠতে যেয়ে পা ফসকে পড়ে যান; ফলে পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। কয়েক মাস পরে বিছানা থেকে উঠে পুনরায় সেই একই গাছে উঠলেন—তবে ছাড়লেন। এখানেই মহাপুরুষদের জীবনের বিশেষত্ব। দার্শনিক ইয়ং বলতেন, "মানুষ যা ইচ্ছা করে তা সে পায়।" এ প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প হল। একবার তিনি এক বন্ধুর সঙ্গে ঘোড়ায় চলে যাচ্ছিলেন। এর আগে তিনি কখনও ঘোড়ায় চড়েননি, সেই বারই প্রথম। বন্ধু খুব ভাল ঘোড় সোয়ার, তিনি অবাধে একটি উঁচু বেড়া পার হয়ে গেলেন। তাই দেখে ইয়ং-এরও ইচ্ছা হল— বেড়া টপকে যেতে। যে কোনো কালে ঘোড়ায় চড়েনি তার পক্ষে কাজটা সহজ নয়। প্রথমেই লাফ দিতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। ক্ষুণ্ন না হয়ে দ্বিতীয়বার চেষ্টা

www.pathagar.com

করলেন। এবারে ঘোড়া থেকে পড়লেন না ঠিক, কিন্তু ঘোড়ার গলা জড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। আবার চেষ্টা করলেন। এবার অবশ্য কৃতকার্য হলেন।

বিশ বছর পরিশ্রম করে নিউটন যে বইখানি লেখেন, তাঁর প্রিয় কুকুর একটি জ্বলন্ত বাতি ফেলে বইখানি মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই করে দিয়েছিল। দীর্ঘ বিশ বছর তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমলব্ধ চিন্তা-চেতনা হঠাৎ সর্বনাশ হয়ে গেল। মহাবিজ্ঞানী নিউটনের এতে খুব দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য সহিষ্ণুতা। তিনি দমে গেলেন না। নিরাশার রাহুমুক্ত হয়ে আবার সেই লেখা আরম্ভ করলেন এবং পুনরায় বই লেখার কাজ শেষ করলেন।

গভীর চেতনাবোধ

আপনার চেতনাকে শাণিত করার শিক্ষাই আমি দিতে চাই। কর্ম-প্রেরণার ধারা যখন আপনার মনে কাজ করবে তখন চেতনায় আসবে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের উন্নয়ন, আত্মোন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধান, দক্ষতা বৃদ্ধি, দক্ষতা অর্জন, শিক্ষা গ্রহণ ও সর্বোপরি নিজেকে যে কোনো পেশায় মানিয়ে নিয়ে উন্নতি করতে শেখা। এ উপদেশগুলো আমি আপনাকে দিচ্ছি। মহাজ্ঞানী সক্রেটিস তো এ কাজটিই করতেন। প্রাচীন এথেন্সবাসী এবং যুবকদেরকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতেন, জ্ঞানের কথা শোনাতেন, জীবনে সফল হওয়ার উপায় বলে দিতেন। তখনকার স্বার্থবাদী মিথ্যে পাদ্রীদের আত্মসাৎ ও ছল-চাতুরী করে যুবকদেরকে জ্ঞানের আলো থেকে দূরে রাখার বিষয়টি সক্রেটিস মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পাদ্রীদের ধারণা ছিল যতদিন প্রাচীন গ্রীকরা রাষ্ট্র, ধর্ম, জীবন ও জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে ততদিন পর্যন্ত তারা তাদের উপর স্বার্থবাদী রাজত্ব বিস্তারে সক্ষম হবে। কিন্তু তাদের এ আশা পূরণ হল না। জন্ম নিলেন মহাজ্ঞানী সক্রেটিস। যিনি হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর জ্ঞান-বিজ্ঞান রপ্ত করে মহাদর্শনের সন্ধান লাভ করেছিলেন। সক্রেটিসের শিক্ষাগুরু হযরত সোলায়মান (আঃ) ছিলেন ইলাহী জ্ঞানের সীমাহীন ভাণ্ডারস্বরূপ; আর তাঁর দর্শন রপ্ত করেই বিশ্ব নন্দিত দার্শনিক সক্রেটিস।

গ্রীক স্বার্থান্বেসীদের দূর্গ ভাঙ্গতে সক্রেটিস যুবকদেরকে বৈপ্লবিক চেতনায় শাণিত করে মহৎ কর্মের ভিত্তিতে সত্য দর্শনের প্রচার করতে লাগলেন। বললেন, "পাদ্রীদের নিয়ন্ত্রিত জীবন ব্যবস্থাই আসল ব্যবস্থা নয় বরঙ স্রষ্টার উপলব্ধি ও নিজেকে জানা এবং সৃষ্টিকে বুঝতে পারার জ্ঞান-বিজ্ঞান রং করাই মহা সত্যের জীবন ব্যবস্থা। তিনি বিপ্লবি চেতনার মৌলিক ভিত্তির প্রবক্তা।

কাজ করতে বাধা আসবেই। ব্যর্থতার কথা ভেবে হাল ছেড়ে দেওয়াটা কাপুরুষের কাজ। সক্রেটিসের মাত্র একটি দর্শনকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যিনি বিশ্ব সেরা জ্ঞানী বলে পরিচিতি লাভ করেছেন তিনি হলেন প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল। অ্যারিস্টটল প্লেটোর শিষ্য হলেও প্লেটো সক্রেটিসের শিষ্য। সুতরাং বলতে হয় উভয়েই সক্রেটিসের শিষ্য। অ্যারিস্টটল প্লেটোর কাছ থেকে সক্রেটিসের

www.pathagar.com

সেই নো দাই-সেল্ফ-এর মাহত্ব বুঝতে গিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে উপলব্ধির জ্ঞান লাভ করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে অ্যারিস্টটলের হাত পড়েনি। অ্যারিস্টটল একাধারে রাষ্ট্র বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের জনক। সক্রেটিস তাদের মাঝে যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে গেছেন তাই তো আজ সারা বিশ্বের গবেষক, দার্শনিক, জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মাঝে নো দাই-সেল্ফ নামে আত্মজিজ্ঞাসার যোগান দিয়ে আসছে।

মহাজ্ঞানী সক্রেটিসকেও সত্য প্রচারের দায়ে, বিপ্লব ঘটানোর অপরাধে হ্যামলেক নামক বিষপানে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জেনে নিন আমার লেখা 'হাউ টু সাক্সীড্ ইন লাইফ' নামের বইটি থেকে অথবা পড়ুন সাফল্যের যাদু নামের বইটি।

কষ্ট না করলে পৃথিবীতে সুখের সন্ধান পাওয়ার আশা হয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

কারলাইল ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস লিখেন অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা; পরে তা বন্ধুসুলভ এক প্রতিবেশী সাহিত্যিককে পড়তে দেন। বন্ধু মহোদয় বইখানি ভুলবশত বাড়ীর সামনের বিশ্রাম বেদীতে ফেলে রাখেন। ফলে বইখানি হারিয়ে যায়। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল বাড়ীর চাকরানী বাজে কাগজ মনে করে মহা মূল্যবান বইখানি পুড়িয়ে ফেলেছেন।

কারলাইল যখন এই ভয়ানক সংবাদ শুনলেন, তখন তাঁর মানসিক অবস্থাটা বর্ণনা করার মত নয়, তবুও তার এই পুস্তক নতুন করে লিখতে অনেক বছর সাধনা ও কষ্ট পোহাতে হয়েছিল তা বলার নয়। না লিখেও উপায় ছিল না। যে কর্মোদ্দীপনা তাকে তাড়া করছে সেই ফরাসী বিপ্লব তার গ্রন্থপুঞ্জে-পুঞ্জিভূত থাকতেই হবে। কঠিন অধ্যবসায়, ধীরতা এবং সীমাহীন চেতনা শক্তিতে তিনি আবার সেই বই লিখতে সক্ষম হলেন। জর্জ স্টিফেনশন তাঁর ছেলেদের বলতেন—"তোমাদের আর কী বলবো! আমাকে অনুসরণ কর—আঘাতের পর আঘাত কর।"

জেমস্ ওয়াট ত্রিশ বছরের দীর্ঘ সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করে বৈদ্যুতিক বাল্ব উপহার দিয়ে বিশ্ববাসীকে ঋণী করে গেছেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম কম কষ্টের নয়। আপনি কতটুকু কষ্ট সহ্য করেছেন।

কমতি-দি-বাফুন দেখিয়েছেন একাগ্রতার সাথে পরিশ্রম করলে আমরা কত বড় হতে পারি। তিনি বলতেন, "প্রতিভা মানে ধৈর্য্য ও পরিশ্রম।" বাফুনের স্মরণ শক্তি ছিল না, কিন্তু সাংসারিক অবস্থা খুব ভালো ছিল। ফলে তার স্বভাবে আলস্য ভাব ঢুকেছিল। অনেক চিন্তা করেও তিনি এই রোগ হতে অব্যাহতি না পেয়ে পথ ভোলা হয়ে শেষকালে ভৃত্য যোসেফকে বলেন—"কাল হতে সকাল সকাল তুমি আমায়

www.pathagar.com

উঠিয়ে দেবে।" বাফুন দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকতো—এমনকি কোনো কোনো সময়ে বিকেলে তার ঘুম ভাঙ্গতো। ভৃত্যকে জানিয়ে দিলেন তাকে সকাল সকাল জাগিয়ে দিলে প্রত্যেক দিনের জন্য এক টাকা করে পুরস্কার দেবেন। পরদিন বেচারা যোসেফ প্রভুকে উঠাতে গিয়ে দমাদম কিল-ঘুষি খেয়ে ফিরে এল। বাফুন যখন দুপুর বেলা যোসেফকে তার কর্তব্য কাজের অবহেলার জন্য খুব তিরস্কার করলেন—তখন ভৃত্য মনে মনে পণ করলো, পরের দিন প্রভুকে যেমন করেই হোক উঠাবেনই। সকাল বেলা বিছানার কাছে যেয়ে যোসেফ আগের দিনের মত প্রভুকে উঠাতে চেষ্টা করলো, ঘুমের ঘোরে প্রভু ভৃত্যকে নানা রকম গালি ছুড়লেন। বললেন, আমার অসুখ করছে, রাত্রিতে ভালো ঘুম হয়নি। যাও বিরক্ত কর না। প্রভুর কথা অমান্য করলে চাকরি থাকবে না ইত্যাদি বলতে লাগলেন। যোসেফ ফিরে এলেন। বাফুন আবার যোসেফকে তার আসল হুকুম পালন হয় নাই বলে তিরস্কার করলেন। পরদিন যোসেফ প্রভুকে উঠাতে গিয়ে কোনো কথাই শুনল না। প্রভু কিছুতেই ঘুম থেকে উঠবেন না। যোসেফও নাছোড়বান্দা। বালতি ভর্তি পানি প্রভুর বিছানার উপর যখন ঢেলে দিল তখন বাফুনকে বাধ্য হয়ে আরাম ছেড়ে উঠতে হল। যোসেফ পুরস্কার লাভ করল। এরপর প্রত্যহ নয় ঘণ্টা করে বাফুন একাধারে চল্লিশ বছর ধরে পরিশ্রম করেন। একদিনও তিনি কোনো সময় নষ্ট করেননি। এভাবে দীর্ঘ চল্লিশ বছর জ্ঞানার্জন করেন। পরে এমন হল যে পরিশ্রম না করে তিনি থাকতে পারতেন না। সেটা তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তাঁর জীবন রচয়িতা এভাবে জীবনী লিখেছেন—খেলার চেয়ে কাজই তার কাছে বেশী আমোদের ছিল। অনবরত পড়তে তাঁর কোনো কষ্টই হত না। এক একখানা বই তিনি বহুবার করে লিখেছেন— বদলিয়েছেন। পুস্তক প্রণয়নের ইতিহাসে কোনো সাহিত্যিক বোধ হয় বাফুনের মত এত ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের নজীর রেখে যেতে পারেননি। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ভেবে চিন্তে তিনি একখানি বই লিখেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এতেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। একবার, দু'বার, তিনবার নয় তিনি এগার বার বইখানি লিখেছেন। বাফুনই পৃথিবীতে একমাত্র বই লিখায় ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সীমাহীন নজীর রেখে গেছেন। পীড়ার মধ্যে থেকেও তিনি বড় বড় বই লিখেছেন। কাজে থাকাই ছিল তাঁর আনন্দ ও শান্তি।

স্যার ওয়াল্টার স্কট সীমাহীন পরিশ্রমী ছিলেন। অফিসের কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জ্ঞানান্বেষণ ও সাহিত্য সেবা করতেন। অফিসের সব কাজ করার পরও তিনি এ কাজ করতেন। ভোর পাঁচটার সময় উঠে নিজেই চুলো ধরাতেন, একটু খেয়ে বই-এর বোঝা সামনে নিয়ে সাহিত্য সেবায় বসে যেতেন। ছেলে-পুলে, বৌ-ঝিরা ঘুম

www.pathagar.com

হতে উঠবার অনেক আগে তিনি অনেক কাজ করে ফেলতেন। বহু বছর পরিশ্রম করে, বহু যশ-খ্যাতি অর্জন করে গভীর জ্ঞানার্জন সত্ত্বেও স্কট বলতেন— "আমি আমার অজ্ঞতার কথা মনে করে লজ্জিত না হয়ে পারি না।"

আপনার জীবন সাইকেল (চক্র)-টাই একটা প্রতিযোগিতা। আমি জ্ঞানের কথা বললে আপনার ধৈর্য্য চ্যুতি ঘটবে নাতো। আমাদের দেশে আসলে শিখতে চাওয়া লোকের বড় অভাব। কিন্তু লাভের অঙ্কটা নেওয়ার লোকের কোনো অভাব নেই। আমি ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের জন্য, বিশ্ব বিষয়ে জ্ঞান দানের জন্য এবং শেখা ও জানার আগ্রহ বৃদ্ধিতে সহায়ক এমন একখানি বই দীর্ঘদিন গবেষণা করে লিখেছি যার নাম—**"হাউ টু সাক্সীড্ ইন লাইফ।"** অথচ সে বই আজ প্রায় সকল নেটওয়ার্ক কর্মীদের হাতে। বইটির বাংলা নাম হলো কীভাবে জীবনে সফল হওয়া যায়। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা আজ কীভাবে পরীক্ষায় পাস করা যায়। রেজাল্ট ভাল করা যায় তাই নিয়ে ব্যস্ত। কীভাবে জ্ঞানার্জন করা যায় এবং জীবনে সফল হওয়া যায় এ ধরনের বই পড়ার অভ্যাস তাদের নেই বলেই কেউ ডিগ্রী পাস, এম. এ. ও বিবিএ-এমবিএ পাস করার পরও বছরের পর বছর ধরে চাকরীর পেছনে ফাইল নিয়ে ছোটাছুটি করছে। অথচ বই পড়ে যে জীবনকে জানতে, বুঝতে, অনুধাবন করতে পারা যায়। কীভাবে জীবনে সফল হওয়া যায় এ কথা তারা মানতে রাজী নন। বইটি বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে লেখা হলেও তারা গল্প, উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত। ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও সকল পেশাজীবী মানুষের আত্মোন্নয়নের শ্রেষ্ঠ সঙ্গী এই বই। বিদেশে এসব গবেষণা ও জীবনধর্মী বইয়ের সীমাহীন কদর আছে বলেই—তারা পড়ালেখা শেষ করে বছরের পর বছর ফাইল নিয়ে ছোটাছুটি করে সময় নষ্ট করতে একটুও পছন্দ করেন না। তাদের চাই কাজ। সে যে কোনো কাজই হোক না কেন। কাজ তো কাজই। কাজ করার মাঝে কোনো অমর্যাদা বোধ নেই। বরং কাজ না করে অপদার্থের মত ঘুরে ঘুরে সম্মান বাড়বে এমন কাজের পেছনে সময় খোয়ানোর নামই লজ্জাজনক। আমি আত্মোন্নয়নমূলক বই লিখছি এ কথা শুনে এক প্রতিপক্ষ দাঁত বের করে হাসল। কিছুদিন পরে সে যেটুকু লেখা হয়েছে পাণ্ডুলিপিটা পড়ে ফোন করে অনুতপ্ত হল যে, সে এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করল। মোবাইল করে জানালো যে সে ভুল বুঝেছিল। কেবল আমার বইটি থেকে সেদিনই বুঝলো আত্মোন্নয়ন আসলে কি। কেন আত্মোন্নয়ন দরকার। তাই না বুঝে অনেকেই অনেক মন্তব্য করবেন। সেজন্য আপনার কাজ বন্ধ রাখবেন না বরং আরও বেশী মনোযোগী হোন। বুঝিয়ে দিন মন্তব্য করে আপনাকে কাজ থেকে দূরে রাখা যাবে না। আপনি এতে আরও আগ্রহী হয়েছেন। দেখবেন বিরুদ্ধবাদীরা হার মেনেছে। আপনার জয় হয়েছে। কারো

www.pathagar.com

মন্তব্যে তো আমার লেখা বন্ধ হয়নি। আপনার কাজ বন্ধ হবে কেন? প্রথম প্রথম যখন আমি লিখতাম তখন কতজন কত কথা বলতো। কত উপহাস করতো। কেউ আমার বই বাজারে ছাপতে চাইবে না। কেন লেখা-লেখি করে বাজে সময় নষ্ট করছিস। ভুয়া লেখক ইত্যাদি ইত্যাদি। কত লেখক দেখলাম। এসব শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হওয়ার কথা। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আমি তাদের দেখিয়ে দেবো। আমাকে পরে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। যখন দেখলাম পঞ্চম বই 'সাকসেস ফর অব অল' অর্থাৎ সাফল্য সবার জন্য প্রকাশ হবার পর নীলক্ষেত থেকে আমার সামনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মণ্ডলীসহ প্রায় অনেক শিক্ষার্থীই কিনেছেন তখন আরও সীমাহীন শক্তি খুঁজে পেলাম। টি. এস. সি-তে গিয়ে দেখলাম এক নাট্যকর্মীর হাতে এ বই। তার শিক্ষক নাকি বইটি কিনে পড়তে বলেছেন। আমি যে লেখক কেউ তো ব্যক্তি হিসেবে আমাকে জানেন না। এমনকি আমার ক্লাশমেট ছাত্র বন্ধুদের হাতে আমার বই থাকলেও আমি পরিচয় দেইনি যে আমিই সেই মোস্তাক আহ্‌মাদ। তাহলে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়তো বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবেন যে, তিনি যে বইটি কিনতে বলেছেন সেটির লেখক কিনা তার ছাত্রের ক্লাশমেট। আমার এ রহস্যের জাল ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ততোদিনে বন্ধুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী শেষ করে কর্ম জীবনে চলে গেছেন। আর আমি এখনও লিখে যাচ্ছি। আমার এ লেখা পাঠকের সাফল্যের জন্যেই। কত চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আমি আজ আমার গন্তব্যে অটল ও অবিচল। আপনাদেরকেও আমি সফল হিসেবে দেখতে চাই।

আপনার মনের অবচেতন বৃত্তিকে জাগিয়ে তুলুন, ভীতি ও সংশয় দূর করুন। সাফল্যের জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে তৈরী করুন। প্রয়োজনে দ্রুত সাফল্য লাভে কার্যকর পদক্ষেপের উপযোগী নিম্নোক্ত বইগুলো ধারাবাহিকভাবে স্টাডি করুন। মনে রাখবেন জীবনে সফলতার জন্য চাই অভিজ্ঞতা, মেধা, শ্রম ও পদক্ষেপ এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হল গভীর জ্ঞান। সেজন্য চাই— Willingness to learn অর্থাৎ শেখার আগ্রহ, জানার আগ্রহ, বুঝার আগ্রহ এবং সফল হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এ ব্যাপারে আপনার সাহায্যকারী নির্ভরযোগ্য সেল্‌ফ ইমপ্রুভমেন্ট খ্যাত বই—

- ❑ হাউ টু সাক্‌সীড্ ইন লাইফ
  How to Succeed in Lifte
  কীভাবে জীবনে সফল হওয়া যায়
- ❑ দ্য ম্যাজিক অব সাক্‌সেস
  The Magic of Success
  সাফল্যের যাদু

www.pathagar.com

- লাইফ ইজ দ্য রেস
  Life is The Race
  জীবনটাই প্রতিযোগিতা
- জীবন মানেই কাজ
  Life is on Duty

উপরোক্ত বইগুলো পড়ুন। উল্লেখ্য যে এই বইটি যেখানে পাবেন উপরোক্ত প্রত্যেকটি বই-ই সেখানে পাবেন। কাজেই বই সংগ্রহ করতে, পড়তে বিশ্ব বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে ভুলে যাবেন না। তাহলে আপনিই পিছিয়ে পড়বেন। যে বই বিশ্ব বিষয়ে জ্ঞান দেবে। নিজেকে সাফল্যের জন্য সর্বদাই ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী করে তুলবে। নিজের জীবনের অতীতের ভুলগুলো শোধরানোর উপায় বলে দিয়ে নতুনভাবে কর্মক্ষেত্রে সীমাহীন গতিতে প্রবেশ করার অদম্য শক্তি যোগাবে সে বই-ই তো আপনার দরকার। তাহলে বইগুলো সংগ্রহ করতে ভুলে যাবেন না। সেল্‌ফ ইমপ্রুভমেন্ট খ্যাত এ সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় বইগুলোর তালিকাই আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম।

সংগ্রহ করার দায়িত্ব আপনার। কখনো অবহেলা করবেন না। কাজ কিন্তু কাজই। কাজকে কাজ দ্বারা বিশ্লেষণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সফলতার মূল কথাই তো এখানে। মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের নো দাই-সেল্‌ফ মূলত এই শিক্ষাই দিয়ে থাকে।

সব সময় সত্য কথা বলুন। সততার এক মহা জাদুকরী আকর্ষণ আছে। যা আপনাকে ব্যক্তিক গ্রহণযোগ্যতা দান করবে। অন্যকে সাহায্য করার মনোভাব তৈরী করুন। ইংরেজিতে একটি বাক্য আছে। এ বাক্যটি অবশ্য মহা গ্রন্থ আল কোরআনেও আছে— "Allah helps those who help themselves." অর্থাৎ যে নিজেকে সাহায্য করে, স্বয়ং আল্লাহ তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

প্রথম বাক্যটির শিক্ষা হল আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এবং দ্বিতীয় বাক্যটির শিক্ষা হল অপরকে সাহায্য করতে হবে।

আপনার মাঝে যে গুণগুলো থাকতে হবে তা-হলো—

(ক) বিশ্বাস

(খ) সততা

(গ) ধৈর্য্য

(ঘ) সহযোগিতার মনোভাব

(ঙ) উচ্চাকাঙ্ক্ষা

(চ) পরিকল্পনা প্রণয়ন। সর্বোপরি মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ কামনা করে তাঁর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রেখে প্রতিটি কাজে অগ্রসর হলে অবশ্যই ফল পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

লক্ষ্য নির্ধারণ করে লক্ষ্যে পৌছানোই সফলতার হাতছানি
(Setting and achieving your goals to success)

সাফল্য লাভের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ জরুরী। লক্ষ্য নির্ধারণ করে তবেই কাজে নামা উচিত। জীবনে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না থাকলে সে জীবন হয় ব্যর্থতার পথযাত্রী। তাই লক্ষ্য অর্জনের জন্যেই উদ্দেশ্যের প্রয়োজন।

এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনি কোথায় আছেন এবং কোথায় যেতে চান তার একটা পরিকল্পনা তৈরী করা। Objective indecates when you are and when you want to go.

Objective is the terget what do you want to hit.

Objective is the result when you want to achieve.

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য Goal-Setting-এর গুরুত্ব সীমাহীন। অর্থাৎ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য লক্ষ্য নর্ধারণ আবশ্যক। তাই জীবনে সফলতার ক্ষেত্রে Goal-Setting আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লক্ষ্য ছাড়া কখনো গন্তব্যে পৌছানো যায় না। ব্যক্তি জীবনে লক্ষ্য হীনতাই ব্যর্থতা ডেকে আনে। অধিকাংশ মানুষেরই সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য থাকে না বলেই তারা বেশীদূর এগোতে পারেন না। তারা বুঝতে পারেন না কত সময়ে কত পরিশ্রমের বিনিময়ে কি অর্জন করতে চান। তাই সাফল্যের পূর্বশর্ত হচ্ছে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে নিজেকে পরিচালিত করার পরিকল্পনা মত কাজ চালিয়ে যাওয়া। আপনি কোথায় ছিলেন বা আছেন সেটা বড় কথা নয় বরং কোথায় পৌছতে চান সেটাই মূলকথা। একটি ভবন নির্মাণের জন্য যেমন—নক্সা বা ডিজাইনের প্রয়োজন হয় তেমনি সফলতার জন্য লক্ষ্য স্থির ও পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন। কারণ Goal-Setting means step to success. লক্ষ্য স্থিরই হচ্ছে সফলতার প্রাথমিক পদক্ষেপ।

আপনার লক্ষ্য স্থির নিচের চারটি প্রশ্নের সাথে বিশেষভাবে জড়িত।

(ক) আপনি কি হতে চান?

(খ) কত সময়ে হতে চান?

(গ) যত সময়ের মধ্যে যা হতে চান তার জন্য যা যা করা দরকার তার পদক্ষেপ নেয়া।

(ঘ) উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য Action-plan—কর্মপন্থা তৈরী করা।

প্রত্যেকটি মানুষের একটা নেতিবাচক দিক থাকে—তা হচ্ছে আজকে নয় কালকে অমুক কাজটা করব। কালকে নয় পরশুদিন করব। এসব একদম থাকতে নেই। এই অলসতা, অনিহা, গাফিলতিগুলোকে ঝাটা মেরে তাড়িয়ে বিদায় করে দিন। আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করুন, অবশ্যই সফল হবেন।

www.pathagar.com

দক্ষতা অর্জন
(Achievement of Efficiency)

সকল কাজের জন্য চাই দক্ষতা অর্জন ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপাদান। কীভাবে দক্ষতা অর্জন করা যায় সে বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। বিষয়গুলো আমি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি সুতরাং ঘাবরানোর দরকার নেই। কিন্তু তার পরও আপনার আত্মোন্নয়ন কিংবা আত্ম-জাগরণের প্রয়োজন। আত্ম-জাগরণ, আত্মোন্নয়ন কিংবা ভেতরের সীমাহীন শক্তিকে জাগ্রত, প্রাণবন্ত করতে না পারলে কখনোই আপনি কাজের প্রতি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হতে পারবেন না। আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, কাজ করার অদম্য চেতনাবোধ, একাগ্রতার শক্তি, আত্মবিশ্বাস সব কিছুই পরিচালিত হয় Self-Improvement skills দ্বারা অর্থাৎ আত্মোন্নয়নের স্কিল দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

আপনার দরকার কার্য সম্পাদনের প্রণালী (Procedure) বিশেষ বিশেষ ক্রম অনুসরণ করে কার্য সম্পাদন করা। সুশৃংখল ক্রম বা পদক্ষেপের দ্বারা একটি বিশেষ কার্য সম্পাদনের কি কি পদক্ষেপ দরকার, কখন এবং কীভাবে গ্রহণ করতে হয় Procedure তা নিম্নোক্ত পর্যায়ে উত্তমরূপে নির্দেশ করে।

কর্মসূচি জ্ঞান (Programme) কর্মসূচির উপলব্ধি জ্ঞান হল—আপনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে তার/নীতি (Policy), পদ্ধতি (Procedure), বিধি (Rule) মোতাবেক কাজ হচ্ছে কিনা তদারকীর ভিত্তিতে আত্ম-সমালোচনা করা। এবং অবহেলা ও অলসতা পরিহার করে একাগ্রচিত্তে কাজ চালিয়ে যাওয়া। তারপর আপনার Mission—অভিপ্রায় কতটুকু গতিশীল তা অনুধাবন করা। এভাবেই কাজ চালিয়ে যাওয়া।

মিশনকে সফল করার জন্য দরকার ঃ

ইচ্ছাশক্তি

কল্পনাশক্তি

উপলব্ধি জ্ঞান

অনুপ্রাণিত হওয়ার প্রণালী

বাসনা পূরণের অভিপ্রায়ী হওয়া।

উপরোক্ত Skills-এর উপর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

ইচ্ছাশক্তি—ইচ্ছা করলেন কাজ করবেন। কল্পনা করলেন কাজে নামবেন কিন্তু নামলেন না। উপলব্ধি করলেন কাজ হওয়া দরকার। কারণ সফল হওয়ার জন্যেই তা দরকার কিন্তু হল না। কাজে না নামলে কাজ হবে কি করে।

www.pathagar.com

কাজের প্রতি আপনি অনুপ্রাণিত হলেন না। এতেও কাজ হল না। আর কাজ না হওয়াতে আপনার মনের বাসনাও পূরণ হল না। আর বাসনা পূরণ না হওয়াতে আপনি জীবনে সফল হলেন না। এটাই বাস্তব ও সত্যি। কাজেই উপরের সমস্ত শক্তিরই সংযোগ চাই—তাহলেই কাজে সফলতা আসবে।

দক্ষতা বৃদ্ধি
(Increase in Efficiency)

ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের গুরুত্ব
শেখার আগ্রহ (Willingnees to learn)

দৃঢ় সংকল্প ইত্যাদি Skills-গুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাজে লাগাতে পারলেই আপনি কর্মী হিসেবে যেমন সফল তেমনি ব্যক্তি জীবনেও উন্নতির চরম শিখরে উপণীত হওয়ার যাবতীয় পথ ও পন্থার সন্ধান এখানেই। এ পথের সন্ধানগুলো জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে সফলতার শীর্ষে পৌছানোর জন্য আমি সাফল্যের যাদু (The Magic of Success) নামে বইটি বাজারে প্রকাশ করেছি। এই বইটিও আপনাকে দারুণভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্য সীমাহীন শক্তি ও সাফল্যের সন্ধান দেবে।

সাফল্য শুধু আপনার জন্য; সাফল্যের জন্য আপনি নন। এ কথাটির উত্তর না দিলে বিষয়টি হয়ত উহ্য-ই থেকে যাবে। কথাটি একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন।

"সাফল্য মানুষের জন্ম দেয় না বরং মানুষই সাফল্যের জন্মদাতা।" কথাটি চিরসত্য; যদি তাই হয়; তাহলে, কীভাবে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছানো যায়, তার পন্থা আপনার নিজেকেই আবিষ্কার করতে হবে।

ব্যক্তি জীবনে উন্নতি চান না এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই; কিন্তু কৌতুক করে বলতেই হয়, আমাদের মাঝে এমন অনেক লোকই উন্নতির স্বপ্ন দেখেন; কাজের পূর্বেই লাভের অঙ্কটা কষেন, কিন্তু তার এ স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যায়। এ যেন 'গাছে কাঁঠাল আর গোঁফে তেলের ন্যায়'; অথচ তাদের নেই কোনো অধ্যবসায়, নেই কোনো আত্মবিশ্বাস, যার মাধ্যমে তার স্বপ্ন-সাধটি পূর্ণ হবে।

কেউ যদি কিছু করতে চায় বা হতে চায়? তার জন্য প্রথমত যে গুণটির প্রয়োজন তা হল উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, লক্ষ্য নির্ধারণ ও অধ্যবসায়।

দ্বিতীয়টি হল 'আত্মবিশ্বাস,'। উচ্চাকাঙ্ক্ষা যখন গভীর হবে, আত্মবিশ্বাস যখন সুদৃঢ় হবে, তখন যদি আপনি নিজেকে উপযুক্ত মনে করে, আত্মবিশ্বাসের সাথে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একাগ্রতা নিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে মনোনিবেশ

www.pathagar.com

করেন, তাহলে আপনি সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবেন; তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মানুষ পারে না এমন কোনো কাজ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সীমাহীন শক্তির অধিকারী করেছেন, একমাত্র জ্ঞান শক্তির মাধ্যমে; কিন্তু তিনি একটি শর্তও দিয়েছেন, তা হল এ শক্তি আপনাকে অর্জন করে নিতে হবে।

পাথর ঘষতে ঘষতে যেমন এক সময় তা ক্ষয় হয়, তেমনি আপনার মাঝেই লুকিয়ে আছে, এক অদ্ভুত সম্ভাবনার দীপ্তি; কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তাকে যথাযথ ব্যবহার করুন; তাহলে যে কোনো অসম্ভবকে আপনি সহজেই সম্ভব করতে পারবেন।

আপনার আকাঙ্ক্ষা গভীর, আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় এবং কর্মক্ষেত্রে গভীর মনোযোগ আছে। তাহলে শুধু প্রয়োজন নিষ্ঠার সাথে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। এবার আপনার সাফল্য আসবেই।

আপনার উদ্দেশ্য প্রথমবার সফল নাও হতে পারে; কিন্তু তাই বলে বিচলিত হবেন না, চেষ্টা চালিয়ে যান। অধ্যবসায়ে লেগে থাকুন; অন্তত সাত বার চেষ্টা না করা পর্যন্ত হাল ছাড়বেন না।

যদি আপনার আত্মবিশ্বাস থাকে, যদি অদম্য ইচ্ছা শক্তি থাকে, যদি কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করতে থাকেন, তাহলে আপনার এ প্রচেষ্টাই যোগাবে অসীম শক্তি, ফলে সাফল্য আপনার অবধারীত।

হয়তো আপনি যা পরিকল্পনা করেছেন?.....হতে পারে আপনার সে লক্ষ্য বস্তুটি যোগ্যতার উর্দ্ধে; কিন্তু তাই বলে ভীত বা সকুচিত হবেন না। কারণ, আপনার মাঝে যে সীমাহীন শক্তি লুকিয়ে আছে; তা হয়তো আপনার জানা নেই। আপনি সে শক্তির আবিষ্কারক। এ শক্তির ধারা হচেচ্ছ— 'পরিশ্রম'। ধৈর্য্য ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান; নিজেই অবাক হয়ে যাবেন, আপনার লুকানো শক্তির পরিচয় পেয়ে।

কথাটা হয়তো এখনও পরিষ্কার বুঝেননি? ... তাই ভাবছেন?

রেল লাইনের উপরে যে পাথরগুলো দেয়া থাকে, সেগুলো শীতকালে বেশ ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু আপনি একটি পাথর হাতে নিয়ে লোহা অথবা কাঠের সাথে ঘষতে থাকুন। এভাবে কিছুক্ষণ ঘষার পর দেখবেন দু'টিই বেশ গরম হয়েছে।

আবার—পরস্পর দু'টি পাথরের সাথে বহুক্ষণ ঘষতে ঘষতে দেখবেন এবং সময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে।

এবার পরীক্ষামূলক আপনার নিজের হাতটি একটি টেবিলের উপর রাখুন। শীতকাল বলে টেবিলটি হয়তো ঠাণ্ডা। এবার ঘষতে থাকুন। দেখবেন টেবিলটিও গরম হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

একটু আগেই যে টেবিলটি শীতল ছিল আপনার হাতের ঘর্ষণের ফলে, লুকানো উত্তাপে তা গরম হয়ে গেছে। এবার হয়তো আপনার মাঝে লুকিয়ে থাকা সেই অফুরন্ত সম্ভাবনার সন্ধান পেয়েছেন?

প্রতিটি মানব শিশুই আল্লাহর দেয়া প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ তাকে লালন ও পরিচর্যা করে সাফল্যের দিগন্তে উন্নীত হন। আবার কেউ তাকে অযত্নে ফেলে রেখে প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটান।

বাস্তবে আপনি একটা তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি কয়েকদিন অযত্নে মাটিতে ফেলে রাখুন। বেশ কিছুদিন পর দেখবেন তাতেও মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে গেছে। তা দিয়ে এখন কিছুই কাটা সম্ভব নয়। অথচ, একখণ্ড আস্ত লোহাও যদি প্রতিদিন ঘষতে থাকেন; তবে তাও ক্রমে ক্রমে ধারাল হতে থাকবে।

সুতরাং আপনার যে প্রতিভা ও স্মৃতি শক্তি আছে, সযত্নে তাকে কাজে লাগিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান; দেখবেন আপনার প্রতিভা বেড়ে গেছে। স্মৃতির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাহলে আপনিই হবেন সবচেয়ে মেধাবী। যেদিকেই পা রাখবেন শুধু সাফল্যের ধ্বনিই শুনতে পাবেন।

মনে রাখবেন, এ পৃথিবীতে আপনি আল্লাহর প্রতিনিধি। সত্য, নিষ্ঠা ও কঠোর অধ্যবসায়ই আপনার ধর্ম। তাই মিথ্যার ভিত্তিতে স্থায়ী কোনো ভবিষ্যৎ গড়া যায় না। আর এতে সাফল্যের চাইতে ব্যর্থতাই বেশী আসে। অতএব, সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে, লক্ষ্য নির্ধারণ করে আত্মবিশ্বাসের সাথে উপযুক্ত জ্ঞানার্জন করার জন্য সততা এবং আন্তরিকতার সাথে কঠোর পরিশ্রম করে যান। আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য কামনা করুন। আপনিই সাফল্যের জন্মদাতা; সাফল্য শুধুই আপনার জন্য।

সফলতার ক্ষেত্রে শ্রোয়েডারের জীবন কাহিনীই জ্বলন্ত উদাহরণ। শ্রোয়েডার ১৯৪৪ সালের এপ্রিলে জার্মানীর ওয়েস্ট ফালিয়ান গ্রামের এক শ্রমিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম গেরহার্ড ফ্রিটজ কুট শ্রোয়েডার। তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি জার্মানীর ভাগ্য বিধাতা হয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রুমানিয়াতে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। শ্রোয়েডার তখন ছোট। বলতে গেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত পিতার সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয়-ই ঘটেনি। এ কারণে দরিদ্র মায়ের পক্ষে তাঁকে স্কুলে পাঠানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এমনকি সংসার চালানোই তার মায়ের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। দু'মুঠো ভাত জোটানোই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কঠোর পরিশ্রমী শ্রোয়েডার কোনো মতেই দমে যাননি।

www.pathagar.com

প্রথমে সেলস্‌ম্যানের শিক্ষানবিস এবং পরবর্তীতে ইমারত নির্মাণের সাহায্যকারী হিসেবে তিনি জীবন যুদ্ধ শুরু করেন। সেখান থেকে কিছু অর্থ উপার্জনের পর তিনি হাই-স্কুলে পড়াশুনা শুরু করেন। লেখাপড়ার খরচ ছিল না বলে যার স্কুলে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এবার তিনি স্কুলের শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাক্ষর রাখলেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অনুষদে পড়ার সুযোগ ঘটে। ৭০-এর দশকে তিনি আইনজীবী হিসেবে কাজ করার লাইসেন্স পান।

১৯৬৩ সালে তিনি এসপিডির প্রাথমিক সদস্য হন। তার আগে ছাত্রাবস্থাতেই এসপিডির সংগঠন জি ইউ এস ওর'র সক্রিয় কর্মী ছিলেন শ্রোয়েডার। ১৯৮০ সালে ফেডারেল সংসদ বুন্ডেসটাগের সদস্য নির্বাচিত হন তিনি।

১৯৮৬ সালে লেয়ার স্যাকসনী অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পরাজিত হন। তারপরও তিনি ক্ষান্ত হননি? ১৯৯৩ সারে গ্রীণ পার্টির সমর্থন নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন হতে সক্ষম হন। এরপর ১৯৯৪ সালের নির্বাচনে শ্রোয়েডারের নেতৃত্বে রাজ্য বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভে সক্ষম হয় এস পি. ডি.।

১৯৯৮'র বুন্ডেসটাগের নির্বাচনে চ্যান্সেলর পদপ্রার্থী হিসেবে তাকে মনোনীত করা হয় এবং তিনি বিজয়ী হন।

এভাবে তিনি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে প্ররিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বলে আজ জার্মানীর শাসনকর্তার আসনে আসীন হয়েছেন। তার কর্মের ফল সাফল্যের সুনিশ্চিত দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

www.pathagar.com

নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলুন

জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য আত্মবিশ্বাসের গুরুত্ব সীমাহীন। কর্মক্ষেত্রে বিজয়ী হওয়ার জন্য নিজেকে অসীম আত্মবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে তুলুন।

সঠিক সিদ্ধান্তের অভাবে যেমন কারও জীবন স্বার্থক ও সফল হয়ে ওঠে না, তেমনি আত্মবিশ্বাস না থাকলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পদে পদে ব্যর্থতার হিসেব কষতে হয়।

আত্মোপলব্ধি জ্ঞান যে আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয় তার উপরই নির্ভর করে আপনার কর্মের ফলাফল। সীমাহীন আত্মবিশ্বাসের দ্বারাই মানুষকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করে। মানুষ হয় অসীম ক্রিয়াশীল এক যান্ত্রিক বস্তুর ন্যায় শক্তিশালী। আত্ম-সমৃদ্ধির জন্য সে চরমভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মোদ্দীপনার সাথে কাজ করে। তার এ কাজের গতিই তাকে সফলতার পথ দেখায়।

আত্মবিশ্বাস ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না।

আপনি নিজেকে কতটা আত্মবিশ্বাসী বলে মনে করেন? আপনি বর্তমানে যা করছেন; এবং করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন; তা কি যথাযথভাবে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে?

অথবা, আপনি যা নিয়ে চর্চা করছেন তা কি সঠিক? আপনার উদ্দেশ্য সফল হলে জাতি কতটুকু উপকৃত হবে; তা-কি কখনও ভেবেছেন?

যদি আপনার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তাহলে আপনি কিছুতেই সফলতা অর্জন করতে পারবেন না।

আত্মবিশ্বাস যেখানে আছে, সেখানে মিথ্যা, মূর্খতা ও মনুষ্যত্বহীনতার কোনো আশ্রয় নেই; সে জন্যেই আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তির জীবন সাফল্যময় অধ্যায়।

আত্মবিশ্বাস ব্যক্তি জীবনে সাফল্যের অঙ্গীকারস্বরূপ। যেখানে সত্য-নিষ্ঠা, মনুষ্যত্ববোধ, মানবতা, দৃঢ়তা ও জ্ঞানের প্রবণতা নেই; সে আত্মবিশ্বাসের স্থায়িত্ব নেই; দ্বিধা-সংকোচ আর নিরাশার চিহ্নই তাতে ফুটে ওঠে। আর এ কারণেই জীবনের প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হয়। কলঙ্কময় জীবনের সৃষ্টি হয়। পদে পদে বিপদের সম্মুখীন হতে হয় আত্মবিশ্বাসহীন ব্যক্তিত্বকে।

www.pathagar.com

আত্মবিশ্বাসী হতে হলে নানাবিধ গুণে গুণান্বিত হতে হয়। যার আত্মবিশ্বাস নেই, তার সফলতা অনিশ্চিত! আত্মবিশ্বাস মানুষকে আত্মশক্তিতে বলিয়ান করে, আত্মনির্ভরশীলতা দান করে। অপরপক্ষে, আত্মবিশ্বাসহীন ব্যক্তি হতাশাগ্রস্ত কালের আবর্তে পতিত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ

আপনি একজন ছাত্র। ক্লাশে স্যার ইংরেজি গ্রামারের "Parts of speech." নিয়ে আলোচনা করছেন। আপনি 'Parts of speech.' আট প্রকার তা জানেন এবং কি কি তাও জানেন? কিন্তু কোনোটির সংজ্ঞা আপনার জানা নেই।

স্যার হঠাৎ ক্লাশে আপনাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন?

"The horse can run fast."

এ বাক্যে fast কোন্ 'Parts of speech"?

হয়ত আপনি একটি ভুল ধারণা নিয়ে অথবা পাশের বেঞ্চের কোনো বন্ধুর মুখে শুনে ভুল উত্তরটি দিবেন; কিন্তু তাতে আপনার আত্মবিশ্বাস নেই।

যদি স্যার আপনার উত্তর শুনে চালাকী করে পরীক্ষামূলক বলেন—'তুমি যা বলেছ, তা কি সঠিক?

তাহলে হয়ত আপনি বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকবেন। কারণ, আপনার জানা নেই, আর জানার চেষ্টাও কোনোদিন করেননি? যদি জানা থাকতো তাহলে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে হলেও বলতেন যে হ্যাঁ, সঠিক। কিন্তু এখন বোকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লাশের সকল ছেলে-মেয়েদের সামনে শুধু লজ্জা কুড়াতে হচ্ছে।

আপনি কি চান সে রকম ছাত্র হতে?

লজ্জা আর অবজ্ঞা কুড়িয়ে কুড়িয়ে জীবনটা বোকার মত আত্মবিশ্বাসহীনতায় কাটিয়ে দিতে?

তাহলে কোনো পরিশ্রম করতে হবে না। অত গাদা-গাদা বইয়ের বোঝাও টানতে হবে না। খালি হাতে ক্লাশে যাবেন—আসবেন আর বখাটে বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে গল্প-গুজব ও আড্ডা মেরে ক্লাশের সময়টা মজার সাথে কাটিয়ে দেবেন। কথাগুলো শুনতে ভালই লাগছে.... কারণ ক্লাশ ফাঁকি, আড্ডা দেওয়া, পড়ালেখার প্রতি অমনোযোগ ও মাস্টারের চোখ ফাঁকি দিয়ে স্কুল থেকে পালানো আপনার পেশায় পরিণত হয়েছে।

আপনি হয়ত এভাবে একদিন বড় চোরে পরিণত হবেন। প্রতিবেশীকে শার্টের কলার টেনে বলবেন; আমি দশম শ্রেণীতে পড়ি। বাড়ীতে গিয়ে বাবা-মাকে বলবেন জলদি ভাত দাও! ক্লাশ করে এসেছি! আর বাবা-মা আপনাকে বিশ্বাস করে আদর

www.pathagar.com

করবে। আপনি আদর পেয়ে পেয়ে একদিন তাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে দেবেন। লেখাপড়ার প্রতি অমনোযোগে একদিন বোকা আর দুর্বল ছাত্রের গ্লানি টেনে হঠাৎ ছাত্র জীবনের ইতি ঘটবে।

ক্লাশে কোনো কিছু না পারার লজ্জা আর স্যারের ঘৃণাকে হজম করতে করতে দেখবেন একদিন আপনি নিজেই হজম হয়ে গেছেন।

আপনার বেঁচে থাকার কোনো মূল্য নেই। আপনার চেয়ে একটি কুকুরও অনেক ভাল। কারণ, কুকুরও তার মুনিবের আদেশ পালন করে; মুনিবকে মান্য করে।

অপরপক্ষে, আপনি স্যারের সাথে, পিতা-মাতার সাথে প্রতারণা করেছেন। আর তাইতো ছাত্রজীবন হঠাৎ ব্যর্থতায় থেমে গেছে। হতাশাই রয়ে গেল। আসলেই আপনি নরাধম, কাপুরুষ, নির্বোধ, যারা এমন ঠিকমত বই নিয়ে পড়তে বসেন না, যাদের পড়ালেখা ভাল লাগে না, শুধু আড্ডা মারতে ইচ্ছে করে, তাদের একদিন এভাবেই ভুগতে হবে।

হয়ত বা আপনাদের কেউ স্কুল জীবনে বহুবার ক্লাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোকার মত সময় কাটিয়েছেন? অথচ বাড়ীতে বসে একটু চেষ্টা করলেই ক্লাশে সবার সামনে দাঁড়িয়ে লজ্জা পেতে হত না। বাড়ীতে পড়ার টেবিলে আর মন টিকে না। শীত এসেছে, কোন্ গ্রামে যাত্রার পালা হচ্ছে, কোথায় নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে, কোথায় গানের আসর বসেছে, এসব শুনামাত্রই ছুটে যাবেন। এমনকি হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় রাত জেগে-জেগে হলেও ওসব দেখবেন। কিন্তু পড়ার টেবিলে বসলে ঠাণ্ডা লাগে, ল্যাপের ভিতরে গিয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করে; অথচ লেখাপড়া করা আপনার কর্তব্য। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে; আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে হলে, দেশ ও জাতিকে নেতৃত্ব দিতে হলে, আপনাকে আগে লেখাপড়া করতে হবে। বিনোদনে যে সময়টুকু ব্যয় করতেন তা জ্ঞানার্জনে ব্যয় করতে হবে। আপনি যে সময়টুকু বিনোদনে অথবা দুষ্টোমিতে কাটিয়ে দিচ্ছেন তা আপনার লেখাপড়ায় ব্যয় করুন, অবসর সময়টুকুর কিছু সময় খেলাধুলায় ব্যয় করুন।

জীবনে কত সময়ইতো দুষ্টোমিতে ব্যয় করলেন; এবার ওসব ত্যাগ করে জীবনকে গড়তে চেষ্টা চালিয়ে যান। নিয়মিত লেখাপড়া করুন। ক্লাশের পড়াগুলো প্রতিদিন রীতিমত নিয়মমাফিক মুখসস্থ করার চেষ্টা করুন। দেখবেন আপনিই সবার সেরা। অনুভব করতে পারবেন অধ্যবসায়ী জীবন কত সুন্দর। কত মনোহর! ভালভাবে লেখাপড়া জীবনের আনন্দই আলাদা। একবার যে এর স্বাদ পেয়েছে, কোনোদিন সে পড়ার টেবিল ছাড়তে পারেনি। জীবনের প্রতিটি স্তরেই তার সাফল্য অনিবার্য। জীবন মানেই সাধনা এবং সাধনার অপর নাম জীবন। আপনি অধ্যবসায়ে

www.pathagar.com

লিপ্ত হয়ে নিয়মিত লেখাপড়া করেন। সময়কে ঠিকমত কাজে লাগান। কখনও মিথ্যা বলবেন না। দেখবেন তাতে আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্মেছে।

আর আত্মবিশ্বাস ব্যতীত আত্মতৃপ্তি লাভ হয় না। জীবনের প্রতি আস্থাশীল হতে হলে, হতাশাগ্রস্ত জীবন থেকে মুক্তি পেতে হলে, সুন্দর আগামীর স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে হলে, নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে।

আত্মবিশ্বাসের কথা বলতে গিয়ে একটি মজার অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে— এক বন্ধুর আমন্ত্রণে একদিন তার বড় ভাইয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানের অতিথি হয়েছিলাম। পরিবারটিসহ প্রতিবেশীদের সকলেই ছিল শিক্ষিত। তাই অনেক স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্রের সাথে পরিচয় হলো। তাদের অনেকেই ছিল খুব ভদ্র এবং মেধাবী; তাই সারাক্ষণ শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত তর্কের মাঝে সময় কাটতে লাগল। এভাবে দু'দিন কীভাবে যে কেটে গেল বুঝতেই পারিনি।

আমার বন্ধুটি ছিল একটু বোকা ধরনের। নিজেকে সব সময়ই বড় ভাবতো; যে বিষয়টি জানতো না, তবুও তা নিয়ে সবার সাথে তর্ক জুড়ে দিত। তার মনে ধারণা যে, আমি যেহেতু সঙ্গে আছি, তখন আর চিন্তা কিসের। অংক, ইংরেজি ও অন্যান্য যে কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক জুড়িয়ে দিত অনেকের সাথে, অথচ সে নিজেও এসবে তেমন পারদর্শি ছিল না। একদিন ইংরেজি "Translation," নিয়ে একজনের সাথে বেশ তর্ক শুরু হল। ভাল ছাত্র হিসেবে আমার বেশ সুনাম ছিল, কিন্তু ঐ মুহূর্তে আমি সেখানে ছিলাম না। অন্য এক বন্ধুর সঙ্গে তাদের বাসায় গিয়েছিলাম। প্রতিপক্ষের সাথে একশত টাকা বাজি রেখে একটি Translation নিয়ে তিন ঘণ্টা ব্যাপী তর্ক হচ্ছিল, আমার বন্ধুর সাথে।

আমার বন্ধুটি মনে মনে আমাকে খুঁজছে আর বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সে ভাবছে.... আমাকে জিজ্ঞাসা করেই সঠিক অনুবাদটি বলবে। ইতিমধ্যেই তার প্রতিপক্ষ একটি অনুবাদ বলেছে; কিন্তু তা পুরোপুরি সঠিক কি না। জানার জন্য আমার বন্ধুর মতই সেও তার বন্ধুকে খুঁজছে। আর মূল বিষয়টি এড়িয়ে চলছে। দু'জনেরই একই অবস্থা। কিন্তু প্রতিপক্ষের বন্ধুটি আমার কাছেই ছিল। তার সাথে আমার বেশ সম্পর্ক হয়েছিল। হঠাৎ আমাদের দু'জনকেই এক সঙ্গে দেখে তাদের মাথায় বাজ পড়লো। পরিকল্পনা নষ্ট হল। অবশেষে দু'জনেই নিরুপায় হয়ে জিজ্ঞেস করল কার অনুবাদটি সঠিক; দেখলাম আমার বন্ধুটি পরাজিত হচ্ছে। বিপক্ষের অনুবাদটিই সঠিক।

www.pathagar.com

মনে মনে ভাবলাম বন্ধুর পরাজয় হলে হয়ত বিয়ের অনুষ্ঠানের আনন্দতো দূরের কথা নিজেকেও বেশী খারাপ লাগবে।

তাই একটা ফন্দি আটলাম, বিপক্ষের বন্ধুটি তার নীতিতে অটল কিনা বার বার জানতে চাইলে, সে নির্বোধভাবে বসে রইল। অনেকক্ষণ পর বলল মনে হয় আমারটা ঠিক নেই।

আসলে আমি তাকে পরীক্ষা করেছিলাম। তার অনুবাদটি ঠিকই ছিল। আমি বললাম কারোরটাই ঠিক নয়। সে আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিল, কিন্তু আত্মবিশ্বাসের অভাবে তার পরাজয় হল। যদি বিষয়টি তার জানা থাকতো তাহলে এভাবে তাকে দ্বিধা-সংকোচে পড়তে হত না। যদি সে জানতো যে আমারটিই ঠিক তাহলে আমি সারাদিন বক বক করলেও তা মানতো না।

অনুবাদটি সে ধারণার উপরে বলেছিল। হলে হবে, নইলে নাই হবে।

সঠিক জিনসটিও আত্মবিশ্বাসের অভাবে মিথ্যে হলে গেল। কিন্তু আমার আত্মবিশ্বাস ছিল যে আমার রায় তারা মেনে নেবে।

অতএব জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। আত্মবিশ্বাসী হতে চাইলেই উপরোল্লেখিত সকল গুণে গুণান্বিত হওয়া চাই।

www.pathagar.com

সাফল্য লাভের অভিপ্রায়

উচ্চাকাঙ্ক্ষা (High Desire)

সফলতা লাভের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা বাঞ্ছনীয়। আপনি যা পেতে চান তা যদি যথোপযুক্ত হয় এবং তা লাভের জন্য যদি দৃঢ় সংকল্প থাকে, আত্মবিশ্বাস থাকে তাহলে তা অর্জনে অবশ্যই সফল হবেন।

সাফল্যের অদম্য চেতনাশক্তি আসে সিদ্ধিলাভের জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে। তাইতো ফরাসী সম্রাট দিগ্বীজয়ী মহান বীর নেপোলিয়ন বলেছেন, "মানুষ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি দিয়ে যা কল্পনা করে এবং গভীর আত্মবিশ্বাসের সাথে অগ্রসর হয় তাহলে অবশ্যই সে তা অর্জনে সক্ষম, তা যাই হোক না কেন, সাফল্য আসেবই।" তাই আপনার কাজে নামার পূর্বে অবশ্যই প্রস্তুতিমূলকভাবে নিজের মোটিভেশনাল মুভমেন্টকে ঝালিয়ে নিতে হবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে মনে-প্রাণে গুরুত্বসহকারে কাজ করতে হবে। তবেই তো দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা লাভ হবে। আর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন মানেই সফলতার ক্ষেত্রে কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। কারণ অভিজ্ঞতাই সফলতার উৎস (Experience is the source of Success) সাফল্য মূলত কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। সাফল্য ক্রমান্বয়ে অর্জিত হয় মানুষের মৌলিক কিছু গুণাবলীর কারণে। আর সে কারণেই সাফল্যের সংজ্ঞা এক একজনের কাছে এক এক রকমের।

একজন কৃষকের ছেলের কাছে সাফল্য হতে পারে পড়ালেখা শেষ করে জীবন পরিচালনা করার জন্য ন্যূনতম একটি চাকুরী পাওয়া। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী একটি পরিবারের সন্তানের কাছে সাফল্য হল পড়ালেখা শেষে ব্যবসা করে গাড়ী-বাড়ী ও অঢেল টাকা-পয়সা আয় করা। সুতরাং একজনের কাছে যা সাফল্য অন্যজনের কাছে তা ব্যর্থতা। সাফল্যের সার্বজনীন রূপরেখা নির্ণয় করা কষ্টকর হলেও সাফল্য অর্জনের পদক্ষেপ মূলত সবার ক্ষেত্রে একই। এখানে মৌলিক কতগুলো গুণাবলী থাকে যেগুলো আমি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করে যাচ্ছি। সেগুলোই সাফল্যের মৌলিক গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

আপনি জীবনে যা আশা করেন তা পাওয়াই আপনার জন্য সাফল্য কারণ এ পাওয়ার মাঝেই আপনার সুখ-সমৃদ্ধি ও যাবতীয় কল্যাণ নিহিত।

কাজেই আমি যে সফলতার কথা বলছি, এই সাফল্যের আস্বাদ কেহ জন্ম থেকেই পান না। তাই সাফল্যের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন হয়। প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে হয়, ইতিবাচক মনোভাবের সহিত দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে কাজ করতে হয়। তবেই আসে সাফল্য। আমাদের বহু প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় শুধু লক্ষ্যহীনতা ও দৃঢ় সংকল্পের অভাবে কিন্তু আমাদের জয়ের জন্য দরকার ইতিবাচক হওয়া। ব্যর্থতাকে জয় করে লক্ষ্যে পৌছার অদম্য চেতনাবোধ নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সহিত সামনের দিকে এগিয়ে চলা। তখনই আমরা সাফল্যের সম্ভাবনার দিকে ধাপিত হব। সমগ্র পৃথিবীর দিকে তাকালে অনায়াসে উপলব্ধি হয় যে জীবনে যে সকল ব্যক্তিবর্গ সফলতা লাভ করেছেন, তাদের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, কঠোর শ্রম, সাধনা আর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তারা সাফল্যের শীর্ষে আরোহন করেছেন। যে সফল গুণগুলো তাদেরকে সাফল্যের শীর্ষে পৌছে দিয়েছে তা নিম্নে আলোকপাত করা হলো ঃ

কঠোর পরিশ্রম (Hard work)

সাফল্য লাভের জন্য দরকার নিরলস প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম। দৈবক্রমে সাফল্য পাওয়া যায় না। আমরা অনেকেই ব্যক্তি জীবনে সফলতা আশা করি কিন্তু সফলতার জন্য যে কঠোর শ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন তা করি না। এ কারণেই আমরা জীবনে সফল হতে পারি না। তাই সফলতার জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম (Hard work) করার দৃঢ় সংকল্প।

আপনার কাজ যতই ভাল হোক, যত উত্তম চিন্তাই করেন না কেন, কঠোর পরিশ্রম না করলে আপনার পক্ষে সফলতার সাক্ষাত পাওয়া সম্ভব নয়। অনেক মহৎ প্রতিভা ও ইচ্ছাশক্তি কঠোর পরিশ্রমের অভাবে অকালে নষ্ট হয়ে যায়। অপমৃত্যু ঘটে। পৃথিবীতে এর বহু নজীর রয়েছে। যে কোনো কাজই হোক না কেন, পরিশ্রম ও সঠিক অনুশীলন করতে পারলে অবশ্যই সফলতা আসে।

অঙ্গীকার (Commitment)

সাফল্য লাভ ও সমৃদ্ধির জন্য— মোটকথা যে কোনো কাজের জন্য অঙ্গীকার অত্যাবশ্যক গুণ। কেননা— কোনো কাজ নিষ্পত্তি করার দৃঢ় অঙ্গীকার নির্মাণ করতে হয় দু'টি স্তম্ভের উপর। একটি হল সততা এবং বিজ্ঞতা।

www.pathagar.com

একজন ম্যানেজার তার কর্মচারীকে এই কথাটি বেশ সুন্দর করে বলেছিলেন, "যদি তোমার আর্থিক ক্ষতিও হয় তবুও তোমার অঙ্গীকার দৃঢ় থাকার নামই সততা এবং বিজ্ঞতা হচ্ছে, যে কোনো ক্ষতি হবে সেই রকম বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ না হওয়া।"—কথাটি রয় শেরউডের।

সাফল্য ও সমৃদ্ধি আমাদের চিন্তা ও সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কী কী চিন্তা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করবে। সাফল্য কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়, এটি আমাদের মনোভাবের ফলশ্রুতি। খেলায় জয় লাভের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধতা অত্যাবশ্যক। তেমনি কোনো জায়গায় পৌঁছতে হলে লক্ষ্যহীনভাবে এগোলে কিছুতেই সাফল্য অর্জিত হবে না। পরিকল্পনা মাফিক যাত্রা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, খেলোয়াড়রা যখন খেলতে নামেন তারা অঙ্গীকার করেন জেতার জন্য তবুও একদল হেরে যান। এই হেরে যাওয়ার কারণ তাদের ক্ষমতা বা দক্ষতার অভাব নয় বরং তাদের অঙ্গীকার বা আবেগের ব্যাপারটি।

অঙ্গীকার বা অবেগের ব্যাপারটা খেলোয়াড়দের মনে যত প্রবল থাকে ততই সফলতার দ্বার উন্মুক্ত হতে থাকে। তাই প্রত্যেকটি কাজেই সঠিক পরিকল্পনা ও অঙ্গীকারাবদ্ধতা অত্যাবশ্যক।

দায়িত্ববোধ (Responsibility)

বিজয়ীরা দায়িত্ব গ্রহণ করেন নির্দ্বিধায়। তারা সিদ্ধান্ত নেন এবং নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারিত করেন। দায়িত্ব নেওয়ার অর্থ ঝুঁকি নেওয়া এবং জবাব দিহিতার দায় মাথায় নেওয়া। দায়িত্ব নেওয়ারই দায়িত্বশীলতা। ভাগ্য পরিবর্তনে দায়িত্বশীল হোন। জীবনে সফলতা লাভের জন্যেই তো দায়িত্বশীলতা আবশ্যক। আপনি দায়িত্ব না নিয়ে, দায়িত্বশীল না হয়ে প্রচুর বিত্ত ও বৈভবের মালিক হবেন, নাম যশ পাবেন এবং সুন্দর জীবন-যাপন করবেন তা সম্ভব নয়। সফলতা লাভের জন্য আপনাকে দাযিত্বশীল হতে হবে। ভাগ্য বদলাতে দায়িত্ব নিতে হবে এবং এ ঝুঁকি থেকেই আসবে আপনার কাঙ্ক্ষিত সাফল্য।

চরিত্র উন্নয়ন (Character develop)

এই পৃথিবীতে যারাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাদের প্রত্যেকের জীবনে উত্তম চরিত্র ও আদর্শের নজীর রয়েছে। চরিত্র হল মানুষের মূল্যবোধসম্পন্ন বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের সমন্বয়। আমাদের কাজে-কর্মে ও ব্যবহারে চরিত্র প্রতিফলিত হয়। চরিত্র মানুষের মহত্ব প্রকাশের প্রতীক। চরিত্র মূল্যবান রত্নের চেয়েও দামী। সৎ চরিত্রের

www.pathagar.com

গুণাবলীর জন্য আপনার জীবনে অনেক কিছুই অর্জন করা সম্ভব। আপনার চরিত্র যদি সুন্দর ও মধুময় হয় তাহলে পৃথিবীর সকল লোকই আপনার সামনে মস্তক অবনত করতে বাধ্য। তাই জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য চরিত্রবান হওয়া অত্যাবশ্যকীয় গুণ। সফলতা এবং চরিত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ইতিবাচক বিশ্বাস (Positive believing)

সাফল্য লাভের জন্য ইতিবাচক আত্মবিশ্বাসী মনোভাব অতি প্রয়োজনীয় একটি গুণ। কাজেই সাফল্য লাভের জন্য যেমন দৃঢ় বিশ্বাসী হতে হয় তেমনি ইতিবাচক মনোভাবেরও দরকার হয়। আপনার মনের মাঝে যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তাহলে আপনার জীবনে সফলতা আসবেই। আত্মবিশ্বাস ব্যতীত জীবনে কোনো কাজেই সফলতা লাভ হয় না। তাই সফলতার পূর্বশর্ত হচ্ছে ইতিবাচক আত্মবিশ্বাসী গুণাবলী সম্পন্ন মনোভাব থাকা চাই।

অধ্যবসায় (Persistence)

আপনি জীবনে কি হতে চান—তা শুধু আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করবে না বরং আপনি কাজটির প্রতি কতটুকু অধ্যবসায়ী তার উপরই নির্ভর করবে আপনার সফলতা। প্রতিভা বা শিক্ষা থাকলেই জগতে সফল হওয়া যায় না। এ পৃথিবীতে অনেক শিক্ষিত বিফল লোক রয়েছেন। প্রত্যেক সফল ব্যক্তিই অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তার লক্ষ্যকে নির্ধারণ করে সামনে এগিয়ে গেছেন। কাজেই সফলতার মানদণ্ডে অধ্যবসায়ের কোনো বিকল্প নেই। যাদের সহজাত দক্ষতা আছে তাদেরও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে সহজাত দক্ষতা ছিল অথচ জীবনে সফল হতে পারেননি এমন লোকের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। প্রতিভাবানদেরও অধ্যবসায়ের বিশেষ প্রয়োজন পড়ে। কথায় আছে, 'সাফল্যবিহীন প্রতিভা' অর্থাৎ প্রতিভা থাকলেই সফল হওয়া যায় না। শিক্ষা ও অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই। অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানুষেরাই সফলতার উত্তরাধিকারী। এ জন্যেই মহাবিজ্ঞানী নিউটন বলেছিলেন, "আমার আবিষ্কারের কারণ প্রতিভা নয়। বহু বছরের অধ্যবসায় ও নিরবচ্ছিন্ন চিন্তার ফলেই আমি আমাকে স্বার্থক করেছি, যখন আমার সামনে যা এসেছে, শুধু তারই মীমাংসায় আমি ব্যস্ত হয়ে অধ্যবসায়ে লিপ্ত থাকতাম। অস্পষ্টতা থেকে ধীরে ধীরে স্পষ্টতার মধ্যে উপস্থিত হয়েছি, এতেই আমি সফল হয়েছি।"

ভলটেয়ার বলেছেন, "প্রতিভা বলে কোনো জিনিস নেই। পরিশ্রম কর, অধ্যবসায়ী হও—প্রতিভাকে গ্রাহ্য করে সফল তুমি হবেই।" ডালটলকে লোকে

www.pathagar.com

প্রতিভাবান বলতো, কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করে বলেছেন, "পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ছাড়া আমি কিছুই জানি না—পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণু সাধনার সম্মুখে কোনো কিছুই সম্ভব নয়।"

শেখার আগ্রহ (Willingness to learn)

সাফল্য লাভের অন্যতম প্রধান শর্ত হল নিয়মিত শিক্ষা লাভ বা জ্ঞানার্জনে নিজেকে ব্যাপৃত রাখা। অনেক জেনে ফেলেছি আর দরকার নেই এই নেতিবাচক মনোভাব থেকে দূরে থাকা এবং ইতিবাচক ভাবনায় মনে করিয়ে নেয়া যে, শেখার শেষ নেই। কাজেই শেখার প্রবল আগ্রহ তৈরী করা। আপনার আদর্শ হওয়া উচিত যতদিন বেঁচে আছি ততদিন শিখব। আপনি সব জান্তা ভাব দেখালে কখনো শিখতে পারবেন না। আপনাকে সব সময় একজন শিক্ষার্থী মনে করতে হবে। যারা সারা জীবন শিখে যান তারাই মূলত জ্ঞান-বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে সবকিছুতেই পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং তারাই সাফল্যের উত্তরসূরী। মহাজ্ঞানী সক্রেটিস জানেন না যে, তাঁর শিষ্য প্লেটো আজ বিশ্ব নন্দিত দার্শনিক। কারণ তিনি তা দেখে যেতে পারেননি। অথচ প্লেটো তাঁর কাছ থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবকিছু রপ্ত করেছেন। সমগ্র বিশ্বে প্লেটোর নাম আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। আবার প্লেটো জানেন না তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে কত বড় আসন দখল করে আছেন। অ্যারিস্টটলকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে তাঁর হাত পরেনি। মোটকথা সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল এঁরা সবাই বিশ্ব নন্দিত, বিশ্ব সেরা দার্শনিক। মূলত একে অপরের কাছে শিক্ষা লাভ করে তাঁরা আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কাজেই শেখার আগ্রহের গুরুত্ব সীমাহীন।

মনোভাবের গুরুত্ব (Importance of Attitude)

সফলতার জন্য আপনার দরকার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব। অর্থাৎ ইতিবাচক মনোভাব থাকা চাই। সমাজের যে যাই বলুক, হাসাহাসি করুক তাতে আপনার কিছু যায় আসে না। আপনার কাজ আপনি চালিয়ে যান। আপনি চান, সুখ ও সাচ্ছন্দ্যময় জীবন। জীবনে আপনি কি চান, কতদিনে চান—এসবের একটি ছক তৈরী করে পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হোন। এভাবে যখন আপনার দৃষ্টিভঙ্গি একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ক্রমাগত একনিষ্ঠভাবে অগ্রসর হবে, তখনই আসবে আপনার সফলতা। সোজা কথা— "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান আপনি বদলে যাবেন।"

www.pathagar.com

জীবনে সফলতার জন্য অবশ্যই পুঁজির প্রয়োজন। তবে এখানে পুঁজি বলতে টাকা পয়সাকে বুঝানো হয়নি। পুঁজি বলতে মূলত সময়, প্রচেষ্টা ও প্রজ্ঞা বিকাশের ও লাভের নিমিত্তে কঠোর সংগ্রামকে বুঝানো হয়েছে। আর এসব অবশ্যই চলমান ভিত্তিতে করতে হবে।

কর্ম-উদ্যমী হোন (Be a Enthusiastical Worker)

উদ্যম ও সাফল্য হাত ধরাধরি করে চলে। কিন্তু প্রথমে প্রয়োজন উদ্যমের। উদ্যম আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে, মনোবল উন্নত করে, কর্মের প্রতি দৃঢ়তা ও আনুগত্য তৈরী করে—এক্ষেত্রে বলা যায় এটি একটি অমূল্য সম্পদস্বরূপ। উদ্যম আপনার সামগ্রিক কাজকে সীমাহীন গতিশীল করে তুলবে। মোটিভেশনাল মুভমেন্টের প্রধান কাজ হচ্ছে প্রত্যেক কর্মীকে তার কাজের প্রতি সীমাহীন উদ্যমশীল করে তোলা। উদ্যম থাকলে কাজ যতই দীর্ঘ হোক তা ধৈর্য্যের সাথে সম্পন্ন হবেই। আর ধৈর্য্য সহকারে কাজ সম্পন্ন হলেই তাতে সফলতা সুনিশ্চিত হয়। কারণ মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনেও ঘোষণা দিচ্ছেন যে, "ইন্নাল্লাহা মা'আস ছবেরীন, অর্থাৎ আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।" আর উদ্যমশীল মূলত ধৈর্য্য হারা হন না বিধায় সহজেই সফলতার শীর্ষে আরোহন করতে পারেন। দৈর্ঘ্য দিনের পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সহিষ্ণুতা ব্যতীত কোনো কাজেই সফলতা লাভ হয় না। মানুষ যা ইচ্ছা তাই সম্ভব করতে পারে যদি তার মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলীগুলো গভীরভাবে বিদ্যমান থাকে। কাজেই সফলতার জন্য চাই একাগ্রতা, আত্মবিশ্বাস, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দৃঢ় প্রত্যয়, উদ্যম ও সাধনা।

আন্তরিকতা ব্যতীত কোনো কাজই সফলভাবে সম্পন্ন হয় না। জগতে যে সমস্ত কাজ সফলতার সাথে সম্পন্ন হতে দেখা যায় কিংবা কোনো ব্যক্তি জীবনে সফলতার শীর্ষে আরোহন করার নজীর চোখে পড়ে তার মূলেই রয়েছে, কঠিন শ্রম, উদ্যম, সংকল্প, ত্যাগ ও দুঃখ-কষ্টকে জয় করার সীমাহীন আত্মশক্তি। সত্যিকারের সফলতা পেতে হলে অলসতাকে তাড়াতে হবে। অতি সকালে ঘুম ত্যাগ করুন। সারাদিনে কি কাজ করা দরকার ভেবে-চিন্তে মনোযোগ দিন। একটার পর একটা কাজ শেষ করার প্রতিপ্রায়ী হোন। সফলতার পথ তো এভাবেই তৈরী হয়।

www.pathagar.com

কর্মী, ধ্যানী, গুণী ও সাধকের কাছে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে বলে কিছু নেই। তাদের দরকার অধ্যবসায়, অনুশীলন, কঠোর শ্রম ও সাধনা করার উদ্যমশীল মন ব্যস; এগুলোই সফলতার মৌলিক গুণাগুণ। তারা সব সময়ই কাজে ডুবে থাকেন। কাজের মধ্যেই তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সমৃদ্ধি-প্রবৃদ্ধি, কল্যাণসহ যাবতীয় মানবীয় চিন্তা-চেতনার অভিব্যক্তি। অধ্যবসায়ী হলে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা আসবে, কোথা থেকে উদ্যম আসবে, কেমন করে আসবে; বুদ্ধির ব্যপ্তির দ্বারা আপনার সমস্ত পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে—এসব আপনি ভেবেও পাবেন না। আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে এমন কতগুলো শক্তির অধিকারী করে গড়ে তুলেছেন যে, সে ঐ শাক্তিগুলোকে কাজে লাগিয়ে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সাফল্যের সৌধ নির্মাণে সক্ষম। এতে কারো কাছে ছোট হওয়ার, হাত পাতানোর কোনো আবশ্যকতা নেই।

পৃথিবীতে জন্মালেই কেউ সফল হন না। কিংবা জন্ম লগ্নেই সফলতা নিয়ে কেউ পৃথিবীতে আসেন না। সাফল্য আসে পর্যায়ক্রমে অধ্যবসায়ের হাত ধরে—ধীরে ধীরে ধৈর্য্য ও কঠোর শ্রমের উপর ভর করে। ধরতে পারেন একটি শিশু জন্মের পর যেভাবে আস্তে আস্তে হাঁটা, চলা, কথা বলা ইত্যাদি শেখে ঠিক তেমনি সাফল্যও তাই। কাজেই সাফল্য লাভের জন্য উপরোক্ত গুণাবলীগুলোর কোনো বিকল্প নেই।

মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের শিষ্য হওয়ার জন্য এক যুবক তার সামনে এলেন। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তোমার লক্ষ্য কি? কিন্তু সে লক্ষ্য সম্পর্কেই অজ্ঞ তাই জবাব দিতে পারেননি। তখন সক্রেটিস তাকে লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন করে দিলেন। তাই লক্ষ্য স্থির করে লক্ষ্যে পৌছানোর মাঝেই সফলতার হাতছানি।

পৃথিবীর সব মানুষই সাফল্য লাভের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। কিন্তু সাফল্য অর্জনের জন্য যে অভিজ্ঞতা ও সীমাহীন কর্মদক্ষতার প্রয়োজন তা অনেকেই হয়তো জানেন না। আর এ জানার জন্যেই মানুষকে হতে হয় বিচিত্র জ্ঞানের অধিকারী। আমি মানুষকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলি এজন্য যে, তার বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিশেষ প্রয়োজন। কারণ অভিজ্ঞতাই জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাই সফলতার উৎস।

কোনো কাজের পূর্ব ধারণা না থাকলে যেমন সে কাজ সুসম্পন্ন হয় না, তেমনি অভিজ্ঞতার অভাবে অনেকেই জীবনে সফলতার মুখ দেখেন না। একটি মেশিনের যেমন সংযুক্ত সব যন্ত্রপাতিই মেশিনটিকে চলতে সাহায্য করে, তেমনি মানব জীবনের অনেকগুলো গুণাবলী রয়েছে। এখানে অভিজ্ঞতাও তার সাফল্য অর্জনের

www.pathagar.com

অন্যতম একটি গুণাবলী। যা তাকে দ্রুত সাফল্য অর্জনে সমর্থ করে তোলে। মানুষ হিসেবে আপনার যেমন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন নিজেকে জানার।

যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয়। আপনি কে? এর বহু উত্তর হতে পারে; আপনি হয়ত সহজেই বলবেন, 'আমি একজন মানুষ।'

আপনি কি সুস্থ সবল মানুষ? ..... আপনার দু'টি হাত, দু'টি পা, দু'টি চোখ, দু'টি কান; অর্থাৎ শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই কি পূর্ণাঙ্গ?

তাহলে আপনিই জগতের সবচাইতে সুখি।

চারিদিকে তাকালে হয়ত আপনার চোখে পড়বে; বিকলাঙ্গ, অন্ধ, নানান প্রকৃতির অঙ্গহীন মানুষ। তারাতো আপনার মতই বাঁচতে চায়? আর এ অধিকারটুকু আদায় করতে প্রতিনিয়তই যুদ্ধ করে বাঁচতে হচ্ছে তাদের।

যে অন্ধ সে দেখতে পাচ্ছে না! যে পঙ্গু সে হাঁটতে পারছে না! এভাবে বহু প্রতিবন্ধী মানুষ পৃথিবীতে আছে। আবার, কারো অঢেল সম্পদ আছে, কিন্তু আপনার মত সুস্থ সবল নয়। আসলে শুধু অর্থই মানুষকে সুখি করতে পারে না। যে মানুষটি সুস্থ সবল ও উন্নত মনের অধিকারী সেই প্রকৃত সুখি।

একদিন এক বন্ধুর সাথে সচিবালয়ে গিয়ে দেখি, একজন অফিসার সেখানে কাজ করছেন। তাঁর দু'হাত কব্জি পর্যন্ত বাঁকা, কিন্তু বাঁচার তাগিদে সমাজের অন্য সব সুস্থ সবল মানুষের মত অফিস করতে হচ্ছে, রীতিমত কাজ করতে হচ্ছে। অথচ তিনি যে কত কৌশলে, হাত ঘুরিয়ে কাজ করছেন, তা দেখলে হয়ত আপনারই ভীষণ মায়া হবে। তাহলে এবার চিন্তা করে দেখুন। লেখাপড়ার জন্য, পরীক্ষায় পাস করতে তাকে আরো কত কষ্ট করতে হয়েছে। এবার হয়ত বুঝেছেন! 'কর্ম ছাড়া পৃথিবীতে কোনো মানুষ নেই; যার কর্ম নেই; তার বেঁচে থাকার স্বপ্ন শিকড়বিহীন বৃক্ষের সমতুল্য।'

মনে করুন আপনি একজন ছাত্র। আপনি কি নিয়মিত অধ্যয়ন করেন? আপনার প্রধান কাজ হচ্ছে; নিয়মিত অধ্যয়ন করা।

প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে তিনটি কাল বা পর্যায় রয়েছে—বাল্যকাল, যৌবনকাল ও বৃদ্ধকাল। এই তিন কালের মধ্যে দু'টি কালের সাথে মানুষকে যুদ্ধ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে হয়; আর তৃতীয় কাল; এ দু'টি কারের উপর নির্ভর করে। এ যুদ্ধে যারা জয়ী হতে পারেন, তারাই জীবনে সফলতা লাভ করেন। মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত হলেও এর ক্ষেত্র বিশাল। এখানে মানুষ তার আপন কর্মের দ্বারা আজীবন বেঁচে থাকেন।

www.pathagar.com

পৃথিবী সৃষ্টি লগ্ন থেকে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। শুধুমাত্র হাতে গোনা কয়েকজনের নাম আজও মানুষ ভুলতে পারেনি। সকল মানুষের হৃদয়ে কৌতূহলের বিস্ময় হয়ে আছেন তাঁরা। ইতিহাসে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, ধর্মে, দর্শনে, মানব সেবায় ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। মানুষ শ্রদ্ধাভরে আজও স্মরণ করছেন তাঁদের, অথচ শত শত বছর পূর্বেই তারা পৃথিবী ত্যাগ করেছেন।

বলতে পারবেন কেন তাদের সবাই স্মরণ করছেন?

কেন তাদের জীবনী পাঠে ও প্রতিভার জোয়ার দেখে আপনার শরীর শিহরে উঠছে?

কেন তাদের কথা শুনে সবার মনে নব চেতনার উদ্ভব ঘটছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর একটিই; কারণ, তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা, বিলাসবহুল জীবন তুচ্ছ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার অধ্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং সফলতার স্বর্ণশিখরে আরোহন করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন—"লাইসা লিল ইন্সানে ইল্লা মা সা'আ" অর্থাৎ মানুষের জন্য শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই নাই। সফলতা অর্জন একমাত্র শ্রমের দ্বারাই সম্ভব। জ্ঞানীর জ্ঞান, বিজ্ঞানীর আশ্চর্য আবিষ্কার, নিজেকে মেধাবী করে তোলা, ধর্ম সাধকের আত্মোপলব্ধি, ধনীর ধনভাণ্ডার, যোদ্ধার যুদ্ধে জয়লাভ, সবকিছুই শ্রমের দ্বারা অর্জিত। মানব জীবনের সকল উন্নতির মূল চাবিকাঠিই হচ্ছে শ্রম, সুতরাং শ্রম ব্যতীত উন্নতির আশা করা, আর কল্পনার মাঝে নীল আকাশ ভ্রমণ করা সমান।

একটি প্রবাদ আছে, "বসে খেলে রাজার বিশাল ভাণ্ডারও শূন্য হয়ে যায়।" সুতরাং শ্রমের গুরুত্বকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আল্লাহ্ মানুষকে দেননি। তাই তিনি বলেছেন—"যে নিজেকে সাহায্য করে, স্বয়ং আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন।" ইংরেজিতে এটি একটি প্রবাদ—"God helps those who hep themselves."

শ্রমের প্রতি ঔদাসীন্যতায় অতীতে বহু জাতির পতন হয়েছে, এ জন্যেই জনৈক মনীষী বলেছেন—"তোমার ক্ষুদ্র জীবনটাকে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা যত পার স্বার্থক করে তোল।"

শ্রম ব্যতীত প্রতিভাবান হতে চাওয়া, অরণ্যে রোদনের সামিল, কারণ "Industry is the mother of goodluck." অর্থাৎ পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন বলেছিলেন, "আমার আবিষ্কারের কারণ, প্রতিভা নয়, বহু বছরের চিন্তাশীলতা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে দুরূহ তত্ত্বগুলোর রহস্য আমি ধরতে পেরেছি, অস্পষ্টতা থেকে ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতার দিকে উপস্থিত হয়েছি।"

www.pathagar.com

ডালটন এক বিবৃতিতে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন—"লোকে আমাকে প্রতিভাবান বলে, কিন্তু আমি পরিশ্রম ছাড়া কিছুই জানি না।" সুতরাং শ্রমের প্রতি অবহেলায় বা সামান্য ত্রুটির কারণে, ব্যর্থ হয়ে পিছপা হওয়া, বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কথায় আছে—একবার না পারিলে দেখ শত বার।

ইংরেজিতে আছে "Failurs is the pillar of success." যিনি বিফলতার তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে অধ্যবসায়ের সাথে কার্যে অগ্রসর হন, সফলতা তার জন্য সুনিশ্চিত।

উল্লেখ্য যে, স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস; ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ডের সাথে পর পর ছয়বার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, শেষে নিরাশ মনে বহুদিন জঙ্গলে ঘুরছিলেন। হঠাৎ একদিন তার চোখে পড়ে একটি মাকড়সাকে। মাকড়সাটি পরস্পর দু'টি কড়িকাঠে সুতো জড়াতে চেষ্টা করছে, কিন্তু বার বার ব্যর্থ হচ্ছে; অবশেষে সপ্তম বারে সুতো জড়াতে পারা দেখে, তিনি অনুশোচনা প্রকাশ করে, অদম্য উৎসাহ নিয়ে সপ্তম বারের মত শত্রু রাজ্য আক্রমণ করে স্বদেশ উদ্ধার করেন।

মঙ্গল গ্রহে পাড়ি জমানো, চাঁদে যাওয়া মানুষের কাছে একদিন কল্পনার বস্তু ছিল। কিন্তু মানুষ পরিশ্রমের দ্বারা গবেষণা ও বহু চেষ্টার মাধ্যমে, এ অসম্ভব কল্পনার বস্তুটিকেও আজ সম্ভব করে তুলেছেন। এসবের মূলে রয়েছে কঠোর অধ্যবসায়।

উন্নত বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করলে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ধারা পরিলক্ষিত হয়। যে জাতি অলস ও শ্রমবিমুখ সে জাতির সকল মাধ্যমই অনুন্নত।

এ কথাটি চিরসত্য যে, Education is the back bone of a nation. অর্থাৎ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, কিন্তু কঠোর অধ্যবসায় তথা অনুশীলন ছাড়া কেউ শিক্ষা লাভ করতে পারেনি।

যদি বলি আপনি একজন ছাত্র। তাহলে আপনার প্রধান দায়িত্ব লেখাপড়া করা। পূর্বে উল্লেখিত মানব জীবনের তিনটি কালের মধ্যে দু'টি কারের সাথে আপনাকে যুদ্ধ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এ যুদ্ধ কোনো দেশ জয়ের যুদ্ধ নয়; কোনো ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়, বরং নিজের আত্মার সাথে যুদ্ধ।

মানুষের মন এক বিচিত্র লীলাক্ষেত্র। আনন্দ আহ্লাদে থাকতে চায় সে সারাটি জীবন; কিন্তু অতিরিক্ত আনন্দ আহ্লাদ মানুষকে তার দায়িত্বের প্রতি অবহেলিত করে তোলে।

প্রবাদ আছে, "Too much cunning overreaches itself." অর্থাৎ অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।

মনে করে দেখুন আপনি যখন শিশু ছিলেন, যখন তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়তেন; তখনকার সেই মানুষিকতা সেই বোধগম্যতা কি এখন আছে?

www.pathagar.com

আবার আপনি যখন নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্র, তখনকার মননশীলতার সাথে বর্তমান কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতা কি একই রকম?

আবার, কলেজ জীবন ছাড়িয়ে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অভিজ্ঞতা কি একই?

কলেজ জীবনের জড়তাগুলো কি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পরিবর্তিত হয়নি?

তাহলে আপনার লেখাপড়া জীবনের স্তর বিন্যাস করে দিচ্ছি। মানব জীবনের কাল ও পর্যায় যেমন—বাল্যকাল, যৌবনকাল ও বৃদ্ধকাল; অনুরূপ শিক্ষা জীবনের—স্কুল জীবন, কলেজ জীবন ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবন।

শিক্ষানীতি জাতীয়ভাবে যে স্তর বিন্যাস করেছেন তা এরই পরিপূরক। যথা ঃ—প্রাথমিক স্তর; মাধ্যমিক স্তর ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। এক্ষেত্রে শিক্ষা জীবনের ভিত্তি—"Foundation of first life, হচ্ছে—প্রাথমিক স্তর "Foundation of second life" হচ্ছে—মাধ্যমিক স্তর এবং "Foundation of last life" হচ্ছে— উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। সুতরাং সবগুলো স্তরেই ব্যর্থ হলে জীবন গঠনের কোনো উপায় নেই।

হয়ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ভিত্তি পরস্পর তিনটি হলো কি করে?

তাহলে ইংরেজিতে একটি প্রবাদ মনে পড়ে "To err is human." মানুষ মাত্রই ভুল অর্থাৎ মানুষ দোষে-গুণে সৃষ্টি। মুসলমানদের আদি মানব হযরত আদম (আঃ)ও ভুল করেছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয়, মানুষ বলতেই ভুল করতে পারে। মানুষ যদি ভুল করতে পারে। তাহলে একজন ছাত্রের ভুল করা স্বাভাবিক। আর এ স্বাভাবিক জীবন থেকে ফিরে আসার জন্য শিক্ষা জীবনের স্তরগুলো। যে এই তিনটি ভিত্তি সুন্দরভাবে সাফল্যের সাথে অতিক্রম করতে পারবে, তার জীবন স্বার্থক এবং যদি কোনো স্তরেই লেখাপড়া ঠিকমত না করেন; তাহলে তিনটি ভিত্তিই দুর্বল হয়ে যাবে। যেমন বিল্ডিংয়ের ভিত্তি দুর্বল হলে; আস্তে আস্তে তা নিঃশেষ হতে থাকে; তেমনি আপনার জীবন ক্রমে ক্রমে বাধার সম্মুখীন হতে থাকবে। সুতরাং আপনার শিক্ষা জীবনের ভিত্তিগুলো শক্তিশালী করে তুলুন।

এখনও হয়ত সময় আছে, অন্তত Foundation of last lifeটি শক্তিশালী করে তুলুন। আর যদি না পারেন; তাহলে ধ্বংস অনিবার্য। কারণ, এর পরেই আপনাকে কর্মজীবনে পা রাখতে হবে।

প্রত্যেক স্তরের সফলতার উপর নির্ভর করে একজন ছাত্রের পদযাত্রা। স্কুল জীবন, কলেজ জীবন ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবন, এক একটি স্তরই অভিজ্ঞতার এক

www.pathagar.com

একটি অধ্যায়। আর এসব অধ্যায়ের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ শিক্ষাজীবন। যা মানব জীবনের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

লেখাপড়া জীবনের সাথে পরিবেশ ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার বেশ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ জীবন সংযম আর অধ্যবসায়ের হাতিয়ার। প্রতিটি পদক্ষেপে সচেতনতা ও দৃঢ়তার আশ্রয় নিতে হয়।

স্কুল জীবনে সফলতা অর্জন করেও কেউ কলেজ জীবনে অবহেলার কারণে, জীবনের গতিপথ হারিয়ে ফেলেন। কলেজ জীবনে সফলতা অর্জন করেও অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে অবহেলার কারণে হতাশা ভোগ করেন। অতএব প্রত্যেকটি স্তরেই নতুন নতুন প্রেরণা নিয়ে অধ্যবসায়ে লিপ্ত হতে হয়।

আর কেউ বা বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হন।

আবার অনেকের প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তা কাজে না লাগিয়ে প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটান। আবার, কারো তা বিকাশের সুযোগ নেই। নানান ধরনের বাধার সম্মুখীন এসব জীবন; যা ভেদ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও এভাবে অনেক জীবন বিপন্ন হতে পারে।

মানুষ সুখের সন্ধানী। সুখের নেশায় জগতের প্রত্যেকটি মানুষ ছুটাছুটি করছে। কিন্তু কেউ যদি ভাত যে, সুখ কার নেশায়?

মানুষ চায় দুঃখ কষ্টগুলো এড়িয়ে সুখকে জড়িয়ে ধরতে, কিন্তু সুখকে জড়িয়ে ধরতে হলে দুঃখ-কষ্টকে জয় করতে হবে। তা কেউ ভাবেন না।

সুখ দেখার বস্তু নয়, অনুভব সাপেক্ষ। দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা যেমন কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু সুখ আর এসব পরস্পর বিপরীত মুখী।

একদিকে দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা। অপরদিকে সুখ-আনন্দের স্বাচ্ছন্দ্যময় গতিধারা। প্রথমটির সাথে জীবনযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে দ্বিতীয়টির শরণাপন্ন হতে হয়। প্রতিটি পদে পদে মানব জীবনকে এ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হয়; আর এর একমাত্র হাতিয়ার অধ্যবসায়, যার মাঝে ("পরিশ্রম-চেষ্টা-অনুশীলন") বিদ্যমান।

অধ্যবসায়ী ব্যক্তির মাঝে 'সময় নিয়ন্ত্রণ।" চিন্তাশীলতা— 'চিন্তা-ভাবনায় কাজ করা।" লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ—'নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থলে পৌছার একাগ্রতা।"

অটল ও অবিচল ব্যক্তিত্ব—অর্থাৎ যে সাধনায় আত্মনিয়োগ করবেন, অটল ও অবিচলতার সাথে তা সম্পন্ন করতে হবে। এভাবে নানাবিধ গুণে গুণান্বিত হতে হয়, একজন অধ্যবসায়ী ব্যক্তিত্বকে।

www.pathagar.com

তাহলে জীবনে সাফল্য আসবেই।

"পথ পথিকের সৃষ্টি করে না; বরং পথিকই পথের স্রষ্টা"

অর্থ-সম্পদ ছাড়া কেউ পৃথিবীতে চলতে পারে না সত্য, কিন্তু এ কথা চিরসত্য যে তা মানুষের সৃষ্টি। আজ থেকে বিশ বছর আগের পৃথিবী এবং বর্তমানের পৃথিবী অনেক পার্থক্য। বিজ্ঞানের আশ্চর্য আবিষ্কারের দ্বারা পৃথিবীতে মানব সভ্যতার উন্নয়ন সাধন হয়েছে; নিত্য-নতুন সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হচ্ছে—রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, উড়োজাহাজ, পরিবহন এবং কম্পিউটার উদ্ভাবনের মাধ্যমে মানুষ প্রমাণ করেছে তার জ্ঞান ও সাধনাকে। এসব ভাবলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানুষের কাছে অসাধ্য কিছু নেই।

একজন মানুষ হিসেবে আপনার অনেক কিছু হতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে অনেক কিছু করতে, কিন্তু ইচ্ছে করে বসে থাকলেই চলবে না, উপায় বের করতে হবে। আপনার উচ্ছেকে বাস্তবায়ন করতে হলে উপায় ঠিক করে অধ্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করুন। একটি মুহূর্তও যেন অযথা ব্যয় না হয়। এভাবে চেষ্টা চালিয়ে যান। দেখবেন আপনার ইচ্ছাটা পূর্ণ হয়ে গেছে।

এমন অনেক ছাত্র আছে, যাদের মেধা আছে। কিন্তু তার চর্চা নেই, সে মেধা শক্তির কোনো মূল্য নেই। কারণ, মেধাকে কাজে লাগাতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ বলতে হয়, কামার যে লোহার খণ্ডটি আগুনে পুড়িয়ে কোদাল তৈরী করছেন, প্রথম অবস্থায় তা বেশ নতুন হলেও কিন্তু পুরাতন যে কোদালটি দু'বছর ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে তার তুলনায় অনেক কম ধারাল। কারণ, সেটি ব্যবহৃত হতে হতে তীক্ষ্ণ আকার ধারণ করেছে, তেমনি আপনার মেধাশক্তি থাকলে তা কোনো কাজে আসবে না। যদি পরিশ্রমের দ্বারা নিয়মিত অনুশীলন না করেন।

শুধু লেখাপড়া কেন? যে কোনো দিক যদি আপনি বেছে নেন; তবুও আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে। স্মরণ রাখবেন; পরিশ্রম ছাড়া কোনো জাতিই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। আর আপনার কথাতো উহ্য রাখলাম। সর্বশেষ পন্থা হল—পরিশ্রম করুন, কঠোর অধ্যবসায়ে লিপ্ত থাকুন। সাফল্য আসবেই।

জীবন বৈচিত্র্যময়। এর গতি ও ধারা অত্যন্ত নির্মম। এ ধারাকে করায়ত্ত করতে আপনার সাধনাই শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

সুতরাং বৈচিত্র্যময় জীবনের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে তাদের দলে যোগ দিন, যাঁরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে জীবন গড়েছেন। এছাড়া জীবন গড়ার বিকল্প কোনো পথ নেই।

পরিশ্রম ও কঠোর অধ্যবসায় যে সাফল্যের সোনালী সৌধ নির্মাণ করেছিল তা নিম্নের বর্ণনা থেকেই প্রতীয়মান হয়।

www.pathagar.com

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও অভিযাত্রীক থর হেয়ারডাল ১৯১৪ সালে নওয়ের লারভিক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছিলেন। তাঁর অনেকগুলো ইচ্ছে ছিল। যা সত্যিই পূরণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার; তাই অনেকের নিকট তাঁকে উপেক্ষিত হতে হত। আবার অনেকেই তাঁর ইচ্ছেগুলোকে পাগলামীর খেয়ালে ভূষিত করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত জিদি প্রকৃতির। তাঁকে যতই উপেক্ষা করা হয়েছে; তিনি ততই জিদে জিদে নিজেকে শক্ত করে তৈরী করেছেন। মনে মনে কামনা করেছেন আমার ইচ্ছেগুলো পূরণের নির্মাতা আমি; নিজেই যদি না দমি; তাহলে কেউ আমাকে দমাতে পারবে না।

তাহলে কীভাবে তিনি ক্রমে ক্রমে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছে ছিলেন। নিজেকে নিজেই তৈরী করেছিলেন; তার প্রমাণ না দিলে হয়ত অনেক কিছুই আপনার অজানা থেকে যাবে।

থরের অন্যতম আগ্রহের বিষয় ছিল ওশিয়ানিয়া মহাদেশের পুরনো সভ্যতার সন্ধান। ১৯৩৭ সালে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে হাতে-নাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করতে উদ্যত হলেন। তাই তিনি ঠিক করলেন যে, এর জন্য তাঁকে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে সার্কইজেস দ্বীপে পৌছতে হবে। ঐ দ্বীপটিই ছিল থরের প্রধান সন্দেহের বিষয়।

হয়ত পলোনেশিয়ায় সভ্যতা বিস্তারের শিকড়টি অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে। সম্ভবত দক্ষিণ আমেরিকার মায়া-সভ্যতার লোকেরা যে কোনোভাবে এখানে এসে পৌছেছিল। তাদের নিজস্ব সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছিল।

বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা তাঁর মাথায় চেপে বসল। কিন্তু কীভাবে?...

সেই আদিম যুগের লোকদের তো নৌ-বিদ্যা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। সমুদ্র স্রোতের অনুকূল-প্রতিকূল বিষয়েও তাদের কোনো ভৌগোলিক জ্ঞান ছিল না। আবিষ্কার হয়নি জাহাজ। শুরু হয়নি বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

তাহলে কীভাবে সেই লোকেরা প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঐ ছোট্ট দ্বীপে পৌছেছিল? নিজেকে নানারকম প্রশ্ন করে থর ১৯৩৮ সালে আবার নরওয়ে ফিরে গেলেন। নানারকম ঐতিহাসিক প্রমাণ ঘেঁটে এবার তিনি এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পৌছলেন। দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা যদি পলোনেশীয় দ্বীপে সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়ে থাকে; তাহলে অবশ্যই তাঁরা কাঠের ভেলায়ই প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিল। এছাড়া অন্য কোনোভাবে তা সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যেই শুরু হল দ্বিতীয় 'বিশ্বযুদ্ধ', বাধ্য হয়ে থরকে যুদ্ধে অংশ নিতে হল। বাধা পড়ল তাঁর কর্মকাণ্ডে। থর হেয়ারডাল তখন নরওয়ে বিমান বাহিনীর একজন সৈনিক।

www.pathagar.com

অবশেষে ১৯৪৭ সালে থর তৈরী হলেন তাঁর অভিযানের জন্য। তাঁর এই পাগলামীর জন্য বেশ অবজ্ঞা ও হেয় কুড়াতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কাছে তা মোটেও পাগলামীর বস্তু ছিল না। বৈচিত্র্যময় জীবনে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং বিভিন্ন সভ্যতার সন্ধান ও জ্ঞান অন্বেষণের নেশায় তিনি জীবন বাজী রেখে সভ্যতার সন্ধান ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জনতার হেয় ও অবজ্ঞাকে তিনি পেছনে ফেলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে নিজ দেশের বালসা নামক কাঠের গুড়ি দিয়ে একটি ভেলা তৈরী করলেন। কাঠের গুড়িগুলো বাঁধার জন্য তিনি আধুনিকতম কোনো যন্ত্রপাতির ব্যবহার করেননি। ভেলা তৈরী হল। তাতে ছিল ছোট্ট একটি মাস্তুল ও চারকোণা বিশিষ্ট একটি পাল।

পাঁচজন সঙ্গীকে নিয়ে থর হেয়ারডাল এবার প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে ছোট্ট ভেলাটি ভাসিয়ে চললেন। ১৯৪৭ সালের ২৮ এপ্রিল পেরুর মাল্লাও বন্দর ছেড়ে মহাসাগরের বুকে ভেসে পড়লেন হেয়ারডাল।

৪৫ ফুট দীর্ঘ, ১৮ ফুট চওড়া এই ভেলাটির নাম রেখেছেন তিনি 'কন-টিকি'। ৭ আগস্ট টুয়ামোটোস দ্বীপের রাবোরিয়া ঘাঁটিতে 'কন-টিকি' অবস্থান করল। এমনিভাবে বালসা কাঠের ভেলাটি দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ৪৩০০ মাইল পথ পাড়ি দিতে থরের সময় লেগেছিল ১০১ দিন।

প্রমাণিত হল সভ্যতার প্রাথমিক যুগেও মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সভ্যতার বিস্তার ঘটানো অসম্ভব ছিল না। ১৯৪৮ সালে থরের প্রকাশিত 'কন-টিকি অভিযান' গ্রন্থে তিনি বিশদভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন।

মানব জীবন বৈচিত্র্যময় লীলার সমষ্টি। যখন সভ্যতার সূচনা হয়েছিল ঠিক তখন থেকে আজও এ বিচিত্রতা বর্তমান; এবং আজীবন থাকবে। দিন, মাস-কাল, বছর, যুগ ও শতাব্দীর ক্রমান্বয় নিত্য-নতুন সভ্যতার বিস্তার মানুষকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আনন্দ-হাসি, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, উন্নতি-অবনতির বিচিত্রময়তার গতি তার আপন সত্ত্বা নিয়ে ছুটে চলেছে অনন্তকালের দিকে। আনন্দ যেখানে, ব্যথা সেখানে; উন্নতি যেখানে অবনতি সেখানে। কোনো জাতি তার চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা উন্নতির আসনে আসীন হচ্ছে। আবার কোনো জাতি তার কৃতকর্মের দ্বারা অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

মানব জীবন কন্টকাকীর্ণ। প্রতিটি পদে পদে বাধা আসবেই। যে এগুলোকে জয় করতে পারবে, তার জীবনই সুখময়।

নানা রকম বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোর প্রতি থরের আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমল না। পলোনেশীয় সভ্যতার উৎস ঘিরে প্রচলিত রহস্যের দুর্লভ কবল ছিঁড়ে ফেলতে; থর পূর্বের চেয়েও অতিমাত্রায় আগ্রহ নিয়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালে ঘুরে এলেন গালাপগোস দ্বীপপুঞ্জ।

www.pathagar.com

তথাকথিত প্রবল জনমতের পাগলামীর রেওয়াজকে প্রমাণ করলেন যে, থরের ইচ্ছে পূরণের ক্ষমতাই, তার দুর্লভ চেষ্টা ও পরিশ্রমের জবাব।

.... কিন্তু থর তবুও থেমে থাকেননি? আমাদের দেশের স্কুল-কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ ভাবেন; ফাইনাল পরীক্ষার পর ফলাফল প্রকাশ অবধী তাদের ছুটি। আবার রেজাল্ট বের হওয়ার পরও নতুন ক্লাশে ভর্তি হওয়া অবধী এই সুদীর্ঘ সময় তারা বেশ আরামেই ঘুরে থাকেন। তখন বইয়ের সাথে কোনো সম্পর্কই তাদের থাকে না। তবে হ্যাঁ একজন ছাত্রের মানুসিক শক্তি বিকাশের জন্য, বাস্তব জ্ঞানের অভিজ্ঞতার জন্য, বিভিন্ন জনের ও বিভিন্ন স্থানের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বইয়ের সাথে সম্পর্ক না রাখলে, যা শিখেছেন তার চর্চা না করলে। এ ঘুরে বেড়ানোর কোনো স্বার্থকতা নেই। পৃথিবীর সকল স্থান থেকে জ্ঞানার্জন করা যায়। যদি আপনার ইচ্ছা শক্তি ও আগ্রহ থাকে।

পারস্যের জনৈক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে তার শিক্ষকের কাছ থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে বলেছিল; স্যার, "আমার পড়ালেখা শেষ, এবার আমি যাই।"

অধ্যাপক মহোদয় তখন হেসে বললেন; "তোমার পড়ালেখা শেষ হয়েছে; কিন্তু আমি কেবল শুরু করেছি।" এ কথার অর্থ দাঁড়ায় মানুষের জীবনে শিক্ষার কোনো শেষ নেই। আমাদের প্রিয় নবীও তাই বলেছেন; "দোলনা হতে কবর পর্যন্ত জ্ঞান লাভ করা ফরয।" এতএব আপনার শিক্ষা জীবনের বিরতি নেই; স্বাভাবিক নিয়মে যেমন, আপনার খাওয়া-পড়া, চলা-ফেরা যাবতীয় কাজ চলছে, বিদ্যার্জনও তেমনি প্রতিনিয়তই আপনাকে করতে হবে। নিয়মের ব্যতিক্রম করলে আপনি পিছিয়ে পড়বেন।

সুতরাং আপনার জীবনে শিক্ষার কোনো বিরতি নেই। বিরতিহীনভাবে নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে প্রতিদিন আপনাকে অধ্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এভাবে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান লাভ করা ফরয। বৈচিত্র্যময় জীবনের কথা বললেই নিম্নের কবিতার লাইনদ্বয় মনে পড়ে—

"যদি বেঁধে রাখা যেত ঐ সূর্যটা
দাঁড়িয়ে থাকত ঘড়ির কাঁটা,
পৌছানো যেত শেষপ্রান্তে
যেখানে জীবনের পূর্ণতা।"

কবিতার এ লাইনগুলো আমার লেখা হৃদয়ের আঙ্গিনায় তুমি শিরোনামের অন্তর্গত, 'আর একটু সময় দাও,' কবিতা থেকে নেয়া, জীবন থেমে নেই। মহামানবগণ সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে জীবনে সফলতা অর্জন করেন। এক একটি মুহূর্ত তাঁদের কাছে এক একটি যুগের সমান; কারণ, মুহূর্ত ক্ষুদ্র হলেও এর সমষ্টি

www.pathagar.com

মানব জীবনকে মৃত্যুর দুয়ারে নিয়ে যায়। তাই জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে; সাফল্যের শীর্ষে থেকেও মহামানবগণ জীবনে তৃপ্ত হতে পারেন না, আফসোস করে থাকেন, যদি আর একটু সময় পেতাম, তাহলে অনেক কিছুই সম্ভব হত। কোথায় জীবনের স্বার্থকতা; কোথায় জীবনের উৎস? কিন্তু পৃথিবীর নিয়তি এতই নির্মম যে শেষ পর্যন্ত তাঁকেও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। বেঁচে থাকে শুধু তার কর্মগুলো আর কর্মের মধ্যেই বেঁচে থাকেন তিনি। মরেও অমরত্ব লাভ করেন।

এত কিছু করার পরও থর অবসর নেননি। ১৯৫৫—৫৬ সালে ইস্টার দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া এক নরওয়ে অভিযাত্রীক দলের নেতৃত্ব দিলেন তিনি। তখন তাঁর লক্ষ্য ছিল ইস্টার দ্বীপের বিশাল মূর্তিগুলোর রহস্যভেদ।

১৯৫৮ সালে প্রকাশিত 'আকু-আকু-ইস্টার দ্বীপের রহস্য' গ্রন্থে থর এই অভিযানের এক দুর্ধর্ষ বর্ণনা দিয়েছেন।

থর হেয়ারডালের আর একটি আগ্রহের বিষয় ছিল প্রাচীন মিশরীয়দের নৌ-বিদ্যার কৌশল উদ্‌ঘাটন, তথা জ্ঞান অর্জন। মিশরীয়রা কীভাবে সমুদ্র পথে তাঁদের সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছিল? 'কন-টিকির' অভিজ্ঞতাটুকু আবার কাজে লাগালেন থর। সম্ভবতঃ প্যাপাইরাস গাছ থেকে প্রাচীন মিশরীয়রা তাদের নৌকা তৈরী করত।

মিশরের প্রাচীন সূর্যদেবতা 'রা'-এর নামে থর এবার প্যাপাইরাস দিয়ে এক নৌকা বানিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে বেসে পড়লেন। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছাকাছি এসে সেই নৌকাটি সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙে গেল। তাতেও ভেঙে পড়েননি থর।

আবার 'রা' দুই নামে দ্বিতীয়বার তিনি আরেকটি প্যাপাইরাসের নৌকা বানালেন। ভেসে পড়লেন আটলান্টিকের তীব্র স্রোতে। এবার সফলতা লাভ করলেন থর।

মরক্কোর সাফি বন্দর থেকে বার্বাডোসের ব্রিজটাউন বন্দর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন 'রা' দুই। প্রমাণিত হল; আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত ধরেই হয়তো ছড়িয়ে পড়েছিল মিশরীয় সভ্যতা। বিচিত্রময়তার প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি মানুষ। থর হেয়ারডালই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। জীবন যেখানে বৈচিত্র্যময় তার প্রভাবও সেখানে।

www.pathagar.com

বাস্তব জ্ঞানের জন্য ভ্রমণ

আমরা ভ্রমণ করি—উন্মুক্ত হৃদয় বৃত্তির তাড়নায়। ভ্রমণ জ্ঞান আমাদেরকে বাস্তব দর্শনের সন্ধান দেয়, জীবনকে চরমভাবে উপলব্ধি করতে শেখায়। এখানে জীবনের চাওয়া-পাওয়ার আকুতি নিবিড় হয়। আমরা বুঝতে পারি নিজেকে, দেশকে, প্রকৃতিকে, সর্বোপরি পৃথিবীকে। ভ্রমণের তাড়নায় পড়েই বিশ্ব বিখ্যাত অভিযাত্রীক ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকাসহ পৃথিবীর অনেক অজানা দেশ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন।

ভ্রমণ শুধু ভ্রমণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ভ্রমণ হচ্ছে বাস্তব জ্ঞান, দর্শন, উপলব্ধি ও সকল বিষয়ে উন্মুক্ত জ্ঞানের অকৃত্রিম ভাণ্ডারস্বরূপ।

আপনাকে ভ্রমণ জ্ঞানের কৌতূহল প্রিয়তার জন্য বিজার্নীর প্রথম আমেরিকা দর্শন কাহিনীতে নিয়ে যাচ্ছি।

রেড ইরিক আইসল্যান্ড থেকে মিথ্যা কথা দিয়ে ভুলিয়ে যাদের গ্রিনল্যান্ডে নিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিল হারজলফ। উল্লেখ্য যে, এই হারজলফ-এর নামানুসারে গ্রিনল্যান্ডে একটি শহরের নামকরণ করা হয়েছে। এটি দক্ষিণ গ্রিনল্যান্ডের আজকের একটি বড় সমুদ্রবন্দর।

হারজলফ-এর ছেলে বিজার্নীই সভ্য জগতের মধ্যে প্রথম মানুষ যিনি আমেরিকা দেখেছিলেন। তিনি কেমন করে এখানে এলেন তার কাহিনী বলছি।

সেও ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। এ বছরই রেড ইরিক লোক আনতে আইসল্যান্ডে এসেছিলেন দূর সাগরে মাছ শিকারে। দীর্ঘ মাস খানেক পরে যখন মাছ শিকার করে বাড়ী ফিরে এলেন তখন তো ব্যাপার দেখে অবাক।

ঘরে ফিরে এসে দেখলেন তাদের বাড়ীঘর সব শূন্য। সেখানে বসে আছে অন্য লোক। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন—তার বাবা বাড়ী-ঘর সব বিক্রি করে দিয়ে ইরিকের সাথে গ্রিনল্যান্ড চলে গেছেন। সে বাড়ী কিনে নিয়েছেন তাদের চাচা।

গ্রিনল্যান্ডের কথা অবশ্য বিজার্নীও শুনেছিলেন। ইরিকের কাছেই শুনেছিলেন। তিনি তখন সদ্য ফিরে এসে গ্রিনল্যান্ডের রূপকথা বলে বেড়াচ্ছিলেন লোকের কাছে। তখন তারও শুনে অবাক লাগত।

www.pathagar.com

শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও একবার দু'বার পশ্চিম সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে দূরের সাদা ধবধবে পাহাড় দেখেছেন। কিন্তু ওটাই যে অমন সবুজ শ্যামলিমার দেশ, তা কখনো ভাবেননি। আর এটাও ভাবেননি বাবা তার সাথে কোনো রকম বুদ্ধি পরামর্শ না করেই সব বিক্রি করে দিয়ে ইরিকের সাথে সবুজের দেশে চলে যাবেন।

অতঃপর আর সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো সম্ভব হল না বিজার্নীর। তিনিও তেমনি আবার এসে জাহাজে উঠলেন। নাবিকদের আদেশ দিলেন পাল তুলে দেবার।

নাবিকরা অবাক হয়ে শুধাল—আবার কোথায় যাবে? এই তো এতদিন পরে ঘরে ফিরলাম।

—এবার যাবো ভিন দেশে। বিজার্নী উত্তর দিলেন।

— কোন্ দেশ?

সবুজের দেশ গ্রিনল্যান্ডে। বিজার্নী বললেন, এই যে আমরা পশ্চিম সাগরে গিয়ে সাদা ধবধবে পাহাড়ের চূড়া দেখছি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি।

—ওটাই হল সবুজের দেশ। সেখানে আছে গাছে গাছে ফল, বনে বনে কত শিকারের পশু-পাখি। সেখানে নেই কোনো বরফ। কতই যে মজার দেশ।

—তাই নাকি? ভারি মজা তো!

—হ্যাঁ, বিজার্নী বলতে লাগলেন—বাড়ী গিয়ে শুনলাম বাবা সংসারের সব কিছু বেচে দিয়ে ওই সবুজের দেশে চলে গেছে। তাই আমিও বাবার সাথে মিলিত হবো সেখানে গিয়ে।

অতঃপর আবার তাঁরা জাহাজের পাল উড়িয়ে দিলেন। বিজার্নীর জাহাজ ভেসে চলল পশ্চিম দিকে। তাঁরা যাবেন গ্রিনল্যান্ডের সবুজ শ্যামল ভূমিতে।

এভাবেই তাঁরা পুরো এক সপ্তাহ পর্যন্ত জাহাজ চালিয়ে গেলেন। এক সময় তাঁদের দেশ আইসল্যান্ড চলে গেল দৃষ্টির আড়ালে। তখনো আকাশ পরিষ্কার, সুন্দর বাতাস বইছে। পালতোলা ছোট জাহাজটি ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে ভেসে চলেছে পশ্চিম দিকে।

কিন্তু তারপরই ঘনিয়ে এল বিপর্যয়। আকাশের সূর্য ঢেকে গেল মেঘে। শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়। চারদিক থেকে নেমে এল ঘন কুয়াশা। এমন ঘন কুয়াশা যে, দু'চোখ মেলে চারদিকে তাকিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এই বিপর্যয়কর অবস্থায় পাল তুলে রাখাও সম্ভব নয়।

অতঃপর তাঁরা জাহাজের পাল আর মাস্তুল নামিয়ে ফেললেন। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগরে তাদের মস্ত বড় জাহাজটি ডিঙ্গি নৌকার মতোই খাবি খেতে লাগল।

www.pathagar.com

এমনি করে চলল দিনের পর দিন। বাতাস আর ঢেউয়ের ধাক্কায় কোন্ দিকে যে তাদের জাহাজটি ভেসে যাচ্ছিল তা কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। শুধু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে নিরুদ্দেশের পথে ভেসে চললেন তাঁরা।

দীর্ঘ কয়েকদিন পর দুঃস্বপ্নের ঘোর অবশেষে কাটল। বাতাস থেমে গেল। কেটে যেতে লাগল ঘন কুয়াশা। সাগরের ঢেউ এল শান্ত হয়ে।

অবশেষে আকাশে দেখা দিল সূর্য। আলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তখন তাঁরাও জাহাজের পাল আবার তুলে দিলেন। একদিন চলার পর তাঁদের চোখে ভেসে উঠল সত্যি সত্যি এক অপূর্ব সুন্দর সবুজের দেশ। চারদিকে ঘন অরণ্যরাজিতে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সুন্দর দেশ।

দেখে তা বিজার্নীর নাবিকেরা খুশি হয়ে উঠল।

—এই তো আমরা এসে গেছি সবুজের দেশ গ্রিনল্যান্ডে। ওই তো সামনে ঘন সবুজ গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ দেশ। এটাই তো গ্রিনল্যান্ড।

নাবিকেরা খুশি হলেও বিজার্নীর কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল। তিনি বললেন, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

—কেন? সন্দেহ হবে কেন?

—গ্রিনল্যান্ডের পাহাড়গুলো শুনেছি অনেক উঁচু এবং সাদা ধবধবে তুষারে ঢাকা। এখানে তো কোনো উঁচু পাহাড় নেই। সব সমতল ভূমি।

—তা হলে?

—আমার মনে হয় এটা গ্রিনল্যান্ড নয়।

—বলো কি?

—হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমরা ঝড়ের ধাক্কায় ভাসতে ভাসতে অন্য কোনো নতুন দেশে এসে পেড়েছি।

—কোন্ দেশ এটা?

—তো জানিনে। তবে এটা যে গ্রিনল্যান্ড নয়, এটা আমি নিশ্চিত। বিজার্নী বললেন।

তিনি জাহাজের নাবিকদের পাল নামিয়ে ফেলতেও বলেছিলেন।

নাবিকদেরও খুব আগ্রহ ছিল এই তীরে নামার। ওরা বলছিল, নাই বা হল গ্রিনল্যান্ড, তবু একবার যখন একটা নতুন দেশে পৌছেছি, তখন দেশটা কেমন তা একটু দেখে যাওয়া যাক।

কিন্তু রাজি হলেন না ক্যাপ্টেন বিজার্নী।

—না, আমরা বেরিয়েছি গ্রিনল্যান্ডের খোঁজে। সে দেশটা কোথায় আছে ওটাই খোঁজ করতে হবে আমাদের।

অতঃপর জাহাজের পাল তুলে দেওয়া হল। আবার জাহাজ এগিয়ে চলল উত্তর দিকে।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, বিজার্নীরা প্রথম যে সবুজ দেশটির সন্ধান পেয়েছিলেন এটা ছিল উত্তর আমেরিকার বাফিনল্যান্ড।

এরপর তাঁরা আরো দু'দিন ধরে জাহাজ চালিয়ে গেল সামনের দিকে। এবার তাঁরা আরো একটি দেশের সন্ধান পেল। এটিও ছিল ঘন অরণ্যে ঢাকা দেশ। এখানেও কোনো পর্বত ছিল না। গোটা দেশটাই ছিল ঘাস আর গাছ-গাছালিতে পূর্ণ সমতল ভূমি।

নাবিকেরা এবার শুধাল, তাহলে এটাই হয়তো গ্রিনল্যান। আমরা এবার সত্যি সত্যি সবুজ দেশে চলে এসেছি।

—না, এটাও সবুজ দেশ নয়। বিজার্নী বললেন— সেই দেশে আছে সাদা তুষারে ঢাকা পাহাড়, এ দেশে তো উঁচু কোনো পাহাড় নেই। তাই এটাও গ্রিনল্যান্ড হতে পারে না।

—তা হলে কোথায় তোমার সেই সবুজ দেশ?

—তা জানিনে, তবে আমরা সেই দেশকে খুঁজে বের করবোই, সেখানে আমার বাবা আছেন।

—বেশ তো, তাই না হয় খুঁজে বের করবো। নাবিকরা বলল—আমরা যখন একটা নতুন সন্ধান পেয়ে গেছি। আর দেশটাও দেখতে ভারি সুন্দর। চারদিকে সবুজ শ্যামলিয়ায় ঘেরা।

—তা বটে দেশটা সত্যি সুন্দর।

—তাহলে একবার তীরে নেমে দেশটি দেখে যাওয়া যাক। আর তা ছাড়া এখানে হয়তো কিছু খাবার, শুকনো কাঠ আর খাবার পানি পাওয়া যেতে পারে। এগুলো আমাদের দরকার। এখান থেকে আমরা এগুলো নিয়ে নিতে পারি।

—পারি। বিজার্নী গম্ভীর গলায় বললেন—তার চেয়েও আমাদের বেশি দরকার সবুজ দেশটিকে খুঁজে বের করা।

—তা হলে কি এখানে আমরা নামবো না?

—না।

কেন?

কেন?

—কারণ সত্যিকার সবুজের দেশ এখনো আমরা খুঁজে পাইনি, তাই আমার আদেশ এক্ষুণি সবগুলো পার তুলে দাও। আমাদের হয়তো আরো অনেক দূর যেতে হবে।

বিজার্নী ডাঙ্গার দেখা পেয়েও না নেমেই ফিরে এলেন।

অতঃপর তাই হল। আবার তাদের জাহাজ ভেসে চলল অজানা সমুদ্রের পথে। বিজার্নী আমেরিকার মূল ভূ-খণ্ডের সন্ধান পেয়েও এমনি করে তার তীরে না নেমেই চলে গেছেন।

www.pathagar.com

দীর্ঘ কয়েকদিন একটানা জাহাজ চলার পর তাদের চোখে পড়ল সেই উঁচু পাহাড়। যার শীর্ষদেশ সাদা তুষারে ঢাকা। পাদদেশে সবুজ শ্যামলিমা নেই বটে, তবু কিছু কিছু ঘাস আছে। তবে কাছে গিয়েই বিস্মিত হলেন বিজার্নী। এই দেশটির তীরেই বাঁধা আছে একটি ছোট জাহাজ।

বিজার্নীর চিনতে অসুবিধা হল না। এটা তাঁর বাবারই জাহাজ। তাঁর বাবা হারজলফ আইসল্যান্ড থেকে এসেছিলেন গ্রিনল্যান্ডে।

সত্যি সত্যি বিজার্নী খুঁজে পেলেন তাঁর বাবাকে। মিলন হল পিতা-পুত্রের।

যেখানে বিজার্নীর পিতা হারজলফ তার জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সেখানেই গড়ে উঠেছিল একটি শহর। এবং হারজলফ-এর নামানুসারেই এর নাম রাখা হয়েছে হারজলফনেস। এই হারজলফনেস গ্রিনল্যান্ডের একটি বড় সামুদ্রিক বন্দর এখন।

জ্ঞানার্জনের শেষ নেই, তবে এর তিনটি স্তর আছে। স্কুল জীবন, কলেজ জীবন ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবন। আর বিশ্ববিদ্যালয় জীবন পর্যন্ত যাওয়ার অর্থই জীবনকে ভালভাবে উপলব্ধি করা; কিন্তু এর পরও জীবন অপূর্ণ থেকে যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব দেখা দেয়; আর এই পরিপূর্ণতা লাভের জন্য একজন ছাত্রকে পুস্তকের সীমাবদ্ধ গণ্ডি থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করতে হবে। দেশ-বিদেশে ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়তে হবে।

আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ও ভ্রমণ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করেছেন "তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর।" এখানে মহানবী (সাঃ) জ্ঞান অন্বেষণের জন্য, ভ্রমণের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভ্রমণের মাধ্যমে ও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষভাবে মানুষের মধ্যে যে উপলব্ধি, জ্ঞান, অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয় তা চির অমলিন, প্রাণবন্ত হয়ে থাকে ভ্রমণকারীর হৃদয় পটে, আর তাই মানুষের বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। উন্মুক্ত হৃদয়বৃত্তির জন্য, মানুসিক শক্তির বিকাশের জন্য, জ্ঞান-শিক্ষা সৌন্দর্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ভ্রমণের একান্ত প্রয়োজন।

মানুষ দীর্ঘকাল একই জিনিসে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। সে চিরকালই নতুনের পিয়াসী। বৈচিত্র্যের মধ্যেই সে আনন্দ খুঁজে পায়। ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষের সৌন্দর্য পিপাসা ও কৌতূহলের নেশা পূরণ হচ্ছে এবং মানুষ বিচিত্র দেশ, জাতি ও খোদার সৃষ্টি সমন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারছে।

বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেন ঃ

"Travelling Makes one know the mystery of Lords creation. Travelling gets us self-confident"

অজানাকে জানার উদ্দেশ্যে অদেখাকে দেখার উদ্দেশ্যে মানুষ দেশ ভ্রমণ করে। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই দেখতে পাবেন জ্ঞানার্জনের জন্য সুদূর মিশর, চীন, গ্রীস, মরক্কো ও স্পেন থেকে মানুষ ছুটে এসেছিল ভারতীয় উপমহাদেশে।

www.pathagar.com

আপনি কি নিজের দেশটি ভ্রমণ করেছেন? আপনার দেশে অনেক মজার মজার কৌতূহলপূর্ণ স্থান রয়েছে। যা দেখার জন্য আজো বিভিন্ন দেশ থেকে এসে পর্যটক থেকে শুরু করে ভ্রমণ পিপাসুরা অপার সৌন্দর্য দেখে বিস্মিত হচ্ছে।

ভ্রমণের জন্য বিদেশে যাওয়ার সামর্থ নেই বলে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। কারণ, আপনার আপন দেশেই যা আছে পৃথিবীর অনেক দেশে তা নেই। আবার, আপনার দেশেই এমনকিছু আছে যা পৃথিবীর কোথাও নেই।

আপনার হয়ত ভ্রমণের অভ্যাস নেই; কিন্তু ভ্রমণের কৌতূহল নেই এমন মানুষ বোধ হয় পৃথিবীতে নেই। আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একক বৌদ্ধ বিহারটি কোথায় অবস্থিত? আমেরিকা, রাশিয়া, কানাডা ও বাংলাদেশ। আপনি হয়ত বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে আমেরিকা অথবা রাশিয়াকেই মনোনীত করবেন। হতে পারে আপনার নিজের দেশটি তাদের তুলনায় কম উন্নত; কিন্তু শুনলে হয়ত অবাক হয়ে যাবেন।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ বিহারটি রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। যার নাম পাহাড়পুর। অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকবৃন্দ সেখানে এলেও আপনি হয়ত কোনোদিন যাননি? আবার, যদি প্রশ্ন করা হয়। উপমহাদেশে আড়াই হাজার বছর পূর্বে কোন্ বিখ্যাত শহরটি গড়ে উঠেছিল যা এক সময় বাংলার রাজধানী ছিল?

সে প্রশ্নের উত্তরও হয়ত আপনার জানা নেই। এটি বগুড়া জেলার করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত সেই মহাস্থানগড়।

আপনি যদি মনে করে থাকেন আমার দেশ সম্পর্কে জানতে হবে?

তাহলে বছরের একটি সময়কে চিহ্নিত করে খাতা-কলম হাতে নিয়ে ওসব ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ুন। এমন সময় নির্ধারণ করবেন যাতে আপনার স্কুল, কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ ও লেখাপড়ার বিঘ্ন না ঘটে। অর্থাৎ পরীক্ষার পর যে সময়টুকু অবসর পাবেন সেই ফাঁকে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বেন। কারণ, ভ্রমণ, বাস্তব জ্ঞান অর্জনের এক বিশেষ মাধ্যম। বিশ্বের বড় বড় মনীষীরা পুস্তক জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন; আর ভ্রমণের জ্ঞানকে উন্মুক্ত ও প্রাণবন্ত করেছেন সত্য কিন্তু পুস্তক জ্ঞান না থাকলে ভ্রমণ জ্ঞানের কোনো উৎসর্ষতা নেই। সেজন্য দু'টিরই বিশেষ প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ভ্রমণের বিশেষ বিশেষ স্থানগুলো আমার লেখা 'চলোনা ঘুরে আসি' উপন্যাসে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সেখানে চমৎকার বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। আপনি তা অনুসরণ করে সহজেই স্থানগুলো ঘুরে আসতে পারবেন।

প্রাচীনকালে পরিবহন ছিল না। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি এত উন্নত ছিল না। সমুদ্রে তখন পালের জাহাজ চলতো। স্থলপথে অশ্বারোহণ অথবা পায়ে হেঁটেই ভ্রমণ

www.pathagar.com

করতে হত; আর বিমান পথের কথাতো কল্পনার বস্তু ছিল, কিন্তু তবুও দুঃসাহসী কষ্টসহিষ্ণু ও অদম্য জ্ঞান পিপাসুরা জীবন বাজী রেখে দেশ ভ্রমণ করতেন। এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আল বেরুনী, ইবনে বতুতা, হিউয়েন সাং, ফাহিয়েন প্রমুখ মনীষীরা দেশ ভ্রমণ করে জ্ঞানার্জন করেছেন। কিন্তু আজকের এ যান্ত্রিক যুগে অতি সহজেই দেশ ভ্রমণ সম্ভব হয়েছে। প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটেছে।

শুধু আপনি ইচ্ছে করলেই অন্তত নিজের দেশটি ভ্রমণ করতে পারেন।

সুদূর ইউরোপ থেকে ভ্রমণের নেশায় মানুষ ছুটে আসতো ভারতীয় উপমহাদেশে। অবলোকন করতো সপ্ত আশ্চর্যের তাজমহল।

প্রশান্তি লাভ করতো বাংলাদেশে এসে। অবলোকন করতো—পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, কুয়াকাটা, ইনানী (Black Gold খ্যাত), জলপ্রপাত-মাধবকুণ্ড।

বিশ্বের বৃহত্তম ম্যান গ্রোভ বন—সুন্দরবন। আবার, এশিয়া থেকে মানুষ ছুটে যেত কানাডার নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখার জন্য। সুতরাং বলা যায় দেশ ভ্রমণ জ্ঞান লাভের একটি উৎকৃষ্ট পন্থা। খ্যাতনামা পর্যটক Marco Polo তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেন।

"Travelling is universel,
Travelling is education,
Travelling is inspiring".

আপনি হয়ত মার্কো পোলোর নাম শুনেছেন? বিখ্যাত এই দুঃসাহসী পরিব্রাক জীবন বাজী রেখে ভ্রমণের নেশায় জীবন কাটিয়েছেন। আনন্দ, সৌন্দর্য আর জ্ঞান অন্বেষণের নেশায় তিনি মহাবিশ্বের অপার সৌন্দর্যকে উপভোগ করার জন্য দেশ-দেশান্তরে পাড়ি জমিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়; আল বেরুনী, ইবনে বতুতা, হিউয়েন সাং প্রমুখ রাও মার্কো পোলোর নাম শুনলেই ভারতবর্ষে আসতেন। আর ভারতবর্ষে আসলে বাংলাদেশে না এসে পারতেন না। বাংলাদেশ তাদের নিকট এক অদ্ভুত রহস্যময়ী কৌতূহলে পরিপূর্ণ ভ্রমণ সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল।

এর সৌন্দর্যের সামান্য কিছু দিকের সন্ধ্যান আপনাকে দিচ্ছি; যা সত্যিই কৌতূহলের বিষয় ছিল। ভ্রমণ হতে পারে আপনার চিত্তের উন্মুক্ত জাগরণ। ভ্রমণের দ্বারা প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দর্শনের মাধ্যমে, আনন্দ-উল্লাস ও আবেগ-প্রবণতার সাথে আপনার স্মৃতিশক্তির বিকাশ ঘটতে পারে। আপনার ভিতরের ঘুমন্ত শক্তিকে তাড়িত করতে পারে এ কৌতূহল প্রিয়তা; মার প্রভাবে জড়তাময় কেটে মেধাশক্তি কিছুটা হলেও তারল্য হতে পারে।

ভ্রমণ আপনাকে দিতে সক্ষম বাস্তব অভিজ্ঞতার, বাস্তব জ্ঞানের প্রবণতা।

আপনার হয়ত ইচ্ছে করে মহান স্রষ্টার নিপুণ সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে।

www.pathagar.com

আপনি কি জানেন? স্রষ্টার সৃষ্টির লীলা কত রহস্যময়! কত মনোহর।

ভ্রমণ না করলে তা কি করে বুঝবেন? কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের নাম সকলেরই জানা, কিন্তু আপনি কি হিমছড়ির নাম শুনেছেন?

হিমছড়ির এত শোভা। এত রূপ। এত কৌতূহল বোধ। যে আপনাকে অবাক করে তুলবে। বাংলাদেশের একমাত্র শীতল পানির ঝর্ণাটি এখানেই অবস্থিত।

এটি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার দূরে। এর পাশ কেটে চলেছে সাগর, যার কূল ঘেঁষে রয়েছে বিশাল পাহাড়। পাহাড় থেকে নামছে অবিমিশ্রিত রহস্যময়ী ঝর্ণা। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত থেকে ১ ঘন্টার পথ হিমছড়ি। আঁকাবাঁকা, উঁচু নিচু ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ী রাস্তা আর চতুর্পাশ টিলায় ঘেরা এক চমৎকার পরিবেশের নাম হিমছড়ি। কার না হৃদয় আকর্ষণ করে। কক্সবাজারের পাশেই জীপ গাড়ী আছে। ৩০ টাকা ভাড়া দিয়ে আপনি হিমছড়িতে যেতে পারেন।

শীতল পানির ঝর্ণার কথা শুনলেন। এবার হয়ত আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। তাহলে গরম পানির ঝর্ণা কোথায়?

গরম পানির ঝর্ণা কি বাংলাদেশে আছে? আর থাকলেও তা কোথায়?

হ্যাঁ, গরম পানির ঝর্ণাটি সীতাকুণ্ড পাহাড়ে অবস্থিত। সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম জেলার একটি থানা। চট্টগ্রাম থেকে ৩৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গরম পানির ঝর্ণা ছাড়াও সীতাকুণ্ডে চন্দ্রনাথের পাহাড়ে আছে বিখ্যাত চন্দ্রনাথ মন্দির এবং বৌদ্ধ মন্দির। এখানে গৌতম বুদ্ধের পায়ের ছাপ রয়েছে। পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত এ মন্দিরগুলো দেখতে বেশ চমৎকার ও চিত্তহারী।

আবার যেতে পারেন পতেঙ্গার সাগর পাড়। এ সাগর পাড়টি থেকে বিকেলের সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে ভারী চমৎকার! রেল স্টেশন থেকে ২২ কিলোমিটার দক্ষিণে।

সমুদ্র পাড়ে যেতে দুই কিলোমিটার পর্যন্ত ঝাউবন আর ছোট-খাট টিলার সমন্বয় আপনাকে মনোমুগ্ধকর করে তুলবে।

চট্টগ্রাম রেল স্টেশনের বিপনী বিতান মোড় থেকে বেবি ট্যাক্সি ও টেম্পুতে আপনি সেখানে যেতে পারেন।

আপনার ভ্রমণের জন্য আরো মজার মজার স্থান রয়েছে। যার কথা শুনলেই আপনার হৃদয় কৌতূহলে ভরে উঠবে। আপনার ইচ্ছে করবে ঐ সমস্ত স্পটগুলো ভ্রমণের জন্য; সেখানে রাতদিন কাটিয়ে দিতে আপনার কোনো বিরক্তি বোধ আসবে না, এমনকি সারাদিন কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করবে।

চলুন তাহলে এবার আপনাকে সেই স্বপ্নের ভুবনে নিয়ে যাচ্ছি।

কক্সবাজার জেলার ১০ কিলোমিটার দূরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থান; অপূর্ব কৌতূহলে পরিপূর্ণ পাহাড় বেষ্টিত সমুদ্র সৈকত 'ইনানীতে'। ইনানীর বালুতে রয়েছে সোনার চেয়েও মূল্যবান ধাতু যার নাম 'যিরকন' বা Black Gold (কালো সোনা)

www.pathagar.com

কালো সোনা বালু, নূড়ী এবং পাথরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যা অতি সহজেই আলাদা করা সম্ভব।

ইনানী টেকনাফে অবস্থিত। টেকনাফের পাশ কেটে চলেছে নাফ নদী। এই নাফ নদী টেকনাফকে মায়ানমার (বার্মা) থেকে আলাদ করেছে।

নাফ নদীর ওপারেই মায়ানমারের মুণ্ডুশহর। দেখতে পাবেন টেকনাফের নাইট্যাং পাহাড়ে ৫০০/৫৫০ ফুট উঁচু চূড়ায় গৌতম বুদ্ধের বৃহৎ আয়তনের মূর্তি। আবার পাহাড়ের চূড়া থেকে প্রত্যক্ষ করুন অপূর্ব সৌন্দর্যের শাহপুরী ও সেন্টমার্টিন দ্বীপমালা।

আবার, ইনানী সমুদ্র সৈকতের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য।

পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া থানার লতাচাপালি ইউনিয়নে অবস্থিত কুয়াকাটা আপনার হৃদয়েক আরো প্রাণবন্ত ও আবেগ প্রবণ করে তুলবে। ১৮ কিলোমিটার আয়তন এ সমুদ্র সৈকতটি পৃথিবীর সকল সৈকতগুলো থেকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

পূর্বদিকের সূর্যোদয় এবং পশ্চিমের সূর্যাস্ত নিপুণ ও চমৎকারভাবে একমাত্র এখান থেকেই অবলোকন করা যায়। শীতকালে শীত প্রধান দেশ থেকে প্রচুর অতিথি পাখি এসে এখানে ভীড় জমায়।

অন্যান্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে রয়েছে; বালুময় সাগর পাড়, সুনীল আকাশ, নারিকেল গাছের সারি, সাগরের উত্তাল জলরাশি এবং চিরহরিৎ বনের অপরূপ সমন্বয় যা ভ্রমণেই আপনাকে বলে দেবে।

এবার আপনাকে আরেক স্বপ্নের ভুবনের সন্ধান দিচ্ছি;—চলুন মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা থানার সাহাবাজপুর ইউনিয়নে অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র জলপ্রপাত মাধবকুণ্ডে যাই। দেকবেন ২৫০ ফুট উপর থেকে নিচে পানি পড়ছে। বড়লেখা থানারই পাথরিয়া পাহাড় থেকে এর উৎপত্তি। কাঁচের মত স্বচ্ছ আর কচি ডাবের ন্যায় টল টল পানির মত অদ্ভুত সমন্বয় আপনাকে সত্যি সত্যি-ই স্বচ্ছতা আর জলপ্রপাতের সৌন্দর্য্যময় কৌতূহলে সেখানে আপনার গোসল করতে ইচ্ছে করবে।

আপনার জন্য সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হল এই মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত এবং কুলাউড়া থানাধীন মুরাইছড়া জলপ্রপাতকে ঘিরে এখানে এক বিশাল অত্যাধুনিক পার্ক স্থাপনের কাজ চলছে; যার নাম ইকো।

বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প প্রস্তাব ইকো-পার্ক স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যেই জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) অনুমোদিত হয়েছে। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় হবে ১১ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা বন অধিদপ্তর এরই মধ্যে পিপি (প্রজেক্ট প্রোফর্মা) প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে।

www.pathagar.com

ইকো-পার্ক প্রকল্প বাস্তবায়নের পুরো খরচ যোগানো হবে সরকারের রাজস্ব তহবিল থেকে ২০০৩—২০০৪ অর্থ বছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে। ইকো ট্যুরিজম উন্নয়নের সুবিধার্থে বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ঃ শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি, পরিবেশগত উন্নয়ন ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার কাজ চলছে।

এই প্রকল্পের মূল স্থাপনা হবে 'মাধবকুণ্ড'। এখান থেকেই ইকো পার্কের সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

প্রকল্পের মূল স্থাপনার জন্য নির্ধারিত মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতের পাহাড়টিতেই (পাথারিয়া-পাহাড়) রয়েছে খাসিয়াদের একটি পুঞ্জি নামের আরও দু'টি খাসিয়া গ্রাম। খাসিয়া পুঞ্জিগুলো মুরাইছড়া জলপ্রপাত সংলগ্ন।

মাধবকুণ্ড ও মুরাইছড়া আপনাকে কৌতূহলে ভরে দেবে। সারাদিন কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করবে মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতের দিকে তাকিয়ে। মুরাইছড়া জলপ্রপাত এবং খাসিয়া পল্লীগুলো ঘুরে আপনি উপজাতীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে পারেন। এবং ইকো পার্কের জন্য-নির্ধারিত সুবিশাল এলাকাটি ঘুরে আসতে পারেন। ভ্রমণ আপনার জ্ঞানের গভীরতাকে বৃদ্ধি করবে।

সময়কে কাজে লাগানোর কৌশল

আমাদের জীবনের সবচাইতে মূল্যবান বস্তু হচ্ছে সময়। সময়ের উপর ভর করেই জীবনের উন্নতি তরান্বিত হয়; এবং সময়কে যথাযথ ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে জীবনের অবনতি হয়।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে "Time is all best of money". অর্থাৎ সময়-ই হচ্ছে সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মানব জীবনের সীমাবদ্ধ গণ্ডিকে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে সময় একমাত্র উপজীব্য। সময় জ্ঞান না থাকলে জীবনে কখনো উন্নতির আশা পূরণ হয় না। পক্ষান্তরে সময়-ই মানব জীবনের উন্নতি-অবনতি, সুখ-সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপাদেয়।

জীবনের গতি সময়ের গতির মতই নির্মম। কারণ, জীবন বয়সের ফ্রেমে বাঁধা এবং বয়স সময়ের ফ্রেমে বাঁধা। তাই জীবনের কোনো মূল্য নেই, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে সময়টুকু থাকে তাকে যে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছেন, প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন; কেবল তার জীবনই মূল্যবান।

কথাটি গভীরভাবে খেয়াল করুন। হয়ত আপনি এখন যুবক, অথবা যুবক-বৃদ্ধ যাই হউন। মনে করলাম আপনি যুবক। আপনার বয়স পঁচিশ অথবা ত্রিশের কোঠায়। এবার আজ থেকে ১৫ কিংবা ২০ বছর পূর্বে বাল্যকালের দিকে লক্ষ্য করুন। যখন আপনি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু এটা মোটেও অল্প নয়। ১৫ থেকে ২০ বছর বাল্যজীবনে এবং শিশুজীবনের দশটি বছর আপনার জীবন থেকে চলে

www.pathagar.com

গেছে। অথচ আপনি এখনও কিছুই করতে পারেননি। হয়ত আপনার বিশ্বাসই হবে না যে, কীভাবে এতগুলো বছর কেটে গেল; কিন্তু এটাই বাস্তব। এটাই সত্যি।

হতাশ হবেন না, এখনও যথেষ্ট সময় আপনার হাতে আছে। তাই-ই নিয়ে ভাবুন? কীভাবে জীবনকে উন্নতির পথে চালিত করবেন?

যদি কেউ এভাবে ভাবত যে, সময় ও জীবন এক নির্মম গতিপথ। নদীর স্রোতের মতই মানব জীবন আপন গতিতে প্রবাহিত। যেমন, Time and tide waits for none. অর্থাৎ সময় এবং স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। মানব জীবনও তেমনি থেমে থাকে না।

কোনো বৃদ্ধ যদি তার জীবনের অতিবাহিত সময়টুকু নিয়ে ভাবতো। তাহলে নিতান্ত সত্যটিই বলত, যে জীবন কিছুই নয়, সময়ের একটা সমষ্টিমাত্র। অতি অল্প, ক্ষণিকের জন্য জীবন। যেমন সকাল বেলার একটি ফুল বিকেলেই ঝরে যায়। সুতরাং, নীরবে বসে বসে জীবনকে সংক্ষিপ্ত করবেন না। চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা মহাজীবন লাভ করুন। মরণের পরও সকল মানুষ আপনাকে স্মরণ করবে। আপনি চেষ্টা করলেই পারবেন; কারণ, জীবনের জন্য চেষ্টা, কিন্তু চেষ্টার জন্য জীবন নয়। আর যদি এ কথাটিই সত্য হয়, তাহলে সাফল্য আসবেই।

www.pathagar.com

Chapter Two

অধ্যায়

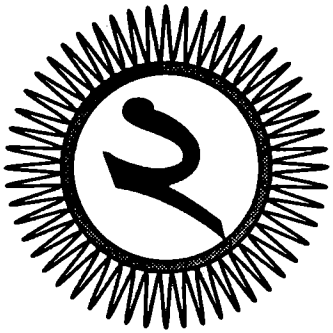

- ☆ সময় শ্রম ও কাজের গুরুত্ব
  (Time and work are most Important)
- ☆ কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ
- ☆ মানুষের জন্য মুক্তির পথ আছেই
- ☆ আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করুন
- ☆ সময়ের গুরুত্ব ও কাজের প্রতি মনোযোগ দিন
- ☆ কীভাবে সম্মানিত হওয়া যায়
- ☆ বিজয়ী হওয়ার মনোবল
- ☆ বই জ্ঞান ও জ্ঞানী
- ☆ সৌভাগ্যের জন্ম দিন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সময় শ্রম ও কাজের গুরুত্ব
(Time and work are most Important)

পৃথিবীতে যারাই সফল হয়েছেন। তাদের জীবনী অধ্যয়ন করলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে, তারা সময়কে কীভাবে ব্যবহার করেছেন, সময়ের ব্যবহারের সাথে সাথে তারা কঠোর শ্রম সাধনার মাধ্যমে কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। ফলে কোনো বাধাই তাদেরকে সাফল্যের পথ থেকে দূরে রাখতে পারেনি। তারা হয়েছিলেন জগত জোড়া খ্যাতির মালিক।

মানব জীবনে সফলতার মূল ভিত্তি হল সময়, শ্রম ও কাজের দায়িত্ববোধ। জীবনে সফলতার জন্য কাজ আপনার চাই-ই। সে যে কাজই হোক না কেন। যে কাজে অর্থ উপায় হয় সে কাজে সম্মান ও প্রতিপত্তিও লাভ হয়। যদি তা অন্যান্য, ঘুষ ও দুর্নীতিমূলক না হয়। ব্যক্তি জীবনে কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। কাজের জন্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সময়ের যেমন গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন কঠোর শ্রমের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা।

আপনি একজন কর্মী। কাজে কখনও অমর্যাদা বোধ নেই। যারা কাজ না করে ভবঘুরের মত সময় নষ্ট করেন, তারা নির্বোধ। আপনি যে কোনো কাজে ব্যস্ত থাকুন—নয়তো নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। এভাবে লেগে থাকুন দেখবেন একদিন আপনি সফল হবেনই। যারা জীবনে কঠোর পরিশ্রম করে সফলতা লাভ করেছেন বিশ্ব ইতিহাস থেকে তাদের সফলতার কাহিনী জেনে নিন। এতে আপনার কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ বাড়বে। অবশ্যই আপনাকে সহিষ্ণু হতে হবে। একদিনে আপনি সফল হতে পারবেন না। আপনার সফলতা আসবে ধীরে ধীরে। আপনি কাজ করছেন কখনও ভেঙ্গে পড়বেন না। কাজে মনোযোগী হয়ে কাজ করুন। আজ হয়ত সফল হতে পারেননি তাই বলে মন খারাপ করে বসে থাকলে চলবে না। সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে আপনার ব্যক্তিত্বকে জাগ্রত রাখুন। এভাবে একদিন দেখবেন আপনি সফলতার শীর্ষে পৌছে গেছেন। সুতরাং কখনও ঘাবড়াবেন না। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিই প্রথম জীবনে সফলতার মুখ দেখেননি। কিন্তু পরে সীমাহীন সহিষ্ণুতা, কঠোর অধ্যবসায় ও সময়ের সদ্ব্যবহার তাদেরকে সাফল্যের শীর্ষে পৌছে দিয়েছে।

www.pathagar.com

ক্রমওয়েল প্রথম জীবনে একটা মেঠো চাষা ছিলেন অথচ শেষ জীবনে তাঁর জ্ঞান ও শক্তিতে বিলেতের শাসনতন্ত্র একেবারে ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। ক্রমওয়েলের জীবন-সাধনা ইংরেজ জাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে অনেকটা উজ্জল করে রেখেছে। আপনি একজন কর্মী। কাজ করেন এতে লজ্জার কি আছে। হোক না তা ছোট কাজ, পরিচয় দিতে সংশয় কিসের। কাজেই তো মর্যাদা বাড়ে। আপনি কাজ করছেন, নিজের কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য; তাহলে আপনার তো সংশয় থাকার কথা নয়। সমাজে যারা অপদার্থ, কাজের মর্যাদা বোঝে না তারা হয়ত আপনাকে ছোট বলবে। তাদের কথায় আপনি কান দেবেন না। আপনি আপনার কাজ চালিয়ে যান। বিশ্বজয়ী ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের প্রিয় ঐতিহাসিক জেনারেল জেমিনী প্রথম জীবনে জনৈক ভদ্রলোকের বালক ভৃত্য ছিলেন।

জ্যোতির্বিদ পিকার্ড যখন বাগানের মালি ছিলেন তখনই তিনি সাধনার পথ ঠিক করে নিয়েছিলেন। এঁরা প্রথম জীবনে খুব ছোট কাজ করতেন। এই ধরনের ছোট কাজ আমাদের দেশে যদি কেউ করে, লোকে তাদের ছোট লোক বলবে। ছোট লোকদেরকে মানুষ হতে হবে। এরাই জাতির প্রাণ। এরাই জাতিকে বাঁচিয়ে রাখে। এদের হাতেই জাতির উন্নতি অগ্রগতির সকল পথ। আপনি কি এ তালিকার বাইরে। আপনিও এ তালিকাভুক্ত।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, "আমার রাত কাটে ইবাদতে আর দিন কাটে পরিশ্রমে।" তুর্কী সম্রাট সেলিম সারাদিন কাজ করতেন। রাত্রিতে অল্পই নিদ্রা যেতেন। সারারাত্রি বসে বসে তিনি পড়তেন। জীবনে কাজ ছাড়া কোনো কিছুতে তার আনন্দ ছিল না। তিনি কাজকে মনেপ্রাণে ভালবাসতেন বলেই তার সম্রাজ্যে কোনো কিছুর অভাব হয়নি।

শিবনাত শাস্ত্রী প্রত্যহ বিশ ঘণ্টা করে পড়তেন। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ঘুমে পড়া নষ্ট হবে এই ভয়ে মাথায় বালিশ দিতেন না।

মাইকেল এঞ্জেলা কাজ না করতে পারলে অস্থির হয়ে যেতেন। কোনো কোনো সময়ে দুপুর রাত্রে জেগে উঠে তিনি কাজ শুরু করে দিতেন। শুধু অর্থ পাবার লোভে সবাই কাজ করেন না। বেঁচে থাকতে হলে কাজ সবাইকেই করতে হবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, সাহিত্য সেবা, নিজের আত্মোন্নয়ন ও জাতির উন্নতির জন্য সবারই কাজ করা দরকার। সম্রাট ষোড়শ লুই একখানা বই উৎসর্গ পাবার সম্মানের লোভে স্পিনোজাকে পেন্সন দিতে চেয়েছিলেন। স্পিনোজা চশমার পাথর সাফ করে জীবিকার্জন করতেন। সম্রাটের এই দান তিনি গ্রহণ করেননি। বইও উৎসর্গ

www.pathagar.com

করেননি। তিনি এত পড়তেন যে কোনো সময় তাঁকে অনবরত দুই তিন দিন ধরে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে দেখা যেত। আমরা অনেকেই লেখাপড়া করি অথচ পৃথিবী সম্পর্কিত জ্ঞানের বইগুলো পড়তে চাই না। বই না পড়লে আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাফল্যের বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিদের কাহিনীগুলো জানতে পারবো না, আর এসব না জানলে আমাদের কাজের গতি, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও কঠোর অনুশীলনের মনোভাবও তৈরী হবে না। কাজেই পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণীদের জীবনী, জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ সমস্ত সাফল্যের কাহিনীকে জানতে আমাদেরকে অবশ্যই বই পড়ার অভ্যাস তৈরী করতে হবে। তাহলে আমাদের যেমন জ্ঞানার্জন হবে তেমনি অন্যদিকে আমরা তা থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের জীবনকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হব।

হাঙ্গেরীর জনৈক গণিতজ্ঞ গ্রীষ্মকালে দুই ঘণ্টা এবং শীতকালে চার ঘণ্টা মাত্র শুয়ে থাকতেন। যারা জ্ঞানের সাধনায় আনন্দ অনুভব করেন তারাই তো জগতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হন।

কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ

এ জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে, ধন সম্পদ জয় করতে হলে, সুখ-সাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করতে চাইলে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করতে হবে। পৃথিবীটাই তো আপনার অধ্যবসায়ের একটা ক্ষেত্র। আপনি যে কাজটাই ঠিকমত করবেন সেটাই আপনার ভাগ্য বদলিয়ে দেবে। আসলে প্রত্যেকেরই উচিত স্ব-স্ব কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ। তাহলে যে কেউ যে পেশাতেই সফল হবেন এতে সন্দেহ নেই। কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ না থাকলে কোনো কাজেই কেউ সফলতা লাভ করতে পারবেন না। বেলী প্রত্যহ চৌদ্দ ঘণ্টা করে একটানা চল্লিশ বছর ধরে পরিশ্রম করেন। সাফল্যের স্বর্গ নির্মাণ করেও তিনি খুশি হতে পারেননি। শেষ জীবনে তার আকুতি ছিল যা করার তার কিছুই করতে পারিনি। এ সবই সাফল্য লাভের রহস্য।

গত বছর রমনা পার্কের ফুটপাতে এক দোকানদারকে দেখলাম সে বানান করে বেশ আগ্রহের সাথে ডেল কার্নেগীর প্রতিপত্তি ও বন্ধুত্ব লাভ নামের বইটি পড়ছে। আমার একটু আশ্চর্যবোধ হয়েছিল। যারা লেখাপড়া শিখতে না পেরে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে তারা তো বই পড়বার ধার ধারে না। তারা হয়তো মনে করবে এগুলো লেখাপড়া জানা মানুষের কাজ। তাদের জন্য বাজে কাজ। অথচ তার আগ্রহ দেখে কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলাম। বইটা পড়তে বোধ হয় আপনার বেশ কষ্ট হচ্ছে,

www.pathagar.com

দোকানদার দুঃখের সহিত বলল, স্কুলে ক্লাস টু পর্যন্ত পড়ছি। দুষ্টামি কইরা সময় নষ্ট করছি। বাবা মা অনেক চেষ্টা করছেন পড়াইতে। লেখাপড়া কি জিনিস তখন বুঝতে পারি নাই। তয় বানান কইরা ভাল মত পড়তে পারি। আগে তাও পারতাম না। এখন আর সমস্যা হয় না। ডেল কার্নেগী—এই লোকটার লেখাগুলা না বেশ ভালো লাগে, তার চারটা বই পড়লাম। তার অনেক ওচা ওচা বই আছে। সে গুলা পড়ার সময় নাই। ছোট ছোট বইগুলা পল্টন মোড় থেইকা কিন্না আনি। দোকানদারির ফাঁকে ফাঁকে পড়ি। লেখাপড়ার মাঝে এতকিছু জানা যায় আগে বুঝলে কি আর লেখাপড়া ছাইড়া দুষ্টামি করতাম। এখন আর সময় নাই। নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারছি।

দোকানদারের কথাগুলো শুনে খুব আফসোস হল। এভাবে কতজন যে ছোট বেলায় বাবা মায়ের আদেশ অমান্য করে স্কুলে না গিয়ে নিজের পায়ে কুড়োল মেরেছেন তার হিসেব মেলানো যাবে না।

দোকানদারকে উৎসাহ দিয়ে বিদায় নিলাম। সেই দিন কবে আসবে যেদিন দেখবো উঁচু-নিচু, মুঠে-মজুর সবাই কম-বেশি লেখাপড়া শিখেছে। এরূপ বই খুব আগ্রহ ভরে পড়ছে। জ্ঞানার্জন করছে। সেদিন কবে আসবে যেদিন সবাই বুঝতে পারবে বাঁচতে হলে ভালোভাবে লেখাপড়া করতে হবে। সময় নষ্ট না করে প্রতিদিন স্কুলে যেতে হবে, নিয়মিত শিক্ষকের দেয়া পড়াগুলো শিখতে হবে। বাবা-মায়ের আদেশ মানতে হবে। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে। কবে হবে আমাদের এ মানসিকতার পরিবর্তন।

জাতির লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে আজ মরচে ধরেছে, ঘুণে আবদ্ধ করে রেখেছে তাদের মনকে। জাতি আজ মরে গেছে। জাতির এই লক্ষ লক্ষ মানুষের মর মর চেতনাকে শাণিত করতে হবে। এ আবদ্ধ জীবন থেকে জাতিকে বাঁচাতে হবে। বাঁচার উপায় কি?

দেশের কোটি কোটি মানুষ শরীরে বেঁচে থাকলেও তারা মরে গেছে। তারা আলস্যের ঘুণে আবদ্ধ। তাদের চেতনায় মরচে ধরেছে। তারা হারিয়ে ফেলেছেন তাদের চলার গতি। আলস্য নামের মহা ব্যাধি তাদেরকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। যে জাতির এত মানুষ মরে গেছে। সে জাতি কি শীঘ্রই জাগবে? কোনো জাতিকে জাগাতে তো সে জাতির আত্ম-জাগরণের প্রয়োজন; সময়, শ্রম ও কাজের প্রতি সীমাহীন দায়িত্ববোধই তো জাতির উন্নতির মূলমন্ত্র। এর সাথে দরকার মনুষ্যত্ব ও জ্ঞানের চর্চা। মনুষ্যত্বের জাগরণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাই তো জাতিকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। ঘরের কোণে, রাস্তার ধারে, রাজদরবারে, রান্নাঘরে, দোকানের মাঝে, পাহাড়ের চূড়ায় অথবা সমুদ্র সৈকতের উপর যেখানেই থাকো না কেন জ্ঞানরাজ্য হতে রত্ন মানিক আহরণ করে আপনি আপনার জীবনকে স্বার্থক ও সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে বাধা কোথায়?

www.pathagar.com

আপনার সফলতার মূলভিত্তি হল কাজ।

আপনার কল্যাণের পথ তো আপনার হাতেই। আপনি যা করেন বা যাই করেন, কাজ তো আপনাকে করতেই হবে। তাহলে কাজ করতে, জ্ঞানের চর্চা করতে অসুবিধের কি আছে। কাজ না করে কেন আপনি ভিক্ষুকের সঙ্কোচ নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। স্কুল কলেজের সার্টিফিকেট, ডিগ্রী এসব কেউ গলায় ঝুলিয়ে পথ চলে না। মানুষ বিচার করবে আপনার জ্ঞানকে, মনুষ্যত্বকে, চরিত্রকে, নৈতিক বলকে। আপনার দুর্জয় আত্মশক্তির সামনে সবকিছু লুণ্ঠিত হবে, মোহনীয় ব্যক্তিত্বের মাধুর্যে সবার ভালবাসা শোষণ হবে। সত্য ও নিষ্ঠার সম্মুখে গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। আর এসবেই আপনি হবেন সফল ও সাফল্যের অংশীদার। এসব কি কখনও আপনার মনে রেখাপাত করেছে। আপনার জর্জ-ব্যারিস্টার হওয়ার দরকার নেই। জগতের সবাই কি জর্জ-ব্যারিস্টার হন। আপনার দরকার মনুষ্যত্ববোধ ও প্রাণ শক্তির জাগরণ। কঠোর পরিশ্রম করার মনোবল। জ্ঞানের চর্চা করার ক্ষমতা। জগতে কে পরিশ্রম ছাড়া বিখ্যাত হয়েছেন। এমন একজনও আপনার চোখে পড়বে না। তাহলে যত ডিগ্রীই থাক সবাইকেই তো পরিশ্রম ও সাধনা করেই সফল হতে হবে। এতে আপনার সংশয় হবার কথা নয়। আপনি সফল হতে চান এটাই তো আপনার বড় কথা। আপনি চেষ্টা চালিয়ে যান অবশ্যই সফল হবেন। সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছানোর জন্য আপনার চেষ্টা দরকার। কাজেই আপনি অদম্য ইচ্ছাশক্তি নিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করুন। দেখবেন আপনি যা আশা করেছেন তাই হতে পেরেছেন। প্রতিটি মানুষ তার সাফল্যের স্বপ্ন দ্রষ্টা। আপনার পরিকল্পনা, কর্ম প্রচেষ্টা, কঠোর শ্রম, সীমাহীন উৎসাহ এবং কাজ চালিয়ে যাওয়ার অসীম চেতনাশক্তিই সাফল্যের জন্মদাতা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও শ্রম সাধনা করতে না পারলে কোনো জাতিই জগতে বড় হতে পারে না। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও সাধনা ব্যতীত জাতির মনের শক্তি বৃদ্ধি হয় না। আর মনের শক্তি বৃদ্ধি না হলে সে তার চলার পথ ও মনুষ্যত্ব জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এতেই জাতির পতন হয়। ইংরেজ জাতি আজ কোথায় গিয়েছে। তাদের বড় হওয়ার পেছনে যে ইতিহাস রয়েছে তা কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি। কত ত্যাগ তিতিক্ষা পেরিয়ে আজ তারা ধন-সম্পদে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, দর্শনে সবকিছুতেই উন্নতির চরম শিখরে পৌছে গেছেন। এসবের মূলে কি রয়েছে। তা জানতেও জ্ঞানের চর্চার প্রয়োজন।

আবিষ্কারের নেশায়, সভ্যতার সন্ধানে, জ্ঞানের অন্বেষণে তারা কোথায় না গিয়েছে? বরফের দেশে, দুর্গম গিরিশিরে, আকাশে-মঙ্গলে, চাঁদে, মরুভূমে, সমুদ্রের তলে কোথাও তাঁদের যেতে বাকি নেই। তারা ভীল, কোল, গাঢ়, সাঁওতালী ভাষা হতে সভ্যতাকে জাগতে—পৃথিবীর সমস্ত ভাষার চর্চা করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নানা

www.pathagar.com

বিচিত্রময় সভ্যতাকে রপ্ত করতে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সীমাহীন জ্ঞান সাধনার জুড়ি নেই। মুহূর্তকালও তো তাদের আলস্যে কাটেনি। তাই তাদের সাধনাও কখনও ব্যর্থ হয়নি। আজ তারা জগতের সবচাইতে সমৃদ্ধশালী জাতি। সারা বিশ্বের নিয়ন্তা-কর্তা আধিপত্যই তাদের হাতে।

আপনার ভেতরের শক্তিই সীমাহীন কর্মোদ্দীপনা ও সাফল্যের কারিগর।

নিজেকে এবং জাতিকে বড় করতে আপনার সমস্ত শক্তির ব্যবহার চাই। ইচ্ছাশক্তি, কল্পনাশক্তি, মেধাশক্তি, দৈহিক শক্তি, মানসিক শক্তি কত শক্তির কারিগর আপনি, কিন্তু একবারও এ কথা মনে পড়েনি যে এতগুলো শক্তি আপনার মাঝে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছে অথচ এসব শক্তি থাকা সত্ত্বেও আপনি ব্যর্থ হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু কখনও ভাবেননি যে আপনার ভেতরের এ শক্তিগুলোকে কাজে লাগিয়ে আপনি হতে পারেন জগতের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। সাফল্যের সুউচ্চ শিখরে আরোহনকারীদের একজন। কোনো কিছুই আপনার পক্ষে হওয়া অসম্ভব নয়। আপনার দ্বারা সবই সম্ভব। ইংরেজরা পেরেছে আপনি কেন পারবেন না। তারা তো এই শক্তিগুলোকেই ব্যবহার করেছে। আপনারও তো সে শক্তি রয়েছে। তারা পারলে আপনি কেন পারবেন না। আপনিও পারবেন শুধু আপনার অলস মনকে শাসন করতে হবে। কুঁড়েমিকে দূর করতে হবে। সীমাহীন চেতনাশক্তি নিয়ে কাজ করতে হবে।

যে দারিদ্র্যের অজুহাত দিয়ে আপনি আপনার যাত্রা বন্ধ করে রেখেছেন, তাকে দূর করতে হবে। মনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংশয়কে গুড়িয়ে দিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে। পক্ষান্তরে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সংশয় ও দারিদ্র্যের অজুহাতই আপনার উন্নতির পথকে, জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্নকে গুড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বাস করুন আপনি মোটেই দরিদ্র নন। আপনার ভেতরে প্রচুর শক্তি আছে। সে শক্তির ভাণ্ডার ও কারখানাটার পরিচয় তো আমি আগেই দিয়ে দিয়েছি। জীবনে যে কোনো অবস্থায় যে কোনো সময় আপনি সে শক্তিগুলোকে কাজে লাগিয়ে সাফল্যের স্বপ্নীল দিগন্তে উন্নীত হতে পারেন। আপনার কোথাও যেতে হবে না। কোনো মণি-মুক্তার সন্ধানেও বের হতে হবে না। আপনার ভেতরেই যে মণি-মুক্তার চেয়েও মহামূল্যবান অদম্য চেতনাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, কল্পনাশক্তি, মেধাশক্তি আরও নানা শক্তিগুলো লুকিয়ে আছে, সেগুলোকে যথাযথ ব্যবহার করতে পারলেই জগত আপনার হাতের মুঠোয়। আপনি মূলত কি হতে চান? কী করতে চান? কীভাবে করতে চান? কেন করতে চান? ইত্যাদি সব প্রশ্নের উত্তর এই শক্তিগুলোর কাছে পাবেন। বোকার মত কোনো পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে তার কাছে আপনার উন্নতির রহস্যটা জানতে চাইলে সে কিছুই বলতে পারবে না। কারণ এ শক্তিতো আপনার মাঝেই নিত্য খেলা করে বেড়াচ্ছে।

www.pathagar.com

আপনি এ বয়সেই পারেন বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন মহাপণ্ডিতদের চিন্তার সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে। আপনি ইচ্ছা করলে পারেন সফল কর্মী হতে, সফল ব্যক্তি হতে। জীবনকে জ্ঞানভাণ্ডারের অসীম রাজ্যে প্রবেশ করাতে। এগুলো সবই আপনার ভেতরের শক্তির কাজ। ইংরেজরা এ শক্তিগুলোকেই একযোগে কাজে লাগিয়ে সবকিছুর পাশাপাশি শিল্পে সমৃদ্ধি লাভ করেছেন। আজ তাদের সমৃদ্ধি কিসে নেই। তারা উন্নতির স্বর্গরাজ্যে বিরাজ করছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নতির কারণটা তো এখানেই।

আপনার কাজ করতে সঙ্কোচ হয়, অসম্মানবোধ হয়—এসব মূর্খের কথা। মিথ্যে বলে নিজেকে উঁচু বংশের পরিচয় দিতে নিজের যা নেই তা বলে বড়াই দেখাতে লজ্জা হয় না, অসম্মানবোধ ও সঙ্কোচবোধ হয় না। অথচ কাজে লজ্জাবোধ হয়। তাহলে কাজ ছোট বলে পরিচয় দিতে লজ্জা কিসের। কাজ যে করে সে তো মহৎ। তা যে কোনো কাজই হোক না কেন? কাজ করতে লজ্জা নেই। যদি অসৎ কাজ না হয়। পবিত্র মন নিয়ে সন্তুষ্ট থেকে কাজ করুন জীবনে উন্নতি হবেই। কাজকে মনে প্রাণে ভালবেসে সে কাজ করাতে যে কি আনন্দ তা আপনিই বুঝতে পারবেন। দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা মনোযোগ দিয়ে কাজ করেই তো বড় জাতিগুলো জগতে বড় হয়েছে। আপনি যুবক এ বয়সে আলসে জীবন যাপন করা খুবই বিপজ্জনক। আলস্যে নিজের এবং জাতির সর্বনাশ হয়। বড় জাতিগুলো তাদের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে মরণপণ সাধনায় লিপ্ত। জাতির উন্নতি, অগ্রগতি, স্বাধীনতা ও শক্তি বাঁচিয়ে রাখতে জগতের সভ্য জাতিগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, শ্রম সাধনা, গবেষণাগার, আবিষ্কার ও কঠোর অধ্যবসায়ে যুক্ত হয়েছেন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যারা মোটেও ভাবেন না তাদের ধ্বংস অনিবার্য। যারা নির্বোধ, জ্ঞানের চর্চার অর্থ বোঝেন না, জীবনকে জানতে পারেন না, জাতির জন্য যাদের কোনো দরদ নেই। তারা এসব কথার মূল্য দেবেন না। তারা কখন কি ভাবেন, করবেন নিজেও জানেন না।

নিজের নির্বুদ্ধিতাকে স্বীকার করুন। জ্ঞানের আলোয় জীবনকে পরিচালিত করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করুন। দেখবেন আজ যা আমি আপনাকে বুঝাতে চেয়েছি কাল আপনি তা নিজেই বুঝতে পারবেন এবং অপরকেও বুঝানোর শক্তি আপনার মস্তিষ্কের স্মৃতিভাণ্ডারে জমা হয়েছে।

আমি আপনাকে যে কথাগুলো বলে যাচ্ছি তা সবই অক্লান্ত পরিশ্রম ও রাত-দিন গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ফসল। নির্ঘুম রাত্রির সাধনা ও চর্চার অভিজ্ঞতাই তো আমি আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করতে পারছি। আপনি কেন পারবেন না। মানুষ বলতে আপনিও যা আমিও তাই। পার্থক্য শুধু আমি রাত-দিন সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করছি আপনি হয়তো করছেন না। নয়তো আপনিও যা ইচ্ছা তাই হতে পারেন।

www.pathagar.com

আমাদের জীবনকে উন্নতির পথে পরিচালিত করতে কাজ দরকার। দরকার শ্রম সাধনার। কাজের ভেতরেই তো উন্নতির হাতছানি। কাজ ও শ্রম সাধনার মাঝেই মানুষের সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও যাবতীয় কল্যাণ নিহিত। মানব সমাজের সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও যাবতীয় কল্যাণ ছাড়া আর কিসে আনন্দ পাওয়া যায়। যদি নিজের কথাও বলা হয়, তাহলেও আমাদের কাজ করতে হব। মাথার ঘাম পায়ের উপর পড়ার মত পরিশ্রমের মুখোমুখি হওয়ার মানসিকতা না থাকলে জগতে কোনো ধন-সম্পদ ও সুখ-সমৃদ্ধি লাভ হয় না।

প্রতিটি সাধনা ও পরিশ্রমের সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগ থাকে। এ সংযোগ একযোগে না হলে কাজে সফলতা আসে না। মূর্খ ও নির্বোধরা শত পরিশ্রম করেও যা করতে পারে না, জ্ঞানী অল্প পরিশ্রম করেই তা করতে পারেন। পৃথিবীর সকল আবিষ্কারই জ্ঞানীদের অপূর্ব-গবেষণা শক্তির রহস্য থেকেই বের হয়েছে বিদ্যুৎ, উড়োজাহাজ, কম্পিউটার, কলকারখানা, রেলওয়ে, স্টীমার, পরিবহন, চিকিৎসা বিজ্ঞান সকল আবিষ্কার ও সমাধানের মূলেই রয়েছে জ্ঞানীদের গবেষণা ও শ্রম। তাই মেধার শ্রমের সাথে কাজ করলে দ্রুত সফলতা আসে। আর মাথাই মূলত সকল শ্রমের পরিচালনাকারী। তাই মাথার সাহায্যেই কাজে সফলতা লাভ হয়। মূর্খ জ্ঞান-বুদ্ধিহীন মাথার আদেশ পালন করতে যেয়ে হাত-পাগুলো পদে পদে আলস্য ও দুঃখ বিড়ম্বনার মুখোমুখি হয়। তখন ইচ্ছাশক্তিগুলো ঠিকমত কাজ করে না; ফলে কাজে মস্তিষ্কের ব্যবহার না হলে উন্নতির স্বপ্ন বাধাগ্রস্ত হয়, বিলম্বিত হয়। জগতের শ্রেষ্ঠ ও সভ্য জাতিগুলো মস্তিষ্কের এইরূপ নানামুখি ব্যবহার করেই আজ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

আপনার প্রতিটি কাজেই সহিষ্ণুতা চাই। স্রষ্টার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করে সহিষ্ণুতার সাথে পরিশ্রম করে যান দেখবেন আস্তে আস্তে ব্যর্থতার গ্লানি মাথার উপর থেকে সরে যাচ্ছে। ক'দিন পরিশ্রম করেই আপনি সাফল্যের ভাগীদার হবেন—এ কথা কখনোই ভাববেন না। আপনার সাফল্য আসবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ধৈর্য্যের উপর ভর করে। কাজেই সাফল্য লাভের জন্য দীর্ঘ সহিষ্ণুতার গুরুত্বকে কখনোই অস্বীকার করবেন না। সফল কর্মীদেরকে আরও সহিষ্ণু হতে হয়। বিচলিত হলে চলবে না। একাগ্রতার সাথে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। অবশ্যই সফলতা আসবে। সফলতার জন্য ধৈর্য্যের প্রয়োজন।

জগতে যারাই সফল হয়েছেন তারা যেমন পরিশ্রমী ছিলেন, তেমনি সহিষ্ণুতাও ছিল তাদের মহৎ গুণ। হয়তো আপনার মন অধৈর্য্য হয়ে পড়বে—আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে—নানান ভমাবনা আপনাকে গ্রাস করবে। তাতে বিচলিত হবেন না। মনকে কাজের দ্বারা বেঁধে রাখুন। সে যেন ভাবনার সুযোগ না পায় যে আর

www.pathagar.com

কতদিন। জীবন সাধনার পথে অনেক দুঃখ-ব্যথা আসতে পারে— সেগুলোকে উপেক্ষা করে আপনি সময়কে গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করুন। দুশ্চিন্তায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে জীবন কাটালে আপনারই পরাজয় হবে। আপনাকে জয়ী হতে হবে। পক্ষান্তরে দুশ্চিন্তায় বিলাপ করলে কেউ আপনার দিকে ফিরেও তাকাবে না। এতে ব্যর্থতাকেই আলিঙ্গন করা হবে। জীবনে কোনো পথ হচ্ছে না বলে বসে থাকলে চলবে না।

পথ একটা তৈরী করে নিতে হবে। ফিলিপ সিডনী বলেছেন—"জীবনের সকল পথ যদি রুদ্ধ হয়, তবুও আমি একটা পথ তৈরী করে নিতে পারি।"

মানুষের জন্য মুক্তির পথ আছেই

অবিশ্বাসী, পরমুখাপেক্ষী, আত্মবিশ্বাসহীন মানুষের কোনো মুক্তির পথ নেই। কাজেই উপরোক্ত দোষগুলো যেন আপনার না থাকে। এ কথাগুলো বিশ্বাস করুন। আপনি জীবনে কখনোই ঠকবেন না। ব্যর্থতা কখনোই আপনাকে গ্রাস করতে পারবে না। নিজের ভেতরের সমস্ত শক্তির সন্ধান না করে যে অন্যের কাছে দয়া ভিক্ষা চায় সে নিতান্তই মূর্খ—অপদার্থ। মানুষের কাছে দয়া ভিক্ষা না করে স্বয়ং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। কাজ করার চেষ্টা করুন। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে অটোমেটিকভাবে আপনার ভেতরের শক্তি জেগে উঠবে। কাজের সন্ধান লাভ হবে এবং অসীম চেতনাশক্তির সাহায্যে কাজ করে দেখবেন আপনি সত্যি সত্যিই অকল্পনীয় সাফল্যের সাক্ষাত পেয়েছেন।

জগত বিখ্যাত অনেক লোকই বসে থাকা পছন্দ করতেন না। তাদের কাছে কাজই বড়। জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও সফলতা লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে কাজ করে যাওয়া। তাঁরা ভাবেন জীবন অতি ক্ষুদ্র, ক্ষীণ। সকাল বেলার একটি তরতাজা ফুল বিকেলেই ঝরে পড়ার নাম জীবন। কিন্তু কাজ অসীম। যুগ যুগ ধরে মানুষের মহৎ কর্মগুলো কালের সাক্ষী হয়ে হাজার বছরের অনাগত সময়ের মানুষদেরকে বিচিত্র জ্ঞান ও আত্মজিজ্ঞাসার সন্ধান দিয়ে আসছে। সীমাহীন চেতনাশক্তি ও জ্ঞান বিতরণ করে আসছে।

সম্রাট শাহজাহানের জীবনের ইতি ঘটেছে শত শত বছর পূর্বে অথচ তার কর্ম-প্রচেষ্টার ফসল তাজমহল আজও তাঁর স্মৃতিকে বহন করে শত শত বছর ধরে আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে ভ্রমণ পিপাসুদের কৌতূহল বৃত্তিকে বার বার তাড়া করছে। আরও কত শত বছর ধরে তার মহিমা বিকশিত হবে তা কেউ জানে না।

আজ হতে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন গ্রীক মহাপণ্ডিত সক্রেটিসের "Know thyself" 'নিজেকে জানো"—কথাটি যুগের পর যুগ ধরে মান মনের আত্মজিজ্ঞাসার খোরাক যুগিয়ে আসছে। তেমনি যুগ শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও কবি হযরত

www.pathagar.com

শেখ সাদী (রঃ)-এর একটি বিশ্বখ্যাত দুরূদ "বালাগাল উলা বিকামালিহী, কাসাবাত্ দোজা বেজামালিহী, হাসানাত যামিউ খেছলিহী স্বল্লু আলাইহি ওয়া'আলিহী।" যুগের পর যুগ ধরে নবী প্রেমী কোটি কোটি মানুষের মনের তৃষ্ণা মিটিয়ে আসছে। এ সবই ব্যক্তিত্বের মহৎ কর্মের ফসল।

সারা জীবন ধরেও যদি আমরা কাজ করে যাই তবুও আমাদের কাজ শেষ হবে না। মানুষের শরীরিক কর্মের চেয়ে মহৎ কর্মের অর্থাৎ জ্ঞানী কর্মের মূল্য অনেক বেশী। প্রত্যেক কর্মীদের সেল্‌ফ ইমপ্রুভমেন্ট স্কিল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। সেল্‌ফ ইমপ্রুভমেন্ট স্কিল যা সত্যি সত্যিই ব্যক্তিকে আত্মোন্নয়নের পথে সুনিপুণভাবে, দক্ষতার সাথে পরিচালিত করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। মানুষের জীবনে সাফল্যই বড় কথা। ব্যর্থ মানুষের জীবনী নিয়ে কেউ ভাবেন না, মাথা ঘামান না। কাজেই ব্যর্থতা কারোই কাম্য নয়। সবাই সফলতার আশা করেন। আর এই সফলতার আশাকে পূরণের সমস্ত পন্থা, কর্ম-পরিকল্পনা, পরামর্শ, সফলতার সহজ পথ, সাফল্যের পদক্ষেপ। মোটকথা একজন মানুষের জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া এবং সাফল্যের শীর্ষে আরোহন কার অভিপ্রায়, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সমস্ত কিছুই আমি এ বইয়ে আলোচনা করেছি। এ ছাড়াও আমার সেল্‌ফ ইমপ্রুভমেন্ট বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো বই মার্কেটে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর তালিকা আমি ইতোমধ্যেই আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি আপনি ইচ্ছে করলে সেগুলোর একান্ত সহযোগিতা নিয়ে সাফল্যের ভিত্তিতে জীবনকে পরিচালিত করতে পারেন।

আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করুন

আমাদের জীবনকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করতে আরেকটি বড় গুণের প্রয়োজন। তা হল আত্মবিশ্বাসী হওয়া। নিজের প্রতি যার আত্মবিশ্বাস নাই, তার জীবনে কখনো উন্নতি আসে না। ভিখারির মত যে অন্যের কাছে হাত পাতে, অন্যের দয়া পাবার আশায় সাহায্যের অপেক্ষায় দিন কাটায়, অথচ কোনো কাজ করতে চায় না। আলস্যে, অবজ্ঞায় কাজ ফেলে রাখে সে অতি নির্বোধ। যে কাজ করতে চায় না, পরিশ্রমের কথা শুনলে যার গায়ে জ্বর আসে, হাত-পা ব্যথা করে, যার মনোবল দুর্বল, কাজে ফাঁকি দেওয়ার মনোভাব যার নিত্য-দিনের অভ্যাস। যে নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে কারখানার কাজ ফেলে ছুটি নেয়। বিদ্যালয়ে যাওয়ার নাম করে যে বাজারে ঘুরে বেড়ায়। প্রাইভেটের নাম করে যে পিতা-মাতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বখাটে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আড্ডায় অর্থ নষ্ট করে। যে ফালতু কাজে সময় নষ্ট করে

www.pathagar.com

অথচ বিদ্যালয়ের পড়াগুলো নিয়মিত শেখার সময় পায় না বলে অজুহাত দেখায়। স্কুলের নাম করে যে মূল্যবান সময় পার্কে গিয়ে ব্যয় করে তাদের জীবনে কখনো উন্নতি আসে না। এরাই জাতির বিপর্যয় ডেকে আনেন।

যে কাজ না খুঁজেই, কাজের সন্ধান না করেই ভাগ্যের উপর দোষ চাপায়। যে ছোট কাজ বলে তা প্রত্যাখ্যান করে বসে বসে দিন কাটায়। তাদের জীবনে ব্যর্থতাই উঁকি দেয়। বেকার থাকার চেয়ে বরং ক্ষুদ্র কোনো কাজই হোক না কেন তাই আপনার জন্য উত্তম কাজ। যে কাজই হোক না কেন আপনার সফলতার প্রয়োজন, অর্থ উপায়ের প্রয়োজন, আত্মোন্নয়নের প্রয়োজন, অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন ইত্যাদি সবগুলোই বেঁচে থাকার জন্য দরকার। তাহলে কাজ করতে আপনার আপত্তি কিসের। লোকের কথায় আপনার উন্নতি আসবে না। উন্নতির পথ নিজেকেই তৈরী করে নিতে হবে। কাজেই আপনার কাজ দরকার। কাজ ছাড়া উন্নতির কোনো বিকল্প পথ নেই। যে স্রষ্টা আপনাকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সে স্রষ্টাই আপনাকে কাজ করার জন্য কঠোর শ্রমের নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি পরিশ্রম করলেই তিনি আপনাকে তার ফল দেবেন। ঘরের মধ্যে বসে থেকে যতই স্রষ্টাকে ডাকুন না কেন, যতই প্রলাপ করুন তাতে কোনো কাজ হবে না কারণ স্রষ্টা নিজেই পবিত্র কোরআনে কারীমে ঘোষণা দিয়েছেন "লাইসা লিল ইনছানে ইল্লা মা-সা'আ—অর্থাৎ মানুষের জীবনে শ্রম-সাধনা ছাড়া কিছুই অর্জিত হয় না। মহান আল্লাহ্‌র এ বাক্য থেকেই বুঝা যায় প্রতিটি মানুষের সফলতার জন্য চাই কঠোর শ্রম-সাধনা তবেই মানুষ হিসেবে সবাই হবে সফলতার পথযাত্রী। কিন্তু অলসতা, অবহেলা, কুঁড়েমির বশেই সব মানুষ সফল হতে পারেন না, সুখ-সাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করতে পারেন না। বিখ্যাত হতে পারেন না। জগত জোড়া খ্যাতির মালিক হতে পারেন না। একমাত্র শ্রম-সাধনা ও কঠোর অধ্যবসায়ের অভাবে।

কর্মহীন, আলসে, কুঁড়েকে স্রষ্টা পছন্দ করেন না। যে স্রষ্টা আপনাকে কাজ করার উপযুক্ত করে অনেকগুলো শক্তির সমন্বয়ে তৈরী করেছেন সে শক্তিগুলোকে কাজে না লাগিয়ে আপনি দরিদ্র মনে অন্যের কাছে হাত পাতছেন এতেই তো স্রষ্টা আপনার প্রতি নারাজ। আপনার জাতির প্রতি তাঁর ভাগ্য পরিবর্তনের হাত প্রসারিত নয়। স্রষ্টা আপনাকে দিতে প্রস্তুত কিন্তু আপনি, আপনার জাতি নিতে জানেন না। নেয়ার জন্য যে কাজ করা দরকার তা আপনারা, আপনি করতে পারেননি। কাজেই মহান আল্লাহ্‌ পবিত্র কোরআনে কারীমে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, "যে জাতি তার ভাগ্য পরিবর্তনে এগিয়ে আসেন না স্বয়ং আল্লাহ তার ভাগ্য পরিবর্তন করেন না।" এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ তা'য়ালা সব সময়ে আপনার মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কথা ভেবে, তাঁর উপর নির্ভর করে, আপনি একাগ্রতার সাথে কাজ করে যান অবশ্যই তার ফলাফল পাবেন।

স্রষ্টার কাছে কোনো ধর্ম, কোনো জাতি গোষ্ঠীর ভেদাভেদ নেই। মানুষ হিসেবে সবাই তাঁর সৃষ্টি এবং জগতের সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। কাজেই যে কেউ পরিশ্রম করবেন, কাজ করবেন তাকেই তিনি ফলাফল প্রদান করবেন। পৃথিবীর বড় বড় জাতিকে আজ তিনি কি-না দিয়েছেন। আকাশ-পাতাল সবকিছুই নিয়ে তাদের গবেষণা আজ অব্যাহতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এ শক্তির মালিক তো স্রষ্টাই। স্রষ্টার কাছে শ্রম-সাধনার মাধ্যমে এ শক্তিগুলো যারা অর্জন করেছেন তারাই তো আজ জগতের অর্থ-সম্পদ ও আধিপত্যের দাবীদার। সবকিছুই আজ তাদের হাতে। এ সবই তো কঠোর শ্রম ও সীমাহীন গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ফসল। আপনি কী হতে চান? স্রষ্টার দরজা খোলা আছে। সেখান থেকে যত ইচ্ছে সাফল্য নিয়ে আপনার জীবনকে শীর্ষে পৌছে দিন। শর্ত হচ্ছে—কঠোর সাধনা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা স্রষ্টার ভাণ্ডার থেকে সাফল্যকে তুলে আনতে হবে। যারা কঠোর শ্রমে ও অধ্যবসায়ে অবহেলা করবেন তারা জীবনের প্রতিটি পদে পদে ব্যর্থ হবেন। ব্যর্থতা তাদের জীবনকে ধ্বংসের মুখোমুখি নিয়ে যাবে। এ ধ্বংস থেকে পরিত্রাণের উপায়ই হচ্ছে কাজ, সময়ের সদ্ব্যবহার। কঠোর শ্রম ও সীমাহীন ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি এক সঙ্গে অনেকগুলো কাজ করতেন, তাতে তার কোনো ক্লান্তি হতো না। সারা জসুয়া রেনল্ডকে এক সময় বন্ধুরা কর্ম-অবস্থায় সঙ্গ পাওয়ার আশায় গ্রামে ধরে নিয়ে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি পুনরায় কাজে যোগ দিয়ে যেন পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতেন।

পেসিন যতই বুড়ো হচ্ছিলেন, ততই তিনি কঠোর শ্রম ও সাধনার মাধ্যমে পরিপূর্ণতার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। সফলতার পথযাত্রী হয়েও তার তৃপ্তি হত না।

প্রতিভাবানরা কাজ করে কখনো তৃপ্ত হতে পারতেন না। কাজটা আরও উন্নত আরও সুন্দর হলেই বোধহয় ভাল হত ইত্যাদি ভাবনায় নানা অতৃপ্তি তাদেরকে সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত রাখতো। ফলে তারা কাজ করে উত্তরোত্তর সাফল্যের ভীত নির্মাণ করতেন। ভার্জিল এগার বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা তাঁর ইনিদ কাব্যখানি লেখেন। লেখা শেষে তিনি কিছুই হয় নাই ভেবে আগুনে পোড়াতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সহকর্মীর বাধায় তা পোড়াতে পারেননি। যে বই পরবর্তীকালে তাকে সাফল্যের সৌধ নির্মাণে সহায়তা করেছিল।

ভলটেয়ার কোনো বই লিখেই তৃপ্তি লাভ করতে পারেননি। প্রকৃত কর্মী যাঁরা তাঁরা সব সময়েই নিজেকে কাজে লিপ্ত রাখেন। মনে হয় আরও কিছু হলে ভাল হত

www.pathagar.com

ইত্যাদি অতৃপ্তি তাদের চেতনার কাজ করে ফলে সীমাহীন ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে তাঁরা সারাক্ষণ নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখেন। কাজের মাঝে ডুবে থাকাই তাদের স্বভাবসিদ্ধ নীতি। তাঁদের লক্ষ্য হয় সাফল্যের ভিত্তিতে জীবন সংগ্রাম। বিজয়ী তাদের কাম্য। বিজয়ী তাদের হতেই হবে। বিজয়ী হওয়ার জন্যই তাদের জন্ম। যারা জন্মসূত্রেই বিজয়ী তাদের তো ব্যর্থ হওয়ার কথা নয়। কাজেই বিজয়ী হওয়ার জন্যেই জীবন, ব্যর্থতার জন্য জীবন নয়। এ মনোভাবই তাদেরকে বিজয়ের সিংহাসনে আজীবন অধিষ্ঠিত করে রাখে।

যে জাতির মানুষ সময়ের গুরুত্ব জানে না, কাজের মূল্য বুঝে না। জীবন কি তা জানে না, বুঝতে চায় না, পরিশ্রম ও কঠোর সাধনায় যুক্ত হয় না। ছোট-বড় কাজের ভেদ-বিচার করে। কাজকে অসম্মান ও উঁচু-নিচুর পর্যায়ে বিশ্লেষণ করেন। তারা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন না। পৃথিবীতে অনেক জাতিই আজ আলস্যের ভারে ভিক্ষাবৃত্তির দুয়ারে নিমজ্জিত, পতিত। বড় বড় জাতিগুলোর কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাতা ছাড়া তার দিন চলে না। কিন্তু জনশক্তি তার দেশে কম নেই। যা আছে তার অর্ধেকই অলস, কুঁড়ে, অপদার্থ ও নির্বোধ। অমারাও এর বাইরে নই। আমাদের হাত পাততে লজ্জা করে না কিন্তু কাজ করতে লজ্জা পাই। এর চেয়ে নির্লজ্জ জাতি আর হতে পারে না। যারা পার্লামেন্টে যান তারাও চুরি, আত্মসাৎ, ঘুষ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত।

দেশে কাজ করতে লজ্জা হয় কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিদেশে গিয়ে কোনো রেস্টুরেন্টে ধোয়া-মোছার কাজ করতে লজ্জা হয় না। দেশে নিজের জমিতে তরকারীর চাষ করে তা নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে সম্মানের ক্ষতি হয়। কেউ ছোট কোনো কাজ করে বলে সমাজের ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পথ চলে। যেদিন বাড়ীতে খাদ্য থাকবে না—হাতে কোনো পয়সা থাকবে না, সেদিন কি সমাজ আপনাকে এসব দেবে? সমাজ কি খাওয়া-পরার ভার নেবে? নেবে না। তাহলে কাজে আপনার লজ্জা কিসের। সমাজের কপালে ঝাটা মারুন। আপনার কাজ দরকার ব্যস। যা করুন আর যাই করুন। যে কাজে পয়সা ও সম্মান দু'-ই অর্জন হবে— সেই কাজই তো আপনার দরকার। তা যে কোনো কাজই হোক না কেন—কাজে কোনো অমর্যাদাবোধ নেই। কাজের মাঝেই তো সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কাজ করতে না চাওয়া, অপরের কাছে দয়া ভিক্ষা করা, পরের করুণার অপেক্ষায় দিন কাটানো, মিথ্যা ও অসৎ পথে সময় ব্যয় করে জীবন কাটিয়ে দেয়াই তো লজ্জার, ঘৃণার, অসম্মানের কাজ। তাহলে কাজ করা লজ্জার হবে কেন? সময়ের অপব্যবহার করে, আলস্য করে জীবনকে মাটি করে দেয়ার অর্থ জাতির অনেক বড় ক্ষতি সাধন করা।

www.pathagar.com

জাতিকে নিচু করা। এ সবই লজ্জার কাজ, ঘৃণার কাজ। যে পরিশ্রম করে আপনি মনে তৃপ্তি পান তাই করুন। প্রয়োজনে প্রত্যহ রুটিন মাফিক কাজ করুন। এভাবে ধীরে ধীরে দেখবেন একদিন আপনি সফল হয়েছেন। একাগ্রতার সাথে কাজে লেগে থাকুন, আপনার সফলতার ক্ষেত্র উত্তরোত্তর প্রসারিত হতে থাকবে।

সময়ের গুরুত্ব ও কাজের প্রতি মনোযোগ দিন

সময়ের গুরুত্ব ও কাজের মাঝেই তো অর্থ, সম্মান, যশ-খ্যাতি, সুখ ও কল্যাণ সবকিছুই নিহিত। তবে কেন কাজের প্রতি আপনার এত অবহেলা, অবজ্ঞা, আলসেমি, কুঁড়েমি। এসব করে আপনি কেন নিজের জীবনকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছেন। আপনার হাতে প্রচুর সময় ও কাজের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আপনি কেন কাজ করবেন না। পৃথিবীতে এমন হতভাগ্য কেউ আছে কি— যে তার নিজের জীবনের উন্নতি চান না, নিজের জীবনকে মায়া করেন না, পরের দয়া ও করুণা নিয়ে বাঁচতে চান—এমন একজনও পাওয়া মুশকিল—তবে কাজের বেলাতে এত অবহেলা কেন।

আপনি কাজ করার জন্য প্রয়োজনে এক স্তর নিচুতে নেমে যান। বন্ধুরা কথা না বলুক দরকার নেই। আপনার ভদ্রলোক আত্মীয়-স্বজনদের প্রয়োজন নেই। টাকা না থাকলে এরা কেউ আপনাকে পাত্তা দেবে না—কাজেই এদের কাছে আপনার কাজ বড়-ছোট বলে কোনো কথা নেই। আপনি সৎভাবে পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করছেন এটাই তো আপনার সম্মানিত কাজ। এভাবেই তো আপনার অভাব দূর হবে। আপনার ঘরে ভাত আছে, দান করার মত পয়সা আছে। স্ত্রীর কাপড়ের অভাব নেই। ছেলে-মেয়েদের অন্ন-বস্ত্রের অভাব দূর হয়ে গেছে। এতেই তো আপনার সুখ-সাচ্ছন্দ্য, সমৃদ্ধি, সাফল্যের উত্তরাধিকারী আপনি। যদি অবিবাহিত যুবক হোন তাহলে আপনার আগামী অনেক সুদূর প্রসারী। আপনি সাফল্যের শীর্ষে পৌছে যাবেন তাতে কোনো দ্বিমত নেই। অসাধুতা অবলম্বন করে অর্থ উপায়ের প্রয়োজন নেই, এতেই বরং অসম্মান, অমর্যাদা ও লজ্জাবোধের প্রধান কারণ।

হযরত দাউদ (আঃ) নিজ হস্তে উদরান্নের সংস্থান করতেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর কোনো চাকর ছিল না।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) পানি তুলতে গিয়ে ইহুদির হাতে চড় খেয়েছিলেন। ক্ষুধার তাড়নায় হযরতের পরিবার যখন ব্যাকুল তখন তিনি পয়সা উপায় করতে গেলেন ইহুদির পানি তুলতে। তিনি সমগ্র মক্কায় আল-আমিন অর্থাৎ বিশ্বাসী নামে পরিচিত। বন্ধু-শত্রু সবাই তাঁকে এ উপাধীতে ডাকতো। সুতরাং হাত পাতলে তাঁর অর্থের অভাব হত না, তিনি তা করেননি। বন্ধু-বান্ধব তথা প্রিয় সাহাবাদের কাছেও ধার

www.pathagar.com

করতে যাননি। কাউকে নিজের অভাবের কথাও বলতে যাননি। তিনি ছিলেন আরবের সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশের কিন্তু বড় বংশের বলে পানি তুলে পয়সা উপায় করতে তিনি লজ্জাবোধ করেননি। কাজের মর্যাদা তো এখানেই। লোকে কি বলবে, সমাজে কি বলবে—এসব ভাবার আপনার দরকার নেই। আপনার দরকার কাজ। আপনার কাজের প্রয়োজন আপনি কাজ চালিয়ে যাবেন তবেই তো আপনার জীবনে সুখ-কল্যাণ আসবে। আপনি হবেন সুখি ও সমৃদ্ধ জীবনের কারিগর।

দানিয়াল ওয়েবেস্টার সাহিত্য সেবার সাথে সাথে নিজ হস্তে জমি চাষ করতেন। যে জাতি শারীরিক শ্রমকে ছোট ভাবে তারা নিকৃষ্ট ও পতিত। পাপ ও অসৎ কর্মে মানুষ ছোট হয়, পরমুখাপেক্ষী হয়ে এবং মনের স্বাধীনতা হারালে মানুষের অসম্মান হয়। সত্য ও পবিত্র জীবন ত্যাগ করে মিথ্যা ও অন্যায় জীবন বেছে নেয়াই তো পাপ ও লজ্জার কাজ, ছোট কাজ। এরূপ অসৎ কর্মে অন্যায়ভাবে একদল মানুষ অর্থ উপায় করে মান সম্মানের বড়াই করেন। ঘুষ খেয়ে বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করে সমাজে নিজেকে নামি-দামী বলে জাহির করার চেষ্টা করেন। মানুষকে ঘৃণার চোখে দেখেন। ধিক তাদের অর্থের, ধিক তাদের অসৎ পথে অর্থ উপার্জনের। এর চেয়ে ছোট বড় যে কোনো কাজই মহৎ কাজ। সম্মানের কাজ। অথচ অসৎ কাজগুলোই আমাদের দেশে বেশ গরমের সাথে চলে কিন্তু ছোট কোনো কাজ করার কথা বললে অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নেন। ঘুষ, দুর্নীতি, অসৎ উপার্জনের চেয়ে অফিস বয়ের কাজ, মুঠে মজুরের কাজ অনেক ভালো কাজ, সম্মানের কাজ আমরা এসব বুঝি না; বুঝতে চাই না। এ জন্যেই আমাদের আজ এত অধঃপতন। যেখানে বেকারত্ব মোচন হয়, অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়, পুঁজিবাদের পুঁজির পাহাড় ধ্বংস হয়, সে কাজেই তো আমাদের সকলের এগিয়ে আসা উচিত। অথচ আমরা গঠনমূলক কাজে আসতে চাই না। আমরা শ্রমিকদের ন্যায্য মূল্য দেই না, উল্টো বাজে কথা বলি। কামার, কুমার, জেলে, তাতি, ধোপা ও মুঠে-মজুররা—যারা এ কাজে এগিয়ে যান অপদার্থের মত তাদের সমালোচনা করি। আমাদের এ অভ্যাস যতদিন পরিত্যক্ত না হবে ততদিন আমরা উন্নত বিশ্বের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হব। আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন আবশ্যক। আমরা সবকিছুতেই নেতিবাচক ভাব দেখাই। আমাদের ভাবের পরিবর্তন হওয়া চাই—ইতিবাচক হওয়া চাই। তবেই তো আমরা সফলতার মুখ দেখবো। সাফল্যের পথে নিজেদের পরিচালিত করতে পারবো।

বেলজিয়ামের মন্ত্রী, বিলেতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ মেলাম গ্লাডস্টোন কুড়োল দিয়ে প্রকাণ্ড গাছ কেটে নামাতেন। এ কাজের জন্য তো তাকে কেউ ছোট লোক বলেনি। এগুলো হচ্ছে কাজের গুণ। কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ।

www.pathagar.com

ইংরেজ জাতি হাজার লক্ষ্য পথে নিজেদের জীবনকে স্বার্থক করে তুলতে চেষ্টা করেন। ইংরেজদের ঘৃণা করলে চলবে না। উপযুক্ত গুণ স্বীকার না করলে আমাদেরই ক্ষতি হবে। আমরাই পিছিয়ে পড়ব। এমনিতেই তো আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। উন্নত বিশ্বের তুলনায় আমরা এত পিছিয়ে আছি।

ইংরেজদের সাধনার হাত কত প্রসারিত। আফ্রিকার বন-জঙ্গলে, মেরু প্রদেশে, তুষার তরঙ্গে, অনন্ত সমুদ্রের বুকে, সাগর গর্ভে, অতলের তলে, ভূগর্ভে, আকাশে, পর্বতে, মঙ্গলে, চাঁদে—সর্বত্র সে তার শক্তি নিয়ে ছুটাছুটি করেছে। আহরণ করেছে বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান, আবিষ্কার করেছে নিত্য-নতুন সরঞ্জাম। এ তাদের অসীম সাধনা ও শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে আজ বিশ্ব জোড়া খ্যাতির মালিক তারা।

কত ইংরেজ সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে গবেষণায় মশগুল হয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। জাতিকে অনেক বড় কিছুর সন্ধান দিয়ে গেছেন। আজ তাদের বিশ্বজয়ী উত্থানের পেছনে, আবিষ্কারে, সৃষ্টিতে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, মহাকাশে গমনের অন্তরালে যে কত মানুষের জ্ঞান-সাধনা ও চিন্তাশীল গবেষণার হাত রয়েছে তা কি আমরা একবারও ভেবে দেখেছি।

যে জাতি নিজেকে উন্নীত করতে জানে, যে জাতি জগতে প্রতিষ্ঠা লাভের স্বপ্নে বিভোর হয়, তাদেরকে কি কেউ ছোট করতে পারে?

এক সময় বাঙালী জাতির অর্থ সম্পদের পাহাড় ছিল—তা তো নবাবী আমলের কথা। সে অনেক পূর্বে কিন্তু আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে দূরে থাকা, কাজের ভেদাভেদ, নেতিবাচক মনোভাব তাদেরকে উন্নত বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। দারিদ্র্যের সর্বনিম্ন কাতারে ঠাঁই করে দিয়েছে। এ আবদ্ধতা থেকে জাতিকে বাঁচাতে হবে। নিজেকে বাঁচতে হবে। জাতিকে বড় হতে হবে এবং নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

জন ব্রিটন তার হোটেলওয়ালা কাকার কাছে থাকতেন এবং কাজ করে কিছু পয়সা উপায় করতেন। হঠাৎ তার অসুখ হয়ে পড়লো—এ অসুখে তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল। কাজের সামর্থ কমে যাওয়ায় নিষ্ঠুর কাকা এ ক্ষতি সহ্য করতে পারলেন না। ভাইপোর হাতে গোটা দশেক টাকা দিয়ে বললেন, 'এখানে আর তোমার থাকার দরকার নেই, অন্য কোথাও জীবিকার সন্ধান কর।'

ব্রিটন তখন সাত বছরের বালক। ব্রিটন যখন খুব ছোট তখনই তার বাবা পাগল হয়ে যান। বাবা ছিলেন সামান্য রুটিওয়ালা। কাকার হোটেল থেকে বিতারিত হওয়ার পর ব্রিটনের কষ্টের শেষ ছিল না। কতদিন তাকে খাদ্যের পরিবর্তে পানি খেয়ে কাটাতে হয়েছে তার হিসেব নেই। শেষে কাজ জুটলো। কিন্তু সারাদিন নিদারুণ কষ্টের পরও ব্রিটন কোনোদিন পড়ালেখা ত্যাগ করেননি। যখনি সময় হতো

www.pathagar.com

একটু একটু করে জ্ঞানার্জন করত। স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হয়নি বলে বোকার মত চুপ করে বসে থাকত না। জ্ঞান, শক্তি ও অধ্যবসায় যার মাঝে আছে, সে কোনো ডিগ্রী অর্জন করুক আর নাই করুক তার উচ্চাসন একদিন হবেই, এ কথা বিলেতের সবাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন।

ব্রিটনের জীবনী অধ্যয়ন করে জানা যায় অতি কষ্টের ছিল তার জীবন। যে ঘরে সে বাস করতো, সে ঘরখানি ছিল নিতান্তই হীন। গ্রীষ্মকালে রোদের আলো ভেতরে যেত আর বর্ষার পানিতে ঘরের মেঝে ভর্তি হয়ে যেত। তবুও ব্রিটন কষ্ট করে সে ঘরে দিন কাটাত। পায়ে কত সময় জুতো জুটত না। দারুণ শীতে কত সময় তার গা খালি থাকতো। কত সময় পকেটে পয়সা থাকত না। হাতে পয়সা নাই তবুও কষ্টের মাঝে জ্ঞানার্জনের কাজ চালিয়ে যেত ব্রিটন। খানিক ক্ষণের জন্যে হলেও পরের বই ধার নিয়ে ব্রিটন তার মনের জ্ঞান তৃষ্ণা নিবারণ করত।

যখন তার বয়স আটাশ, তখন তিনি প্রথম গ্রন্থকাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। একটানা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তিনি সাহিত্য সেবা করে যান। তিনি তাঁর সাহিত্য জীবনে সাতাশিখানা বই লিখেন। কোনো বাঁধা তাঁর জীবনকে ব্যর্থ করে দিতে পারেনি। পরিণত বয়সে তাঁর অর্থ-সম্পদ ও যশ-খ্যাতির কোনো প্রভাব ছিল না। এখান থেকেই আপনি শিক্ষা নেবেন। সফলতার জন্য বিশ্ব বিখ্যাত মনীষীরা কত ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করেছেন তার সীমাহীন নজীর থেকেই আমরা শিক্ষা নিয়ে আমাদের জীবনকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করতে পারি। এতেই আমাদের মঙ্গল। সেল্‌ফ ইমপ্রুভমেন্ট সাহিত্য আমাদেরকে সে শিক্ষাই দিয়ে থাকে।

কীভাবে সম্মানিত হওয়া যায়

চেহারা সুন্দর হলে, দামী পোশাক পরে সাহেব সাজলেই যেমন ভদ্র হওয়া যায় না; তেমনি মানুষের ঘরে জন্মালেই কেউ মানুষ হয় না।

চরিত্রবান, ব্যক্তিত্ব, আচার-আচরণ, আদর্শ ও ন্যায়-নিষ্ঠার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির দ্বারা মনুষ্যত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও জাগ্রত বিবেক-বুদ্ধি-দীপ্ত মানুষই জগতের প্রকৃত মানুষ।

পৃথিবীতে এমন অনেক অপদার্থ ব্যক্তি আছেন। যারা বংশমর্যাদা ও অর্থ-সম্পদের বড়াইয়ে নিজেদের ভদ্র বলে জাহির করেন; অথচ তারা নিতান্তই মূর্খ। কোনো মনুষ্যত্ববোধ তাদের মাঝে নেই। সত্যিকার অর্থেই তারা নির্বোধ তাদের এহেন স্বার্থপর ক্রিয়াকলাপের প্রভাবে চারপাশের পরিবেশও দূষিত হতে পারে। যার মাঝে নেই, সাদা-কালো, উঁচু-নিচু, উগ্রতা-নিষ্ঠুরতা, জাতি-বর্ণ, আকৃতি-প্রকৃতি, প্রেম-ভালবাসা ও স্বভাব-চরিত্রের সংকীর্ণতা তিনিই আদর্শবান ও প্রশংসারযোগ্য।

www.pathagar.com

আর যদি আপনার মনে এসবের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে কিছুতেই নিজেকে পরিপূর্ণ মানুষ বলে দাবি করতে পারবেন না।

আদর্শবান বলতে, পরিপূর্ণ মানুষ বলতে, আপনাকে অনেকগুলো গুণের অধিকারী হতে হবে।

যদি বলি কথা বলার মাঝেও সৌন্দর্য আছে, কথাটি আপনার বিশ্বাস নাও হতে পারে। তবে একটু পরেই এর যথাযথ প্রমাণ পেয়ে যাবেন। যা বিশ্বাস না করার উপায় নেই।

ধরুন আপনার বাড়িতে কাজের লোক আছে। আপনি তাকে কড়া মেজাজ দেখান—এটা কর; সেটা কর; এভাবে সারাদিন তাদের দিয়ে কাজ করান। অর্থাৎ তাকে দাঁড়িয়ে থাকা বা আরাম-আয়েশে থাকতে দেখা; আপনার মোটেও সহ্য হয় না। আপনি না হলেও এমন অনেক লোক এ সমাজে বাস করেন।

আপনি কি ভাল করে খোঁজ নিয়েছেন যে, আপনার কাজের বাইরেও সে কাজ করে থাকে। হয়তো হঠাৎ করেই বিশ্রাম নেয়ার সময়টুকুতে আপনার নজরে পড়েছে আর তাতেই আপনি মনে করেছেন; সে সারাক্ষণ এভাবেই বিশ্রাম নেয়। একজন আদর্শবান মানুষের দৃষ্টি এখানেও প্রখর। তিনি আগে পরে চিন্তা করেই একজনের সম্পর্কে মন্তব্য করেন। আপনার মত উগ্র নন; সে কারণেই তিনি মানুষ। অপরপক্ষে, আপনি অমানুষ।

শুধু পেটের দায়েই, বাঁচার তাগিদে নিরীহ মানুষগুলো আপনার গোলামী করে থাকে। যারা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়েও আপনার মত অপদার্থ লোকের কাজ করে যাচ্ছেন একমাত্র বাঁচার জন্য। আপনি জানেন কি? সে কাজে তাদের মোটেও মনোযোগ থাকে না। কোনো রকমে সময়টুকু কাটিয়ে পারিশ্রমিক নেন এবং মনে মনে মনিবকে ঘৃণা করেন। অবশ্য মনিবকে তার অত্যাচার ও নির্যাতনের খেসারতও একদিন দিতে হয়।

কোনো মানুষই কারো প্রতি অবিচার করে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। আর পারলেও জীবনের যে কোনো সময়েই হউক না কেন? তাকে এর খেসারত দিতে হবেই। সেটা দু'দিন আগে নয়তো দু'দিন পরে।

আবার যদি আপনি আপনার কাজের লোকদের প্রতি অথবা (সকল মানুষের প্রতি) সহানুভূতিশীল হন। বেশ মিষ্টি সুরে-সুন্দর করে হুকুম করেন। তাহলে দেখবেন—মন দিয়ে সে আপনার কাজে লেগে গেছে। মনে মনে আপনাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করছে। আপনার অনুপস্থিতিতে বেশ কিছু কাজ সে করছে যার অনেকগুলোই আপনার অজান্তে।

www.pathagar.com

ওরা আসলে কি চায়? ওরা নিরীহ! একটু ভালবাসা ও সহানুভূতি পেলেই আপনাকে শ্রদ্ধায় মাথায় তুলবে। আপনি হুকুম করেন আর নাই করেন আপনার কাজের প্রতি সব সময়ই তার আলাদ নজর থাকবেই।

মনে রাখবেন, আপনার হুকুম, আপনার মেজাজ অসুন্দর হলে, তার কাজও অসুন্দর হবে। একথাটি কখনও ভেবেছেন? আপনার মত মানসিকতার লোকগুলো জাতির মস্তবড় ক্ষতি করেন। যে জাতির উঁচু শ্রেণীর মানুষগুলো, অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ লোকগুলোকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন। অহংকার ও ঘৃণা করেন। সে জাতি কখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন না। আপনি যাদের তুচ্ছ করছেন। তারাই প্রকৃত মানুষ। কোনো ভেদাভেদ, কোনো মতবাদ তাদের মাঝে নেই।

তারা চায় আপনাকে একান্তই কাছে পেতে, কিন্তু আপনি জাতিভেদ; উঁচু-নিচুর অঙ্ক বার বার কষে চলেছেন। একটু ভেবে দেখুন তাদের কারণেই আপনি শ্রদ্ধার মণি। তারা আছে বলেই আপনার এত মূল্য। কোনো মানুষকেই ছোট করে দেখবেন না। উপহাস করবেন না।

কেউ যদি ভুল করে বসেন। তাদের শোধরানোর সুযোগ দিন। কোনো অবস্থাতেই বঞ্চিত করবেন না। ভাল-মন্দের দিকগুলো সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিন। আপনার সুন্দর ব্যবহার; মিষ্টি মধুর বাক্যে সে উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরে উঠতে পারে। যা তাকে ভাল কাজের উৎসাহ যোগাবে।

প্রকৃত অর্থে পৃথিবীর কোনো কিছুই তুচ্ছ নয়। অনেকগুলো ক্ষুদ্রের মিলনে যেমন বিরাট কিছুর সৃষ্টি হয়; তেমনি আপনার ত্রুটিগুলো আস্তে আস্তে শোধরে নিন।

ছোট ছোট অপরাধগুলো যদি সময়মত শোধরে নিতে না পারেন; তবে সেগুলোই একদিন বড় কিছুতে পরিণত হবে। অপরদিকে অতি অল্প স্নেহ-প্রীতি থেকে গড়ে ওঠে সংসারের স্বর্গীয় সুখ।

www.pathagar.com

বিজয়ী হওয়ার মনোবল

জীবনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানোর একমাত্র পথ হল নিজের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে ওঠা। আপনার কর্মদক্ষতাই আপনাকে প্রতিনিয়তই অনুপ্রাণিত ও কর্মক্ষম করে তুলবে। আর কর্ম-পরিকল্পনাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে আপনার ইতিবাচক ভাবনা-চিন্তা। আপনি নিজেকে যেমনটি মনে করবেন বাস্তবে ঠিক তাই হয়ে উঠবেন। আপনার সীমাহীন কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তির দৃঢ়তা আপনাকে সেই পথে নিয়ে যাবে যা আপনি গভীরভাবে কামনা করেছেন।

নিজেকে কখনও দুর্বল ভাববেন না। অক্ষত ও ব্যর্থতার কথা জীবন থেকে মুছে ফেলুন। আপনি বিজয়ী হওয়ার মনোভাব পোষণ করুন। সব সময় ভাবুন, আপনার মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত সম্ভাবনা ও জীবনে সফল হওয়ার নানাবিধ গুণাবলী। আপনি সে গুণাবলী গুলোর সন্ধানকারী, ব্যবহারকারী ও আবিষ্কারক। এ আবিষ্কারের অনুসন্ধান জ্ঞানই আপনাকে বিজয়ী হওয়ার মনোবলের যোগান দেবে।

বিজয়ী হওয়ার মনোবলের অধিকারীত্ব অর্জনের জন্য আপনাকে অনেকগুলো গুণাবলীর শরণাপন্ন হতে হয়।

প্রথমে আসে আত্ম-বিশ্লেষণ

আমরা নিজেকে নানাভাবে প্রশ্ন করি। জানতে চাই জীবনের কথা। আলো অন্ধকারের শরণাপন্ন হই প্রতিনিয়ত। স্বপ্ন দেখি, কল্পনা করি, বাস্তবের কথা ভাবি। নানান ধরনের চিন্তার জগতে প্রবেশ করি। এ সবকিছুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর মনের ভেতর এক আত্ম-জিজ্ঞাসার জন্ম হয়। আত্ম-জিজ্ঞাসার আত্মোপলব্ধি জ্ঞানের সন্ধান পাই। এখান থেকেই আসে আমাদের সফলতার উৎস।

প্রতিনিয়তই আমাদেরকে নিজের সাথে কথা বলতে হয়। এই আত্ম-সংলাপই আমাদেরকে আত্ম-বিশ্লেষণের পথ দেখায়। জগতের প্রতিটি মানুষেরই একান্তভাবে নিজের সম্পর্কে একটা ধারণা থাকে। কিছু বিশ্বাস, অবিশ্বাস, মতামত ও মনোভাব প্রকাশের অনুভূতি নিয়েই মানব জীবনের পদযাত্রা। এ সবগুলোই আমাদের ভেতরের-বাইরের অভিজ্ঞতার ফলাফল। এখান থেকেই ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার সমষ্টি। আমাদের এসব অভিজ্ঞতাই পরবর্তীতে সফলভাবে জীবনকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। আমরা এ নানাবিধ অভিজ্ঞতা থেকেই আত্ম-শক্তির সন্ধান পাই।

www.pathagar.com

ধরা যাক, ব্যক্তি জীবনের কথা। কেউ কোনো কারণে তার চাকরি হারিয়েছেন। এখন তার প্রতিক্রিয়ায় তিনি হয়তো ভাবতে পারেন যে, আমি মেধাবী, কিন্তু যে কারণে চাকরিটা হারিয়েছি। এখন সে বিষয়ে অভিজ্ঞ হলাম। এর ফলে পরবর্তীতে আমি আরও ভাল কিছু অর্জন করবই। এটা একটা শিক্ষার বিষয় মাত্র। পরবর্তীতে এই ভুল আর দ্বিতীয়বার হবে না। এমনটা ভাবলে বিষয়টা শক্তিতে রূপান্তরিত হল। কিন্তু এভাবে না ভেবে বিষয়টিকে যদি অন্যভাবে ভাবা হয় যে, হায় হায় চাকরিটা হারিয়ে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। আমি আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। এই নেতিবাচক মনোভাবই আপনার ভেতরের শক্তিকে নষ্ট করবে। আপনার মনে নানাবিধ হতাশার জন্ম দেবে।

দুশ্চিন্তা আপনাকে গ্রাস করবে। এরূপ মনোভাব আপনার আত্ম-শক্তিকে পঙ্গু করতে সক্ষম।

আপনার মনোভাবের পরিবর্তন অনস্বীকার্য। নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত ভাবলেই তো আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই বিজয়ী হওয়ার মনোভাব পোষণ করুন। আপনি অবশ্যই বিজয়ের মনোবল খুঁজে পাবেন। নিজের মধ্যে ইতিবাচক ভাবনা ভেবে, চারপাশের ঘটনাকে স্বাভাবিকভাবে মনে করলেই আপনি লাভবান হবেন। এটিই বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা, সাফল্যের পথ।

আত্ম-জ্ঞান

আমরা পৃথিবীকে দেখি, বিশ্লেষণ করি কিন্তু এই দেখা নিজের ভেতরের ধারণার ফিলটারের মধ্য দিয়ে দেখি। আমাদের এ দেখার নিজস্ব ফ্রেম খুবই সংবেদনশীল। এটাই মানব চরিত্র।

নিজের সঙ্গে নিজের যে কথা হয়, এই কথা বাইরের কেউ শোনে না, এ কেবল আমার ভেতরের আমিত্বের জাগরণ। আমার ভেতরের এ আমিত্বের জাগরণ হ্যাঁ-সূচক ও না-সূচক দু'ভাবেই হতে পারে। অনেক সময় আমাদের ভুল অনুভূতিতেই নিজের সঙ্গে ভুল আত্ম-জ্ঞানের সন্ধান লাভ হয় তাই আমার আমিত্বকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন হয় সঠিক আত্ম-সন্ধান বিষয়ক জিজ্ঞাসার—যা হবে শঙ্কামুক্ত, দ্বিধাহীন, বলিষ্ঠ ইতিবাচক।

আত্ম-শুদ্ধির অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন

জীবন চলার পথে বাধাগ্রস্ত হয়েছেন। হয়তো ভাবছেন, হায়, আমার ভেতরের কথোপকথন না-সূচক, তাহলে কীভাবে শুধরাবো এটা? শুধরানো অবশ্যই সম্ভব। নিজের সঙ্গে কথা বলতে থাকুন। বিজয়ের মনোবল প্রকাশ করুন। এক সময় এটাই আপনাকে ইতিবাচক হতে সাহায্য করবে। আপনার ভেতরের আমিত্বই আপনাকে বলে দেবে তুমি ইতিবাচক যা ভাবছ, সত্যিই তুমি তাই।

www.pathagar.com

হয়তো কোনো ঘটনায় পরাজিত হওয়ার পর ভাবছেন; কাজটা আপনার জন্য সহজ ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে আপনি সেটাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন এ আত্ম-বিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবলই আপনাকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাবে। অতএব নিজেকে ইতিবাচক করে গড়ে তুলুন। স্বপ্ন দেখুন, আপনি সফলতার পদযাত্রী। নিজেকে হতাশ করবেন না। কখনোই নিজের ভেতরের সীমাহীন আত্ম-শক্তিকে অবিশ্বাস করে নিজের সঙ্গে প্রতারণা করবেন না। তাহলে জীবনে কখনোই আপনি বিজয়ী হতে পারবেন না।

আপনার ইতিবাচক ভাবনা হবে বাস্তবসম্মত

ইতিবাচক মনোভাবের গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনে ইতিবাচক হওয়ার আত্ম-প্রত্যয়ের সাক্ষাত সবাই পায় না। যারাই এর সাক্ষাত লাভ করেন, তারাই বুদ্ধি খাটিয়ে গঠনমূলকভাবে আত্মোন্নয়ন ঘটাতে পারেন।

খেলোয়াড়দের দিয়ে একটা উদাহরণ দাঁড় করাতে চাই। কোনো ফুটবল খেলোয়াড় একটি বল মিস্ করল। সে ভাববে যে দ্বিতীয় বার আর ভুল হবে না। সে এ কথা ভাববে না যে তাকে ভাল খেলতে হবে বরং সে ভাবতে পারে যে সে ভাল খেলতে চায়। সে বিজয়ী হতে চায়। বিজয়ী হওয়ার মনোভাব নিয়েই সে খেলতে নেমেছে। তাকে জিততে হবেই। এটাই যথেষ্ট। খেলা বিশেষজ্ঞরা এটাই মনে করেন। "Feel good" এটাই বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাস্তবসম্মত। ইতিবাচক ভাবনা থেকেই আপনি একটা হ্যাঁ-বোধক উত্তর পেয়ে যাবেন যে আপনার সফলতার জন্য পরবর্তী করণীয় কি? অনুশোচনায় বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। দেখবেন নিজের জীবনের সাফল্যের সম্ভাবনাময়ী অভিজ্ঞতাগুলো নিজের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এভাবেই আপনি গভীর আত্ম-বিশ্বাস খুঁজে পাবেন। অসম্ভবকে ক্রমে ক্রমে সম্ভবে পরিণত করতে পারবেন।

আপনার সীমাহীন মানসিক শক্তির ইতিবাচক মনোভাবই ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে তুলবে।

জীবনে কখনও ব্যর্থতার কথা শুনে বিচলিত হবেন না। জীবন যেখানে— সেখানে ব্যর্থতা সফলতা থাকবেই। তবুও, ব্যর্থ কথাটি শুনলে অনেকেরই হয়ত পিলে চমকে যায়? কিন্তু ব্যর্থতা ভিন্ন কিছুই নয়, সফলতার বিপরীত শব্দমাত্র। যেখানে সফলতা, সেখানেই ব্যর্থতা। অবশ্য এমনিতেই কেউ ব্যর্থ হন না। এর পেছনে বহু কারণও থাকতে পারে।

www.pathagar.com

আপনি যা কামনা করেছেন? যা চেয়েছেন? তা হয়ত পাননি? নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে! সামান্য একটি ভুলের জন্য মস্তবড় বাধার সম্মুখীন হতে হয় তা হয়ত আপনার জানা নেই।

শুধু দু'মুঠো ভাত খেয়ে কাটিয়ে দেয়ার নাম জীবন নয়; জীবন এক বিশাল ক্ষেত্র। যদিও মানবজীবন স্বল্প; কিন্তু এর গণ্ডি সীমাহীন। কারণ, মানুষ তার আপন কর্মের দ্বারা শত শত বছর পৃথিবীতে বেঁচে থাকেন।

যেমন—মহাকবি সেক্সপীয়র, বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ও বিজ্ঞানী নিউটন বহু আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও তাঁদের সৃষ্টি কর্মের দ্বারা অমরত্ব লাভ করেছেন। জগতের সবাই শ্রদ্ধাভরে তাদের স্মরণ করছেন। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ই তাঁদেরকে এত মহৎ। এত বড় ব্যক্তিত্বরূপে তৈরী করেছে।

আপনি হয়ত উড়োজাহাজ দেখেছেন? কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন? কীভাবে এটা তৈরী হল?

রাইউ ভ্রাতৃত্বদ্বয়ের বহু চেষ্টা ও সাধনার ফসল আজকের উড়োজাহাজ। কিন্তু তাঁদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে তাঁরা আপনার মতই মানুষ। এবার নিজের জীবনের দিকে লক্ষ্য করুন।

আপনি কেন পারবেন না সুন্দর জীবন গড়তে? বিখ্যাত ব্যক্তি হতে? একজন মেধাবী ছাত্র হতে?

উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে? সবই আপনার পক্ষে সম্ভব।

জগতের প্রত্যেকটি মানুষই চায় বড় হতে। ভুল করেও কেউ ছোট হওয়ার আশা করে না; কিন্তু তবুও কেন জানি কর্মই মানুষকে ছোট করে।

সত্যের সন্ধ্যানী, কর্মে উদ্যমী, অধ্যবসায়ে বিশ্বাসী ব্যক্তিই সুন্দর জীবনের অধিকারী।

অপরপক্ষে, জীবন চলে গেলে যেমন মানুষকে কবর দিতে হয়, সাদা কাঁফন পরাতে হয়, তেমনি শ্রমবিমুখ, আলসে, অমনোযোগীর জীবনে ব্যর্থতা নেমে আসে। এ ব্যর্থতাই হতাশমুখর করে তোলে তার জীবনকে। তখনই মৃত্যুর কাঁফন জড়ানো জীবন্ত লাশের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠে তার জীবনে।

সবাই সুখি হতে চায়? চায় সুন্দরভাবে বাঁচতে? কিন্তু সবার এ চাহিদা পূরণ হয় না। আর এ চাহিদা পূরণ করতে যে পথটি কোলা আছে তা—হল পরিশ্রম, চেষ্টা ও উদ্যম। অর্থাৎ পরিশ্রম তথা কঠোর অধ্যবসায়ে লিপ্ত হতে হবে। কোনো কারণে ব্যর্থ হলে পুনরায় চেষ্টা করতে হবে। এবং কর্মের প্রতি পূর্ণ উদ্যমী হতে হবে। তাহলে সাফল্য আসবেই।

www.pathagar.com

ব্যর্থতা বলতে কিছু নেই, সফলতাই জীবন। জীবনের নিয়তি অত্যন্ত নির্মম। যারা জীবনের প্রয়োজনে সময়কে মূল্যায়ন করতে শিখেন; তারাই জীবনকে জানতে পারেন। ঘাত-প্রতিঘাত ছাড়া জীবন হতে পারে না। জীবন যেখানে আছে দুঃখ-দৈন্যতা, ব্যথা-বেদনা সেখানেই বিদ্যমান। পৃথিবীতে বহু প্রকৃতির মানুষ আছে কিন্তু কেউ পরিশ্রমের দ্বারা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, আবার কেউ অবহেলার কারণে জীবনের গতি হারিয়ে ফেলেন। অনেকের জীবনে দেখা দেয় এক নির্মম নিয়তির খেলা মানব। জীবন বৈচিত্র্যতার সমষ্টি। কেউ ছোট থেকে বড় হচ্ছে আবার কেউ বড় থেকে ছোট হচ্ছে। এ বৈচিত্র্যময়তার নিয়তিকে ভেদ করে, নানা রকম ত্যাগ-তিতিক্ষাকে হজম করে যিনি সফলতার দ্বারে পৌঁছে গেছেন নেলসন ম্যান্ডেলা তাঁদেরই একজন।

আপনি হয়ত অবাক হবেন তাঁর জীবনের নিয়তির কথা শুনলে। কিন্তু অনেক কষ্ট, অনেক ব্যথা, অনেক বেদনা পাওয়ার পরও তিনি জীবনের হাল ছাড়েননি। সংগ্রামের ৪০ বছর এবং কারাভোগের ২৭ বছর; এতগুলো বছর যিনি ঘাত-প্রতিঘাতের মোকাবেলা করেছেন, পেছনে ফিরে তাকানোর সময় হয়নি। যার একদিনের স্বপ্ন ছিল জাতির কর্নধার হওয়া, আর এ স্বপ্নই একদিন সত্যি হয়েছিল।

তিনিই হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদীত নেতা, প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা, যার পুরো নাম হল; বলিহলাহলা ম্যান্ডেলা।

১৯১৮ সালের ১৮ জুলাই তিনি ট্রামস্কিতে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ আন্দোলনের প্রবক্তা। বিশ্বের অন্যতম একজন জীবন্ত কিংবদন্তী। তাঁর পিতা ছিলেন থেম্বু গোত্র প্রধানের প্রধান উপদেষ্টা। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং নেতা হিসেবে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় শোষক শ্বেতাঙ্গনের বিরুদ্ধে বর্ণবাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং সেই সূত্রে ১৯৬৩ সালে ম্যান্ডেলাকে কারারুদ্ধ হতে হয়। দীর্ঘ ২৭ বছর কারাভোগের পরও তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। অবশেষে ব্যাবন দ্বীপের নির্জন কারাগার থেকে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

১৯৯৪ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং ১৯৯৪ সালেই তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনে যোগদান করেন।

তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ 'ন্যাম' শীর্ষ সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

www.pathagar.com

বই জ্ঞান ও জ্ঞানী

মানুষের শিক্ষার প্রধান উপকরণ হচ্ছে বই। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইতি-আদির রহস্য শুধুমাত্র পুস্তকের পাতায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংরক্ষিত হয়ে আসছে।

মহা গ্রন্থ আল-কোরআন, বাইবেল, জেন্দাবেস্তা কিংবা গ্রন্থ সাহেব যাই হোক সবই গ্রন্থ বা বই আকারে পৃথিবীতে প্রচলিত।

বইয়ের ভেতরের সংরক্ষিত ধারাবাহিক বিশ্লেষণই জ্ঞান এবং এই জ্ঞান আহরণ করে যারা জীবনের মাহত্ম ও আত্মোপলব্ধির দ্বারা জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হন তারাই জ্ঞানী। আর জ্ঞানীদের কথা ও জীবন-কর্মের ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যুগের পর যুগ ধরে পুস্তকের পাতায় সংরক্ষিত থাকে। সুতরাং বলতে গেলে বলতে হয় বই, জ্ঞান ও জ্ঞানী প্রতিটি শব্দই পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই আমি বই নিয়ে আলোচনা করতে যে যে বিষয়ের সাক্ষাত পাওয়া যায়— সেগুলোই তুলে ধরছি। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, 'অজ্ঞতাই মানুষের সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত শত্রু।' আর এই অজ্ঞতার অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে চাই জ্ঞানের আলো এবং জ্ঞানের অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে বই বা গ্রন্থ। পবিত্র কোরআনের প্রথম বাক্যটিও ছিল, 'পড়! তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।'

তবে বই পড়ার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই ভাল বই নির্বাচন করতে হবে। কি ধরনের বই আমরা বেশি বেশি পড়লে জীবনে উপকৃত হওয়া যাবে, আত্মোন্নয়ন ও আত্ম-বিশ্বাসের সাথে কর্মজীবনে সফলতার দ্বারে পৌঁছানোর উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে, সর্বোপরি জীবনের মাহত্ম অনুধাবন করা যাবে। এই সমস্ত বই-ই আমাদের নির্বাচন করা উচিত। কিন্তু কিছু বই আমাদের ক্ষণিক বিনোদন যোগায়। সে-সব বইও আমাদের অবসর সময়ের সঙ্গী হয়; তবে এ ধরনের বইয়ের পেছনে সময় ব্যয় তথা এ বইগুলো আমাদের কম পড়া উচিত।

ইংরেজ লেখক বেঞ্জামিন ডিসরেইলি প্রতি দশটি বইয়ের নয়টিকেই বাজে (Nonsense) বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তিনি প্রকারান্তরে সে-সব বাজে বই পড়তে নিষেধ করে গেছেন। ব্রিটিশ লেখক ও কবি মার্টিন থাপার বইকে করেছিলেন 'সব বন্ধুর সেরা বন্ধু'। তবে সে বই হওয়া চাই জীবন মুখি ও ভাল বই। ফ্রান্সিস বেকন তো কোন্ বই কীভাবে অধ্যয়ন করতে হবে তাও বাৎলে দিয়েছেন। আর তা করতে যেয়ে তিনি সচেতন ভাবে 'ভাল বই' থেকে খারাপ বইকে পৃথক করেছেন।

www.pathagar.com

গ্রন্থ হিসেবে পৃথিবীর সব ধর্ম গ্রন্থই মানুষকে নৈতিক শিক্ষা ও ইহকাল এবং পরকালের মুক্তি ও জীবন ব্যবস্থার সমাধান দেয়। মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পবিত্র কোরআনে কারীম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। বাইবেল, জেন্দাবেস্তা কিংবা গ্রন্থ সাহেবসহ পৃথিবীতে আরও বহু ধর্মীয় গ্রন্থ রয়েছে। এসব গ্রন্থেই মানব মুক্তি ও কল্যাণের পথ-পন্থার সন্ধান দেয়া হয়েছে।

পারস্যের বিখ্যাত মহাকবি ওমর খৈয়াম তাঁর 'বেহেশতের' সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে ভাল বইয়ের কথা ভোলেননি। তবে বই পড়ার বিকল্প নেই। নিম্ন মানের বই না পড়লে, উচ্চ মানের বইয়ের মর্যাদা সম্যক ধারণা পাওয়া কঠিন। অন্ধকারকে আগে উপলব্ধি না করতে পারলে, আলোর মাহাত্ম বোঝা যেমন কঠিন। মন্দ আছে বলেই তো ভালর এত কদর। তাই ভাল মন্দ বুঝার জ্ঞান মানুষ এ দু'টি শব্দ থেকেই প্রকৃতি অনুযায়ী জানতে পারে। এ দুই ধরনের বই-ই আমাদের ফারাক করে দেয় কোন্‌টি ভাল বই। কোন্‌টি পড়লে জীবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে। কোন্‌টি পড়লে আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে জীবনে সাফল্য অর্জনে ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী হওয়া যাবে।

আমার মতে বই মানুষকে সীমাহীন শক্তির অধিকারী করে তোলে। কর্মের প্রতি গতিশীল, জীবনের প্রতি যত্নশীল, সময় শ্রমের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলার মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনকে সাফল্যের স্বপ্নীল রাজ্যে প্রবেশ করায়। যদি পাঠক সে উপযুক্ত বইটি খুঁজে নিতে পারেন।

বই পড়ার ক্ষেত্রে অবশ্য মার্কিন দার্শনিক হেনরি ডেভিড থরুর কথা মনে রাখার মতো, থরু বলে গেছেন, "সবচেয়ে ভাল বইগুলো সংগ্রহ করে আগে ভাগেই পড়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চার কর। কারণ এগুলো পড়ার সময় আখেরে না-ও পেতে পারো।"

বই পড়ার জন্য বই কিনতে হয়। সৈয়দ মুজতবা আলীর কল্যাণে মার্ক টোয়েনের লাইব্রেরী গড়ে তুলবার কাহিনী সবারই জানা। হাসির রাজা হিসেবে খ্যাত মার্ক টোয়েন নাকি বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে বই ধার করে করে নিজের বিশাল লাইব্রেরীটি গড়ে তুলেছিলেন। অর্থাৎ বই ধার নিয়ে তা ফেরত দেয়ার অভ্যাস মার্ক টোয়েনের ছিল না। অবশ্য ওই কাহিনী জানবার পর এখন খুব কম লোকই বই ধার দেয়াকে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন। তবে তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। কিন্তু বই ধার না নিয়ে পড়ার উপায় কি? অবশ্যই বই কিনে। পাবলিক লাইব্রেরীতে গিয়েও বই পড়া যায়। কিন্তু সব লাইব্রেরীতেই কি সব বই পাওয়া যায়?

নিজের পছন্দের লেখকের বই কিন্তু একান্তই পছন্দসই। বই সংগ্রহ করতে অবশ্যই বইমেলা কিংবা যেখানে সব ধরনের বই কিনতে পাওয়া যায় সেখানেই যেতে হবে। তাহলে এর অর্থ হচ্ছে বই কিনতে হবেই। যদি বই পড়তে হয়, তাহলে তো বই কিনতে হবেই। বই কেনার ক্ষেত্রে অবশ্যই ভাল বই নির্বাচন করতে হবে।

www.pathagar.com

অতীতে এক সময় নাকি পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরী গড়ে উঠেছিল বলে শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এখনতো স্কুল-কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগারগুলোও বেহাল দশা। বই নেই; কিংবা বই স্বল্পতা।

আমাদের সমাজে অনেকেই অনেক মন্দ কাজে ও অতিরিক্ত কোনো কাজে কিংবা আড্ডার উপকরণ সংগ্রহে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। এমনকি বেকারদের ও স্বল্প আয়ের লোকদের ক্ষেত্রেও এমনটি হয়। কিন্তু বই কেনার জন্য যেটুকু অর্থের প্রয়োজন তা সীমিত হলেও কেউ বই কেনার পেছনে অর্থের দণ্ডতার কথা ভাবেন। অথচ আমরা কম-বেশি সবাই বই কিনলে বইয়ের দামও যেমন কম হবে; তেমনি আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারও সমৃদ্ধ হতে থাকবে। আমরা অনেকেই কেনার জন্য বই পড়ি না। অথচ চলার পথে অনেক অর্থই অপচয় করি। এ হিসেব কখনই করি না যে, যেটুকু অর্থ অপচয় হয়; বই কিনতে তার কিঞ্চিতও লাগে না। বই কিনলে জ্ঞান অর্জিত হয়; আর অর্থ অপচয় হলে যে পরবর্তীতে সমস্যায় পড়তে হয়; এ দিকটির হিসেব বোধ হয় কেউ করেন না।

সৈয়দ মুজতবা আলী যথার্থই বলেছিলেন, "বই সস্তা নয় বলে লোকে অজুহাত দিয়ে বই কেনে না; আর লোকে বই কেনে না বলেই তো বই সস্তা করা যায় না।" "বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলিয়া হযনি।" এ কথা বলে তিনি বেমালুম চাপিয়ে দিয়েছিলেন পাঠককূলের ওপর।

বই পড়ে আনাতোল ফ্যাঁসের মতো গাদাগাদা মনের চোখ সৃষ্টির বা বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো এক গাদা নতুন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলার কথাও তিনি বলেছিলেন। এতে যে কাজ হয়নি তা বলা যাবে না। তবে পাঠক বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করবে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে, আত্মোন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে। এই কামনাই করি। পাঠক যে বই-ই কিনুন না কেন সঙ্গে যদি একটি আত্মোন্নয়মূলক বই কিনেন, তবেই তার বই কেনা স্বার্থক হবে। কারণ আমার লেখা বইগুলোর প্রায় সবগুলোই জীবন গঠনে, সফলতা লাভ ও জ্ঞানার্জনের শ্রেষ্ঠ বই আপনার জানার সুবিধার্থে নামগুলো উল্লেখ করা হল—

- ❑ (হাউ টু সাক্সীড্ ইন লাইফ)
  কীভাবে জীবনে সফল হওয়া যায়
- ❑ (দ্য ম্যাজিক অব সাক্সেস)
  সাফল্যের যাদু
- ❑ (লাইফ ইজ দ্য রেস)
  জীবনটাই প্রতিযোগিতা

[টিপ অব দ্যা ব্লাক লিস্ট খ্যাত, তীব্র সমালোচিত, বিনোদনে সেরা, সময়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস]

মন যা চায়

বই পড়ুন, জ্ঞান অর্জন করুন এই কামনাই করি।

www.pathagar.com

সৌভাগ্যের জন্য দিন

সৌভাগ্য জীবনে এমনিতেই আসে না। সৌভাগ্যের জন্য চাই পরিকল্পিত জীবনবোধ। একটি সুন্দর পরিকল্পনার ভিত্তিতে জীবনকে পরিচালিত করার মাঝেই সৌভাগ্যের হাতছানি।

মানব জীবনে সৌভাগ্য আসে তার কর্মের উপর ভর করে। তাই জীবনে কর্মকে প্রাধান্য দিতে হয়। কর্মহীন লোক কখনোই সৌভাগ্যের সাক্ষাত পান না। সৌভাগ্যের পরিবর্তে দুর্ভাগ্যই তাকে গ্রাস করে।

সৌভাগ্য যে ব্যক্তি কর্মের উপর নির্ভরশীল তা নিম্নের দু'টি বাক্য দ্বারা বিশ্লেষিত হল;

"কর্মের মাধ্যমেই ভাগ্যের পরিবর্তন, কর্মই ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে।"

প্রতি মানুষই তার 'ভাগ্যের স্রষ্টা'। তাই জীবনের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার জন্য ভাগ্যের উপর নির্ভর করা বোকামী ছাড়া কিছুই নয়।

স্রষ্টা কারও ভাগ্যের পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তার ভাগ্য পরিবর্তনে এগিয়ে না আসে!

ভাগ্য মানুষকে গড়ে না বরং মানুষই ভাগ্যের নির্মাতা। মানুষের কর্মই ভাগ্যকে সুনির্ধারিত পথে পরিচালিত করে। সমাজে বহু লোক বাস করেন। তাদের অনেকেরই ধারণা অন্ধ নিয়তিই জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে আর তাই, দুঃখ-দুর্দশা, ব্যথা-বেদনা এলেই তারা অদৃষ্টকে দোষারোপ করেন; অথচ গভীর ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মানুষের এ অন্ধবিশ্বাসের কোনো ভিত্তি বা যৌক্তিকতা নেই।

মানুষের সকল কাজের কারণ বিশ্লেষণ করলে তার জীবনের তিনটি ধাপ পাওয়া যায়—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। এ তিনটির সমন্বয়েই তার জীবন। কর্ম ছাড়া পৃথিবীতে কোনো মানুষ নেই, বাঁচতে হলে কর্ম করতেই হবে; এটা চিরসত্য। মানুষের কর্ম শ্রম সাপেক্ষ। শ্রম অধ্যবসায়ের নিমিত্ত, সুতরাং সকল উন্নতির মূল মন্ত্রই হচ্ছে শ্রম। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত বা জাতিগত সকল উন্নতির চাবিকাঠিই হচ্ছে শ্রম ও কঠোর সাধনা।

যে জাতি যত পরিশ্রমী সে জাতি তত উন্নত। ভাগ্যের উপর নির্ভর করে জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবেন না। ভাগ্যের পরিবর্তন সাধন করতে, উন্নত জীবন গড়তে, হতাশা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে, পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই।

কর্মের ধারাকে অব্যাহত রেখে পরিশ্রমী জীবন গ্রহণ করতে হবে। দুনিয়ার ইতিহাসে যাদের গৌরব-কীর্তি স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে তাঁরা সকলেই ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। বিদ্যা, অর্থ, সম্মান, খ্যাতি সবকিছুই শ্রমের দ্বারা অর্জিত। তাই নিরলস

www.pathagar.com

পরিশ্রমের দ্বারাই মানুষ তার জীবনকে সুন্দর, স্বার্থক ও তাৎপর্যসময় করে তুলতে পারে।

জনৈক মনীষী বলেছেন, "তোমার ক্ষুদ্র জীবনটাকে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা যত পার স্বার্থক করে তোল।'

কোদু বোফে নামক একজন ফারসী লেখক দীর্ঘ ৫০ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি বই লিখেছিলেন। কিন্তু নিজের কাছে ভাল না লাগায় তিনি পুনরায় লিখতে শুরু করেন, এভাবে যত বারই তিনি বইটি লিখেছেন, ততবারই তার মনঃপুত হয়নি। এমনি ভাবে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গিয়ে আনন্দের হাসি তাঁর ঠোটে দেখা গেল। বইটি ছিল অনেক বড়। মোট ৪৪ খণ্ডে বইটি সমাপ্ত হয়। লেখার ক্ষেত্রে এমন সাধনার নজীর বিশ্বে বিরল।

আপনি যদি কোদু বোফের কথা ভেবে দেখেন তাহলে সহজেই বুঝতে পারবেন ৫০ বছর একটানা অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা, আপনার কি ইচ্ছে করে না তার মত সাফল্য লাভ করতে? তাহলে বিশ্বাস রাখুন ভাগ্য আপনাকে গড়তে পারে না, বরং আপনি নিজেই ভাগ্যের নির্মাতা। যদি বিশ্বাস করে থাকেন, কোনো কাজই অগৌরবের নয়। যে কোনো কাজের মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন সাধন করবেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

আপনি কি বিশ্বাস করেন না?..... নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলতে। আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে; একমাত্র শ্রমশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার প্রয়োজন।

যদি কেউ গভীর ভাবে চিন্তা করত পৃথিবীতে বহু মনীষী, মহামানব এসেছিলেন। আজ তাঁদের কেউ বেঁচে নেই; কিন্তু তাঁদের কর্মগুলোই তাঁদেরকে অমরত্ব দান করেছেন। এভাবে আপনাকেও একদিন মরতে হবে। আপনার কোনো চিহ্নই থাকবে না। থাকবে শুধু কর্ম আর কর্মের মধ্যেই বেঁচে থাকবেন আপনি।

তাহলে যারা সত্যিকারের ভাবুক, চিন্তাশীল তারা জীবনের একটি মুহূর্তও নষ্ট করত না।

জীবন থেকে যেটুকু সময় চলে গেছে তা নিয়ে ভাববেন না, আগামীর সময়টুকু শক্ত করে ধরুন।

কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করুন।

আপনার সাফল্যকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

শুধু বিশ্বাস রাখুন— "Industry is the mother of goodluck"

www.pathagar.com

Chapter Three

অধ্যায় ৩

- ☆ সফলতার সহজ উপায়
- ☆ সৃষ্টিশীলতাই প্রতিভা
- ☆ আলোকিত জীবনের সন্ধান করুন
- ☆ আত্ম-বিশ্লেষণ করুন
- ☆ প্রতিভা বিকাশের অনুশীলন
- ☆ পড়া মনে রাখার সহজ কৌশল
- ☆ সময় ও জীবনের কথা
- ☆ পরিকল্পিত জীবনের কথা
- ☆ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব
- ☆ ব্যক্তিত্ব ও মানবতার বিকাশ
- ☆ নিজেকে উপস্থাপন করার দক্ষতা অর্জন
- ☆ ব্যক্তিত্বের বিকাশে মুক্ত বুদ্ধির অনুশীলন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সফলতার সহজ উপায়

আমরা সবাই সফলতার আশায় বসে থাকি। বিখ্যাত হওয়ার মনোবাসনা প্রকাশ করি। কিন্তু কীভাবে সফল হওয়া যায়। এর সহজ উপায় খুঁজে পাই না। বা সহজেই সফল হওয়ার চর্চা করি না। আমাদের এই না-বোধক ক্রিয়াই সফলতার সহজ পথ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। আমরা ভয় পাই; জীবনকে কি যেন মনে করে বসি। এটা হবে না— সেটা হবে না। আর বুঝি কিছু করা সম্ভব নয়। এই ভাবনাগুলোই আমাদেরকে নিষ্কর্ম করে ফেলে। চলার পথের গতিকে রুদ্ধ করে দেয়। দুশ্চিন্তা ও হতাশার জন্ম দেয়। তখন আমরা ভাগ্যকে দোষারোপ করি। জীবনকে দোষ দেই। আমাদের এ নেতিবাচক অভিব্যক্তিই জীবনে দুর্ভাগ্যের সূচনা করে।

যে কালগুলো মিলেই আমাদের জীবনের ব্যপ্তি। সে কালগুলো সম্পর্কেও আমরা সঠিকভাবে অবগত নই। এ কালগুলোর সমষ্টি সম্পর্কে বিশ্লেষণ জ্ঞান থাকাও আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক।

বাল্যকাল, যৌবনকাল ও বৃদ্ধকাল এই তিনকালের সমষ্টিই মানব জীবন কিন্তু বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধ তিনটিই সময়ের ছকে বাঁধা। তাই, বলা হয়, মানব জীবন সময়ের ছকে বাঁধা। সময়ের গতির সাথে সাথে মানব জীবন থেকে একের পর এক কালগুলো ঝরে যায়। এভাবে এক সময় তাকে বৃদ্ধ জীবনে পতিত হতে হয়। আর তখনই তার অবসান ঘটে।

মানুষ মহান স্রষ্টার এক অপূর্ব সৃষ্টির লীলা। সেজন্য তাকে 'আশরাফুল মাখলুকাত', অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব বলা হয়। এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে আল্লাহ্ মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন, জ্ঞান দিয়েছেন যা আঠার হাজার মাখলুকাতের কোনো সৃষ্টিকে দেননি। এ কারণেই মানুষ স্রষ্টার অন্যান্য জীবের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

পশুও মানুষের মত হাঁটা-চলা করতে পারে। মানুষের মত জন্মগ্রহণ করে, বড় হয়, জন্মদান করে, পরিশেষে মৃত্যুবরণ করে। মানুষ এবং পশুতে যেটুকু পার্থক্য তা হল মানুষের জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে কিন্তু পশুর তা নেই। জ্ঞানের চর্চা করেই মানুষ পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। এ জন্যই বলা হয়, জ্ঞান চর্চাই ব্যক্তি

www.pathagar.com

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর; জ্ঞানীর মৃত্যু নেই। জ্ঞান চর্চার মাধ্যমেই মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করেন। ভাল—মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বুঝতে সক্ষম হন। অনুশীলন ছাড়া জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। তাই জ্ঞানার্জন চর্চা বা অধ্যবসায়ের দ্বারা পরিপূর্ণ মানুষরূপে আত্মপ্রকাশের হাতিয়ার।

যদি প্রশ্ন করি জীবন কি এবং কেন?

তাহলে হয়ত সহজেই বলবেন "Life is nothing". অর্থাৎ জীবন কিছুই না, কারণ মানুষের বেঁচে থাকার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যেকোনো মুহূর্তেই সে মৃত্যুবরণ করতে পারে; আর কবে? কোথায়? কীভাবে? তার মৃত্যু হবে তাও সে বলতে পারে না। কেননা সে ক্ষমতা স্রষ্টা মানুষকে দেননি। মানুষের জীবন খাতায় একটি নামই লিখে দিয়েছেন "Man is mortal" অর্থাৎ মানুষ মরণশীল। মরতে তাকে হবেই; সেটা দু'দিন আগে অথবা দু'দিন পরে। পবিত্র কোরআন শরীফে তিনি স্পষ্টই বলেছেন— "কুল্লু নাফছিন যায়েকাতুল মাউত" অর্থাৎ প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

যদি ব্যাপকভাবে বলি জীবন কি?

তাহলে বলতেই হয়, জীবন একটি গতির নাম। যার মৌলক ধারা আছে। যে ধারা মানুষ থেকে শুরু করে অপরাপর প্রত্যেক জীবের মাঝে কাজ করে। জীবন হল মূল্যবান ও অপার এক অদৃশ্য শক্তির নাম। মানবীয় জীবন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবর্তিত। আর এ সময়ের একটি মাধ্যম হল মৃত্যু। অর্থাৎ সময়ের সমষ্টির নামই জীবন এবং জীবনের জন্য মৃত্যু।

জীবন যেখানে আছে মৃত্যু সেখানে অনিবার্য। জীবন এক বিশাল রণক্ষেত্র, যার সৈন্য প্রত্যেকটি মানুষ। আর যুদ্ধ হচ্ছে তার আত্মার বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধের হাতিয়ার হচ্ছে—'শ্রম,' ও 'সময়' শ্রমের দ্বারা সময়কে যথাযথ ব্যবহার করতে পারলেই জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে পারবেন।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেমন অবহেলা বা সামান্য ত্রুটির কারণে পরাজয় অনিবার্য হয়ে পড়ে; তেমনি আত্মার সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে সময়কে ঠিকমত কাজে লাগাতে না পারলে সাফল্য অনিশ্চিত! এ প্রসঙ্গে প্রবাদ আছে—

"Time and tide wait for none"

অর্থাৎ সময় এবং স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না।

যে সময় একবার অতিক্রান্ত হয়ে যায়; শত সাধনার দ্বারাও তাকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তাই সময়ের গতির সাথে তাল মিলিয়ে জীবনের গতিকে সাফল্যময় পথে পরিচালিত করতে হবে। আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনকে গৌরবময়, স্মরণীয়,

www.pathagar.com

বরণীয় ও সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে— শ্রম ও সময়। আর তাই পাশ্চাত্য দেশে সময়কে বলা হয়, "Time is all best of money" অর্থাৎ সময় হচ্ছে সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রখ্যাত মনীষী M. K. Ghande বলেন—

"Time is life, Life is time balance between life and time can help one reah the highest apex of Success."

মানব জীবনের আয়ু স্বল্প ও সীমাবদ্ধ। একটি ফুল যেমন সকালে প্রস্ফুটিত হয় আবার, সন্ধ্যায় নিশ্চিত ঝরে যায়। ফুল স্বল্পকালীন হলেও তার রূপযৌবন যেমন আকর্ষণীয়। মানুষের গতি-প্রকৃতিও তেমনি। কিন্তু মানুষ তার কর্মের মাধ্যমেই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যার কর্ম নেই, তার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই।

মানব জীবন অসংখ্য ঘটনা প্রবাহের সমষ্টি মাত্র; যেখানে ব্যর্থতা, প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা চির প্রবহমান। তাই যে যে পেশায় নিয়োজিত তার প্রতি আনুগত্য হতে হয়। দুঃখ-কষ্ট ভুলে একান্তভাবে কর্মে ব্রতী হতে হয়। আপন পেশার উন্নয়ন সাধনের জন্য।

যেমন পেশায় আপনি একজন ছাত্র। আপনার বশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। সেই দায়িত্বগুলো অবশ্যই আপনাকে পালন করতে হবে। আর দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন করতে গেলেই আপনাকে নিয়মানুবর্তিতার আশ্রয় নিতে হবে। আপনার চোখকে ফাঁকি দিয়ে একটি মুহূর্তও যেন অপচয় হতে না পারে; সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

মনে করতে হবে আমি একজন ছাত্র। আজকের ছাত্ররাই আগামী দিনের দায়িত্বশীল নাগরিক। ছাত্র জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মূল কথা হচ্ছে— জ্ঞানার্জন ও চরিত্র গঠন। মহাবিশ্বের যে কোন জাতির উন্নতির সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হল জ্ঞান; আর জ্ঞানার্জনের জন্য কঠোর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। শ্রমবিমুখ ছাত্র যতই তার মেধার বড়াই করুক না কেন? কোনো দিনই সে উন্নতি লাভ করতে পারে না।

উল্লেখ্য, সম্রাট নেপোলিয়ন একদিন সমুদ্রের তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন, এক ইংরেজ বালক, একটি ছোট নৌকা তৈরী করছে। তিনি অবাক হলেন। ছেলেটিকে তাঁর সামনে আনা হল।

নেপোলিয়ন বালককে উদ্দেশ্য করে বললেন, "বালক, এত ছোট নৌকা দিয়ে তুমি কি করবে?" বালক উত্তর করল, "সাগর পাড়ি দেব। সমুদ্রের ওপারে আমার দেশ। মাকে বড় ভালবাসী; তাঁকে বহুদিন ধরে দেখি না। আমাকে দেশে যাইতে দিন।"

নেপোলিয়ন দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ফরাসীর বিখ্যাত সম্রাট হয়েছিলেন। তাই বালকের চেষ্টা ও শ্রম তাঁর হৃদয়ে রেখাপাত করল। তিনি মুগ্ধ হয়ে বালককে দেশে পাঠাবার সুব্যবস্থা করলেন এবং

www.pathagar.com

সহচরদের জানালেন যে, পরিশ্রম ও চেষ্টা ছাড়া পৃথিবীতে কোনো কিছুই সম্ভব নয়। যেমন ছোট বালকটিই তার প্রমাণ। সে যদি এভাবে নৌকা বানাতে চেষ্টা না করত। তাহলে হয়ত আমার নজর তার ওপর অতখানি পড়ত না।

অবশেষে নেপোলিয়ন বালকের কাছে শিক্ষা পেলেন এবং নতুন রণ কৌশল আবিষ্কারের জন্য সৈন্যদের নিয়মিত মহড়ার ব্যবস্থা করলেন। এভাবে তিনি একদিন সফলও হয়েছিলেন যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে।

রবার্ট পিল প্রাথমিক জীবনে কিছুই জানতেন না। মঞ্চে উঠলে কথা বলতে শরীর কাঁপতো। কিন্তু অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি একদিন বিখ্যাত তর্কবিদ হয়েছিলেন।

অধ্যবসায়ের দ্বারা কলম্বাস আজকের উন্নত বিশ্বের শক্তিশালী দেশ আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। সুতরাং প্রত্যেক ছাত্রেরই উচিৎ তাদের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া। প্রতিজ্ঞা করুন—আমাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আমি একজন বিখ্যাত মনীষী হতে চাই? বিখ্যাত বিজ্ঞানী, বিখ্যাত ডাক্তার, বিখ্যাত গবেষক, বিখ্যাত কবি, বিখ্যাত ভাষাবিদ। এর কোনোটিই আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়। কারণ, আপনার সবচেয়ে বড় পরিচয় আপনি একজন মানুষ। আর মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। মানুষ সাধনা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজকেও হাতের মুঠোয় এনেছে।

শ্রমবিমুখ জীবন শিকড়বিহীন বৃক্ষের সমতুল্য। সামান্যতম তুফানে যেমন শিকড়বিহীন বৃক্ষটি উপড়ে পড়তে পারে; তেমনি শ্রমবিমুখ জীবন প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাধার সম্মুখীন হয়। জীবনের অস্তিত্ব হুমকীর মুখোমুখী এসে দাঁড়ায়। হতাশার সৃষ্টি করে প্রতিটি ক্ষেত্রে। এগুলোকে এড়িয়ে চলাই মানব ধর্ম। চেষ্টা চালিয়ে যান একদিন আপনিও অনেক বড় হতে পারবেন। পৃথিবীর কেউ একদিনে বড় হয়নি; অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শ্রম সাধনার বিনিময়ে ইউরোপ কান্ট্রিগুলো উন্নতির চরম শিখরে পৌছে গেছেন।

আপনার জীবন কিন্তু থেমে নেই, সুতরাং আপনিও থেমে থাকবেন না। অধ্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করুন।

জন্মগ্রহণ করে মানুষ শিশু থেকে একে একে বাল্যকালে উপস্থিত হয়, তারপর যৌবনকালে এবং শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধকালে পতিত হয়। এভাবে একদিন তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। আর মৃত্যু হলেই তার নাম পৃথবী থেকে মুছে যেতে থাকে। কেবল তাদের নামই সকল মানুষ হৃদয়ে কৌতূহলের বিস্ময় হয়ে চির অম্লান হয়ে থাকে। সবাই শ্রদ্ধা ভরে তাদেরই স্মরণ করে। যাঁরা সময়কে কাজে লাগিয়ে আপন কর্মের দ্বারা সাফল্যের পাহাড় রচনা করেছেন।

সফলতাই জীবন—৭

www.pathagar.com

যেমন— হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), সক্রেটিস, আইনস্টাইন, নিউটন, শেক্সপীয়ার, শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখগণ, সময়কে কাজে লাগিয়ে দিন-রাত জেগে-জেগে উপাসনা, গবেষণা ও লেখনীয় কাজ চালিয়েছেন। এভাবেই তাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

তাঁদের কাছে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। উঁচু-নিচুর কোনো ফারাক ছিল না। সকলকেই তাঁরা সমভাবে মূল্যায়ন করেছেন। অন্যায়ের কাছে, অসত্যের কাছে কোনোদিন তাঁরা মাথা নোয়াননি। আমাদের মাঝে এমন মানুষ আছেন যারা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও বৈষম্যের সৃষ্টি করেন। আবার আভিজাত্যের বড়াইয়ে অন্যসব মানুষগুলোকে গোলাম হিসেবে ব্যবহার করেন। কিন্তু তারা নিতান্তই মূর্খ। কোনো মনুষ্যত্ব জ্ঞান তাদের মাঝে নেই। কারণ, মানুষ একমাত্র তার সৃষ্টিকর্তার গোলাম বা দাস।

মানুষ মানুষের গোলাম নয়, বরং মানুষ-মানুষের সেবক এবং সাহায্যকারী। একে অন্যের সাথে আদান-প্রদানের মাধ্যমে সমাজের মঙ্গল ও উন্নয়ন সাধন পূর্বক স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে জীবনকে পরিচালিত করাই মানব ধর্ম।

www.pathagar.com

সৃষ্টিশীলতাই প্রতিভা

সৃষ্টিশীলতাই প্রতিভার উৎস, কথাটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা আলোচনা ও পর্যালোচনা সাপেক্ষ। মানুষ বলতে প্রতিভা নয়; কিন্তু প্রতিভা বলতে মানুষ। যেখানে প্রতিভার জন্ম সেখানে, মানুষ যেখানে মানুষ নেই প্রতিভা সেখানে অনুপস্থিত।

জগতে কোটি কোটি মানুষের জন্ম হলেও প্রতিভাবান লোকের সংখ্যা অতি নগণ্য। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিতে, প্রতিটি সাহিত্যে যুগে যুগে কালে কালে নিত্য নতুন প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছে।

পুরাতন অগ্রগতিকে অক্ষুণ্ন রেখে নব ধারার আগমনের মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্ম তাদের স্ব-স্ব নৈপুণ্যের দ্বারা নিজ নিজ সাহিত্যের বিকাশ ঘটিয়ে অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। নবীনদের আগমনের সাথে সাথে পুরাতন কর্মীরা অনুপ্রেরণাদানের পাশাপাশি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে তাদের আত্মাকে উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরিয়ে দিয়ে, সাহিত্য জগতে প্রবেশের পথ সুগম করে দেন। ওয়েস্টার্ন কানট্রিগুলোর এরূপ উন্মুক্ত মনোভাবের ফলে সৃষ্টিশীল কর্মের আবির্ভাবের সাথে নতুন প্রতিভার বিকাশ ঘটে। এভাবেই আপন জাতিতে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। একজন নতুন লেখক সহজেই উঠে আসতে পারেন সাহিত্যের কাতারে। এসব নানাবিধ কারণেই অন্যান্য জাতির সাহিত্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধির জোয়ারে ভরপুর। তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন; কারো কাছ থেকে কিছু পেতে হলে তাকে কিছু দিতে হয়। কিন্তু আমরা কাউকে কিছু দিতে নারাজ বরং কিছু পাওয়ার আশায় ওৎপেতে বসে থাকি। আর নিজেদের সুনাম ও ক্ষমতা বজায় রাখতে অন্যের প্রতিভাকে নষ্টের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হই। আমাদের মন এতই ছোট যে আমরা ধরে নেই নতুন কাউকে সুযোগ দিলে পুরাতন প্রতিভাবানদের চাহিদা কমে যাবে। অথচ এরূপ মনোভাব যে আমাদের জাতি ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে কতটুকু হুমকির কারণ হতে পারে তা, কেউ ভাবি না। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাহিত্য থেকে শুরু করে সর্বস্তরেই প্রতিষ্ঠিত মহলরা চান আজীবন প্রতিষ্ঠিত থাকতে। আর এ জন্যই তারা নতুন প্রজন্মের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ান।

www.pathagar.com

এখন প্রশ্ন হল আমাদের সাহিত্যে নবীনদের মূল্যায়ন কতটুকু। পুরাতন কর্মীরা কি আজীবন বেঁচে থাকবেন? মানুষ বলতে মরণশীল প্রাণী। তাহলে কী তাদের অমর সৃষ্টিকর্মগুলোই তাদেরকে অমরত্ব দান করবেন? কিন্তু এতেও তো আমাদের কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে না। আর পুরাতন কর্মীদেরই বা ক'জন অমর সৃষ্টির নৈপুণ্য তৈরী করেছেন। এসব কিছু বিবেচনা করলে আমাদেরকে নতুন প্রজন্মের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। আমাদের জাতি ও সাহিত্যকে গতিশীল রাখতে হলে নবীনদের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। আমরা পুরাতন কর্মীদের ভাল-মন্দ না দেখেই নামের পূজা করি, আর নবীনদের প্রতি উদাসীন আচরণ করে থাকি। শুধু তাই নয় বাজে মন্তব্য করে তাদেরকে নিরূৎসাহিত করে থাকি। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রা সত্যি সত্যিই একদিন দারুণ হুমকীর সম্মুখীন হবে। আমরা সবাই অর্থ উপার্জনের দিকে ঝুঁকে সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে কমার্শিয়াল হিসেবে ব্যবহার করছি। সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে প্রবন্ধ অথচ আমরা এখন উপন্যাসের দিকে দারুণভাবে ঝুঁকে পড়েছি ফলে প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠের মানসিকতা আমাদের পাঠক মহলের নেই। আর আমাদের প্রকাশনা সংস্থাগুলোরও প্রবন্ধ ও কবিতা গ্রন্থ প্রকাশের প্রতি অনীহা, কারণ পাঠক সমাজ আজ উপন্যাসের রোগে আক্রান্ত। আমাদের সাহিত্যে এখন অশ্লীলতার চর্চা হচ্ছে, আর কেন জানি যুব সমাজ সে দিকেই ঝুঁকে পড়ছেন। উপন্যাস আপনার বিনোদন বন্ধু মাত্র। সেখান থেকে শেখার মত তেমন কিছু নেই যদিও থাকে তা যৎ সামান্যই বটে। তার বাইরে উপন্যাস আপনার অবসর সময় কাটানোর সঙ্গী হয়ত।

প্রবন্ধ, আত্মোন্নয়নমূলক গ্রন্থ, গবেষণামূলক গ্রন্থ ও কবিতা পাঠকের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়। বিশ্ব সাহিত্য ও প্রত্যেকটি জাতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। কর্মস্পৃহা তৈরি করে। নতুন নতুন পথের সন্ধান দেয়। তাহলে প্রশ্ন হল প্রবন্ধ, কবিতা, ও এসব পাঠের প্রতি আমাদের এত অনাগ্রহ কেন? আমাদের দেশে বছরে শত শত উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও প্রবন্ধ ও কবিতা গ্রন্থ প্রকারের সংখ্যা অতি নগন্য। উপন্যাস সাহিত্যের একটি দিক মাত্র। আমাদের সকল দিকেই বিচরণ করতে হবে। অথচ প্রবন্ধ ও কবিতাই সাহিত্যের প্রাণ। এসব গ্রন্থ পড়ার মত বাজে সময় আমাদের পাঠক মহলের নেই। স্বাভাবিক কারণেই প্রমথ চৌধুরীর বই পড়া ও সৈয়দ মুজতবা আলীর বই কেনার কথা বলতে হয়।

বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয়নি আর বই পড়ে কেউ বঞ্চিত হয়নি। বরং জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি হয়েছে। সিনেমা হলের টিকেট পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার। কাউন্টারের কাছে যেতে কতজনকে ধাক্কা মেরে সরাতে হয় আর টিকেট করতে কতজনের বারোটা বেজে যায়। তা ভুক্তভুগিরাই ভাল জানেন।

www.pathagar.com

আবার, রাত জেগে জেগে উপন্যাস ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের গল্প শুনতে এতটুকুও বিরক্ত বোধ হয় না। প্রবন্ধ ও কবিতার কোনো বই হাতে নিলে নির্ঘাত ঘুম এসে যায়। আসলে আমাদের মানসিকতাটাই আমরা এভাবে তৈরী করেছি। এ মনোভাবের পরিবর্তন করতে দৃঢ় মনোবলই যথেষ্ট।

আমাদের প্রাবন্ধিক ও কবিগণ যাদের কবিতা রচনা ও প্রবন্ধ তৈরীর দক্ষতা আছে, তাদের অনেকেই এসব বর্জন করে কমার্শিয়াল উপন্যাস তৈরীর প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। এজন্য পাঠক মহল যতটা দায়ী প্রকাশক মহলও কোনো অংশে কম না। কারণ, কোনো প্রকাশক প্রবন্ধ ও কবিতা গ্রন্থ প্রকাশে অগ্রহী নন। আর তার মধ্যে যদি হন কোনো নতুন লেখক তাহলে সে উপেক্ষার পাত্রও বটে। এবার সকল মহলের কাছে প্রশ্নঃ তবে সাহিত্য সৃষ্টি করবেন কারা? নবীনদের আগমন না ঘটলে আগামী দিনের সাহিত্যের ভার কাদের হাতে থাকবে। নবীনদের আগমন না ঘটলে আগামী দিনে সাহিত্যের অগ্রগতি হুমকীর মুখে। এ প্রসঙ্গে আমার একটা দারুণ অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য চর্চা করছেন। এমন একজন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তার বহু লেখা বিভিন্ন জাতীয় ও দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি প্রতিষ্ঠিত লেখক না হলেও যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নন। একদিন তার সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে নতুনদের কথা উত্থাপিত হল। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, বাংলাদেশ বেতারে ২৪টি গান লিখে পাঠালে নাকি গীতিকার হওয়া যায়। পরপর দু'তিন বার তিনি ২৪টি করে গান বেতার অফিসের ঠিকানায় পাঠিয়েছিলেন গীতিকার হওয়ার আশায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ প্রতি উত্তরে জবাব দিয়েছিলেন, আপনার গান সুন্দর হলেও প্রচার উপযোগী নয়, পুনরায় চেষ্টা করুন। এক পর্যায়ে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত অপ্রচলিত ২৪টি গান যা অনেকের আগোচরে লিখে পাঠিয়ে ছিলেন বেতার অফিসে; কিন্তু বিচারক মহল সেগুলোও প্রচার উপযোগী হয়নি বলে পত্র দ্বারা জানিয়ে ছিলেন। এখন আমার প্রশ্ন হল একজন বিশ্ব কবির লেখাও নতুন লেখকের মনে করে কি করে বাদ পড়ল। এতে স্পষ্ট ভাষায় প্রতীয়মান হয় না যে আমরা নামের উপর পূজো করি; একজন ভাল প্রতিষ্ঠিত লেখক যদি খারাপ কিছু উপহার দেন তবে সেটাই আমাদের বিবেচনায় পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। আর একজন নবীন ভাল কিছু উপহার দিলেও সেটা পুরস্কার তো দূরের কথা আমরা গ্রহণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করি।

যদি তাই না হত তাহলে বিশ্ব কবির লেখাকে নতুন লেখকের মনে করে বাদ দেয়া হত না। সেটা ভালভাবে বিবেচনা করে বিচারক হমল গ্রহণ করতেন।

www.pathagar.com

আমার মনে হয় গানগুলো না দেখেই মন্তব্য করেছিলেন।

যারা আজকের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তারাও তো একদিন নবীন ছিলেন। তবে কেন এ বৈষম্যতা। আমি পাঠককেই বেশী দায়ী করছি। কারণ পাঠক মহল নবীনদের থেকে অনেক দূরে। অনেকে নবীনদের কিছু না পড়েই মন্তব্য করে থাকেন। ওদের হাত অনেক কাঁচা; ওরা আবার কি লিখবে এসব মন্তব্য না করে আমরা কি তাদের উৎসাহ দিতে পারি না? আমরাই পারি নতুন কবি ও সাহিত্যিকগণকে আগামী দিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিভাবান হিসেবে তৈরী করতে। আমাদেরকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে, কারা জাতিকে আশার বাণী শোনাতে পারবেন। কাদের লেখায় নতুন সৃষ্টির নৈপুণ্য ও স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের ছাপ পরিলক্ষিত। সৃষ্টিশীলতাই যদি প্রতিভা হয় তাহল নবীনরাই হবে তার উত্তরাধিকারী। আর তাদের হাতেই ন্যস্ত থাকবে আগামী দিনের প্রগতিশীল সাহিত্য। বঞ্চিত ও বাধাগ্রস্ত নবীনরাই হবে বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর। নির্মল সলিল শুধাময় সবল সাহিত্যের জন্মদাতা।

প্রবীণদের নিয়ে যদি আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধির পথে এগুতে থাকত তাহলে কেন নজরুলের পর আজও কোনো নজরুলের জন্ম হয়নি। রবীন্দ্রের পর আজও কোনো রবীন্দ্রের আগমন ঘটেনি। অন্যান্য সাহিত্য বহুবার নোবেলের মুখ দেখেছে; কিন্তু আমাদের এত নাম করা সাহিত্যিক মহল থাকতেও কেন বিশ্ব সাহিত্যে তাদের স্থান হচ্ছে না। নবীনদের মাঝেই কি লুকিয়ে থাকতে পারে না। আগামী দিনের নোবেল বিজয়ী কোনো বাঙ্গালী? তাহলে আমরা তাদের উপেক্ষার পাত্র ভাবি কেন? মায়ের পেট থেকে কি কেউ প্রতিভাধর হয়ে আসে। কাঁচা হাত পাকা হবে লেখার মাধ্যমে, সৃষ্টির নেশায় মগ্নতার প্রভাবই একদিন সৃষ্টিশীলতার জন্ম দেবে; সেটাই হবে প্রতিভার উৎস।

www.pathagar.com

আলোকিত জীবনের সন্ধান করুন

আপনার জীবনের নির্মাতা কে? ব্যক্তিগতভাবে একান্তই ভাবুন তো।

আমি জীবনকে কি দিয়েছি?

জীবন আমাকে কি দিয়েছে?

আমি জীবনকে কি কি দিয়ে পারতাম?

আমার ভুলের কারণে জীবন আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? আমার অবহেলার কারণে ব্যক্তি জীবন কতটুকু হুমকীর সম্মুখীন?

এতগুলো প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আপনি নিজেই। শেষ প্রশ্নটি হচ্ছে; কে আপনাকে গড়বেন?

আপনার পিতা-মাতা, আপনার শিক্ষকমণ্ডলী অথবা পিতা-মাতার অবর্তমানে আপনার অবিভাবক শ্রেণী। প্রশ্নটা যতটা সহজ, কিন্তু উত্তরটি ততটা সহজ নয়; বেশ ভাবনার বিষয়।

আচ্ছা, অনেক পিতা-মাতাইতো আছেন; যাঁরা সব সময় সন্তানের ব্যাপারে সতর্ক থাকেন। সন্তানকে গড়ে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। শিক্ষকমণ্ডলীদের কাছে সোপর্দ করেন। কিন্তু এত পন্থা অবলম্বন করেও সন্তানদের গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন; কারণ, যাকে আমি গড়ে তুলব; তার নিজেকেই নিজে গড়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

পিতা-মাতা, শিক্ষকমণ্ডলীগণ যতই চেষ্টা করুক না কেন— তারাতো তার সাহায্যকারী, অর্থাৎ একজন গাইডার মাত্র।

আপনি কি আপনার সন্তানকে অথবা শিক্ষকমণ্ডলীগণ কি আপনার সন্তানকে মুখস্থ করিয়ে দিতে পারবেন?

মনোযোগ সৃষ্টি করাতে পারবেন? মেধাবী করে তুলতে পারবেন? না, কিছুতেই পারবেন না। যদি আপনার সন্তান চেষ্টা না করেন।

যদি শিক্ষকমণ্ডলী অথবা আপনিই মুখস্থ করিয়ে দিতে পারতেন; তাহলে দেশে আর কোনো খারাপ ছাত্র থাকত না। এত নকলের প্রবর্ণতাও দেখা দিত না।

www.pathagar.com

উদাহরণটা না দিলেই নয়।

এক ক্লাশে অনেক ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করেন। শিক্ষকমণ্ডলীগণ প্রতিটি ক্লাশে সকলের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদন করে থাকেন। তবুও কেউ হন ভাল আবার কেউ হন খারাপ।

শিক্ষকমণ্ডলীগণ তাদের আরোপিত বিষয়টি যথাসাধ্য বুঝাতে চেষ্টা করেন; এবং কোনো ছাত্রকে ভাল করে তোলা নিজের গৌরবের বিষয় বলে মনে করেন; কিন্তু তার পরও ক্লাশের দুই-তৃতীয়াংশ ছাত্র অমনোযোগী, দুর্বল থেকে যান।

এখানে শিক্ষকদের যেমন চেষ্টার ত্রুটি নেই; অন্যদিকে পিতা-মাতারও ক্লাশে পাঠাতে কোনো গাফিলতি নেই। আর বাড়ীতে তো গৃহশিক্ষক অথবা অবিভাবকের কড়া নজর আছেই।

তাহলে দোষটি কার? কে আপনাকে গড়বেন? আপনি পেশায় একজন ছাত্র। যদি বলি আপনাকে কেউ গড়ে তুলতে পারবেন না; স্বয়ং স্রষ্টাও আপনাকে গড়বেন না। কারণ, তিনি আপনাকে পৃথিবীতে পাঠানোর আগেই বলে দিয়েছেন; "যে তার নিজেকে সাহায্য করে, স্বয়ং আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন।"

আপনি ক্লাশ করে এসে দিব্বি পথে-ঘাটে ঘুরে খেলাধুলা করে, গল্প-গুজব করে ও বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে বাকী দিনটি কাটিয়ে দিলেন। আবার রাতে টেলিভিশনের পর্দার সামনে বসে অর্ধেক রাত কাটিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকাল ন'টায় ঘুম থেকে উঠে ক্লাশে গেলেন।

এবার প্রশ্ন, তাহলে আপনি লেখাপড়া করলেন কোন্ সময়? একজন ছাত্র হিসেবে আপনার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যই হল লেখাপড়া করা। আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো আগে পালন করুন। আপনার বিনোদনেরও প্রয়োজন আছে কিন্তু তাই বলে আপনি কি তা করেন? নাকি ক্লাশে যাওয়াটাই আপনার প্রতি জুলুম করা হয়? কি যে দায়ে পড়েছেন; পিতা-মাতার ভয়ে রোজ রোজ স্কুলে যাওয়া আর ভাল লাগে না। তাই শিক্ষক যখন ক্লাশে যান, তার আগেই আপনি ক্লাশ ত্যাগ করে মার্কেটে গিয়ে আড্ডা মারেন। যদি বুঝতেন, এ আড্ডাতো আড্ডা নয়, নিজের সাথে নিজেই প্রতারণা করছেন, তাহলে কোনোদিন এভাবে ফাঁকি দিতেন না। অবশ্য একদিন হাড়ে পাড়ে টের পাবেন। আসলে কথাটি কতটুকু সত্যি।

অনেকেই কিন্তু অনুশোচনায় ভরে গেছেন। কারণ, তারাই কিন্তু...

আপনি আপনার ভুল বুঝতে পেরেছেন; আপনার সময় কিন্তু এখনও ফুরিয়ে যায়নি? ইচ্ছে করলে আবার নতুন করে জীবন গড়ার সাধনায় ব্রতী হতে পারেন। এবার আপনার সাফল্য আসবেই। কথায় আছে; ন্যাড়া দু'বার বেলতলায় যায় না। আবার, 'এক গর্তে কেউ দ্বিতীয়বার পা রাখে না।'

www.pathagar.com

এখন আপনি সতর্ক। কোথায় আপনার ভুল হয়েছে? সে স্থানগুলো অবশ্যই চিহ্নিত আছে।

আবার আপনি কিছুই পালন করলেন না। আপনি যদি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোর প্রতি নজর দিতেন, সেগুলো মেনে চলতেন; তাহলে আপনার বিবেককে কি জবাব দিতেন; পারিব না কথাটি হয়ত ভুলে যেতেন।

আপনি নিজেই পারেন নিজেকে গড়তে। কেউ সারাদিন বকবক করেও আপনাকে বুঝাতে পারবেন না; যদি আপনি নিজে বুঝার চেষ্টা না করেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের উত্তরসুরি অ্যান্ড্রু জনসন, কোনোদিন স্কুলে যান নি তিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন না। এজন্য তাঁকে বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। তার স্ত্রী লেখাপড়া জানতেন। একদিন অ্যান্ড্রু জনসন বেশ সমস্যায় পড়লেন; আর তখনই প্রতিজ্ঞা করলেন যেভাবেই হোক আমাকে লেখাপড়া জানতেই হবে। অতঃপর তিনি তার স্ত্রীর কাছে লেখাপড়া শিখলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যের জাটিলের স্কুল ছাত্র, রিচার্ড ম্যাক মাস্টার রোজ ১২০ মাইল পথ বাসে যাতায়াত করে স্কুলে যেতেন। স্কুল জীবনে ৮ বছর যাতায়াতে সর্বমোট যে পথ সে অতিক্রম করেছিল; তা পৃথিবীর চারদিক ৭ বার ঘুরে আসার মত।

লেখাপড়ার জন্য আপনি কতটুকু কষ্ট করেছেন? বাসায় আপনার প্রাইভেট টিউটর আছে। তিনি আপনাকে পড়াবার পর চলে গেলেন। আপনি আর পড়তে বসলেন না। টিউটরের দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন; কিন্তু আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করলেন না। আপনার দায়িত্ব হল, টিউটর চলে যাওয়ার পর যে বিষয়টি পড়ালেন; তা বার বার অনুশীলন করা। যে জিনিসটি আপনি বুঝতেছেন না তার নিচে চিহ্ন দিয়ে রাখুন। আগামীকাল টিউটর এলে আগে সেটি বুঝে নিন। লজ্জাবোধ করবেন না। তাহলে শিখতে পারবেন না।

আবার আগামী দিন টিউটর আপনাকে কি পড়াবেন জেনে নিন, সময় পেলে আজকেই একটু পড়ুন; তাহলে বুঝতে সুবিধে হয়।

আর যদি ভবচণ্ডি হয়ে ঘুরে বেড়ান; লেখাপড়া ভাল না লাগে; তাহলে ছাত্র নাম বাদ দিয়ে কৃষকের বেশ ধারণ করুন। ভুলে যাবেন না, তাতেও কিন্তু বেশ কষ্ট। পরিশ্রম ছাড়া কৃষকও কিন্তু জমিতে ফসল ফলাতে পারেন না। যে কোনো পেশাই বেছে নিন না কেন, পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই নেই।

লেখাপড়ার নামে মিথ্যে বেশ ধারণ করে পিতা-মাতা ও আপনার শিক্ষকমণ্ডলীকে ধোকা দিবেন না। এ ধোকা কিন্তু আপনিই খাচ্ছেন একথা এখন পুরোপুরি না বুঝলে করার কিছুই নেই। তবে একদিন আফসোস করতেই হবে। তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

কথাগুলো শুনতে বোধহয় বিরক্তির ভাব হচ্ছে। কারণ, এখানে তো আর বিনোদনের কিছু নেই। বিনোদন খুব ভাল লাগে তাই না?

কাজের কথা শুনলেই হয়েছে...

এতক্ষণ হয়ত বুঝতে পেরেছেন? আপনার নির্মাতা কে? কে আপনাকে গড়বেন? আপনি নিজেই আপনার নির্মাতা। আপনিই আপনাকে গড়বেন। এ জগতে কিন্তু কেউ কাউকে গড়তে পারেননি; তবে সাহায্যকারী হিসেবে সাহায্য করেছেন মাত্র। যারা বড় হয়েছে; সাফল্যের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছেন একান্তই তাদের নিজেদের চেষ্টায়।

আত্ম-বিশ্লেষণ করুন

স্রষ্টার সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি মানুষ। মানুষ শব্দটির বহুবিধ অর্থ রয়েছে। অ-গণিত স্বত্ত্বার এক সামগ্রিক রূপের বাহ্যিক আকৃতির নামই—মানুষ। এ অ-গণিত স্বত্ত্বার জন্যেই মানুষকে আত্ম-বিশ্লেষণ করতে হয়। ভাবতে হয়। সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নানা রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

যদি আপনাকে এভাবে প্রশ্ন করি।— মানুষ কাকে বলে?

তাহলে কি উত্তর দিবেন?

আমি কিন্তু আপনার উত্তরটিকে সরাসরি বাদ দেব না; বরং যে দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটি করেছি তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখব আপনার উত্তরটি যথাযথ কিনা?

আচ্ছা, আপনার উত্তরটি যাই হোক— আমি কিন্তু ব্যতিক্রমধর্মী উত্তর দিচ্ছি; কাজের প্রতি গভীর মনঃসংযোগ, সময়ের মূল্যায়নবোধ ইত্যাদি কর্মগুলোর প্রতি আপনার কতটুকু দায়িত্ববোধ আছে।

তাহলে বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি যথাযথভাবে তুলে ধরছি।

আপনি একজন অফিস কেরানী। আপনার বস-এর সাথে আপনার বেশ খাতির; তাই, আপনার অফিসিয়াল কাজগুলো মন্থরগতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। এমনকি আজকের কাজগুলো আগামীকাল করতেও আপনার বিবেকে বাধছে না। কারণ, বস-এর আহ্লাদ পেয়ে পেয়ে আপনি কাজের প্রতি অবহেলিত হয়ে উঠেছেন। আর, আপনার বসও মাঝে মাঝে আপনাকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন।

আবার অন্যদিকে লক্ষ্য করুন; আরেক অফিস কেরানী। তার বস অতি রাগী মানুষ। অফিসিয়াল খাতা-পত্রে সামান্য একটু ভুল হলেই সিরিয়াসলি বকাবকি করেন। কি চাকরী করতে এসেছেন? আপনি কি চাকুরী করতে পারবেন? আমার তো মনে হয় না যে কাজের প্রতি আপনার মনোযোগ আছে। পেয়েছেনটা কি? ভুলে

www.pathagar.com

যাবেন না যে এটা একটা অফিস। যেভাবে কাজ করছেন তাতে করে আপনাকে দিয়ে অফিস চালানো যাবে না। যান, মনোযোগ দিয়ে কাজ করুন। এরপরও যদি ভুল করেন, তাহলে....।

আবার অফিসিয়াল কাজ ভাল করলে তিনি খুব আদরও করে থাকেন।

এবার লক্ষ্য করুন; প্রথম কেরানী তার বস-এর আহ্লাদে কাজকে মোটেই ভয় পাচ্ছেন না। আর কর্মকে ভয় না পাওয়ার কারণেই দিন দিন অফিস অবনতির দিকে যাচ্ছে।

এবার দ্বিতীয় কেরানীর দিকে তাকালে বুঝতে পারবেন। বস-এর কড়াকড়ি মনোভাব কাজের প্রতি সিরিয়াস ভীতি আনয়ন করেছে; অর্থাৎ তিনি তার অফিসিয়াল কাজকে ভয় পাচ্ছেন; বসকে নয়। কারণ, বস কাজের জন্যই কেরানীকে বকছেন। বিষয়টি ভাববার ও বুঝবার ব্যাপার।

আবার কর্মের দু'টি দিক; সৎ কর্ম এবং অসৎ কর্ম। আপনি ভয় পাচ্ছেন; অন্যায় করলে, মিথ্যে বললে, খারাপ কাজ করলে সমাজ আমাকে ধিক্কার দেবে, আমার মান ইজ্জত থাকবে না; টাকা-পয়সা ধন-দৌলত একবার হারালে অর্জন করা যায়, কিন্তু মান ইজ্জত হারালে কখনও তা ফেরত পাওয়া যায় না। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চাক্ষুষ এবং মুখ পরম্পরায় চর্চিত; মান ইজ্জত হস্তগত নয়, একে বিক্রি করা যায় না, আবার ক্রয়ও করা যায় না। এটা বিনিময়ের অযোগ্য। কিন্তু টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত কেনা-বেচার যোগ্য। বিনিময়ের যোগ্য, অতি সহজেই তা হস্তগত হয়। এ জন্যই বলা হয় জ্ঞানীর অপমান বজ্রাঘাত তুল্য।

মানুষ সবাই, আবার মানুষ কেহই নয়; রক্ত মাংস ও হুবহু গঠন প্রণালী হলেই মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ হতে হলে মনুষ্যত্বের প্রয়োজন।

হয়ত প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যাদের মনুষ্যত্ববোধ নেই, তারা কি মানুষ নয়? তাদের তো অন্যান্য মানুষের মতই, দু'টি হাত দু'টি পা শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই মানুষের। মানুষের পেটেই তাদের জন্ম।

তবে হ্যাঁ, আপনার যেমন প্রশ্ন আছে; তেমনি তার যথাযথ উত্তরও আছে। অমানুষ কথাটি অবশ্য শুনেছেন? তাহলে কি উত্তর হচ্ছে; জানোয়ার, অর্থাৎ পশু; একে বলা হয় নরপশু, যার অর্থ মানুষরূপী পশু।

এবার যদি মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে কাউকে প্রশ্ন করেন। আপনি সবচেয়ে কোন্ জিনিসকে ভয় পান? তাহলে তিনি সহজেই উত্তর দিবেন যে মান ইজ্জতকে।

আপনার মান ইজ্জত মনুষ্যত্ববোধেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। মনুষ্যত্ববোধের মাঝে বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞানসহ মানবীয় সব কিছুই বিদ্যমান। একজন মানুষকে আত্মশুদ্ধি তথা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশের মাধ্যমই হল মনুষ্যত্ববোধ।

www.pathagar.com

মান ইজ্জতের প্রতি আপনার শ্রদ্ধাবোধ থাকলে; ভীতি থাকলে, আপনার দ্বারা কোনো রকম অশুভ কাজ সম্পন্ন হবে না। লক্ষ্য করুন; পাশাপাশি দুই বন্ধু, প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে বলছে দোস্ত, চল আজ পেঁপে চুরি করব। আমাদের ক্লাশের শামীমদের বাগানের ছোট্ট একটি গাছে পেঁপে পেকেছে।

দ্বিতীয় বন্ধু;—নারে, আমি ওকাজ পারব না। যদি ধরা পড়ে নাই; তাহলে মান সম্মান ধূলোয়...।

মান ইজ্জতের কথাশুনে প্রথম বন্ধুর মনে সত্যিই ভয় জাগল। সে মনে মনে ভাবল; না তাহলে আর একাজ করা যাবে না।

কিন্তু যার মান ইজ্জতের ভয় নেই, তার দ্বারা সমাজে যে কোনো অশুভ কাজ সম্পাদন হতে পারে।

বিষয়টি অতি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মান ইজ্জতবোধ অসৎ কর্ম থেকে মানুষকে দূরে রাখে এবং সৎকর্মের প্রতি তৎপর করে তোলে। আর যার মনুষ্যত্ব নেই তার মান ইজ্জতও নেই; যার মান ইজ্জত নেই তার আবার ভালই কি? মন্দই কি?

প্রতিভা বিকাশের অনুশীলন

প্রতিভার সাথে বুদ্ধির বেশ সম্পর্ক আছে; তা অস্বীকার যোগ্য নয়। কিন্তু প্রতিভাকে অযত্নে ফেলে রাখলে সে বুদ্ধি এবং প্রতিভা দু'টোই দিন দিন ম্লান হতে থাকে, এটা চিরসত্য। আবার; প্রতিভাবান মানুষের বুদ্ধি সাধারণের চেয়ে কিছু বেশী হলেও কারো বুদ্ধি তুখোড় হলেই যে সে প্রতিভাবান হবে এটি সঠিক না।

আসলে বুদ্ধি ছাড়াও প্রতিভাবান মানুষের মননশীলতায় আরো কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন—তারা স্বাধীনচেতা; চিন্তা-ভাবনা এবং কাজ-কর্মে পরনির্ভরশীলতা মোটেই পছন্দ করেন না। 'সেন্স অব হিউমার', অর্থাৎ কৌতুকবোধ তাঁদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিত্য-নতুন অভিনব সব জিনিসের প্রতি তারা সহজেই আকৃষ্ট হন যে কাজটি যত কঠিন, সে কাজটি তাদের তত পছন্দনীয়।

প্রতিভার কথা উচ্চারণ করলেই বুদ্ধির কথাটি মনে পড়ে। কারণ, প্রতিভা এবং বুদ্ধি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যেখানে প্রতিভা আছে, সেখানেই বুদ্ধি; যেখানে বুদ্ধির দীপ্ততা সেখানেই প্রতিভা; কিন্তু যেখানে এসব নেই; সেখানে কিছুই নেই।

এখন হয়ত বুদ্ধি কি এ নিয়ে আপনার মনে নানা প্রশ্ন জাগতে পারে। অবশ্য বুদ্ধি নিয়ে নানা মুনিরদের নানা মতও প্রচলিত আছে। দেহের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখায় বুদ্ধির অবস্থান নয় বলে বুদ্ধির সঠিক সংজ্ঞা এখনও কেউ নিরূপণ করতে পারেননি। তবে মানুষের মস্তিষ্কের দু'টি অংশই বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে একটি হল' ফ্রন্টার লোব এবং দ্বিতীয় হল— টেম্পোরাল লোব।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানী ওয়েশলারের মতে বুদ্ধি হল মানুষের এমন এক মানসিক অবস্থা, যেখানে সে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে দক্ষভাবে মানিয়ে নিতে, বাস্তব চিন্তা করতে এবং পরিবেশ অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারে। তার এ বর্ণনা মতে বুদ্ধির বিকাশ পুরোপুরি পরিবেশের উপর নির্ভরশীল।

আপনি নিজেকে নিয়ে ভাবুন। আপনি তো একদিন ছোট্ট শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন; তারপর ক্রমে ক্রমে বড় হয়েছেন। এবার কথাটি লক্ষ্য করুন, সাধারণত প্রতিটি সুস্থ্য স্বাভাবিক শিশুই সমান বুদ্ধি ও প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার চারপাশের পরিবেশ তাকে স্মার্ট, বুদ্ধিমান, প্রতিভাধর ও বোকা করে তোলে। আবার, আপনি ইচ্ছে করলেই, স্মার্ট, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান হতে পারেন। এ কারণেই বিজ্ঞানী নিউটন বলেছিলেন; প্রতিভা বলতে কিছুই নেই, সময়ের সদ্ব্যবহার ও কঠোর অধ্যবসায় প্রতিভার জন্ম দেয়। প্রতিটি মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যে সংগ্রামে লিপ্ত হয়; এটা তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। কিন্তু যে নিতান্তই অপদার্থের মত অলসতা ও অকর্মন্যতায় জীবন নির্বাহের স্বপ্ন দেখেন তার বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই।

সুতরাং জগতের যে কোনো কঠিন কর্মই আপনার সাধনা ও পরিশ্রমের কাছে পরাজিত। আপনার প্রতিভা থাকলেই কিন্তু আপনি প্রতিভাবান হতে পারবেন না। প্রতিভাবান হতে হলে তার বিকাশ ঘটাতে হবে। আর এ বিকাশের মাধ্যম হল কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়।

পড়া মনে রাখার সহজ কৌশল

আপনি স্কুল, কলেজ মাদ্রাসা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। আপনার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে। তাদের অনেকেই বলে থাকেন; যা মুখস্থ করেন তা মনে থাকে না; অর্থাৎ ভুলে যান। আসলে কিছু ভুলে যাওয়া ও মনে রাখা মানুষের জীবনের নিত্য-নৈমত্তিক ঘটনা।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে; "To err is human" অর্থাৎ মানুষ মাত্রই ভুল। কোনো মানুষই ভুল করতে চান না; কিন্তু তবুও ভুল হয়ে যায়। আর ছাত্র জীবনেই দেখা দেয় নানা সমস্যা। এ সমস্যাগুলোকে সমাধানের মাধ্যমে এগিয়ে চলাই ছাত্রদের ধর্ম। মনের খেয়ালেই অনেকে ভুল করেন। কেউ বা বন্ধু-বান্ধবের কবলে পড়ে ভাল মন্দ যাচাইয়ে ভূমিকা রাখেন না তাতেও মস্তবড় ভুল হয়ে যায়।

এভাবে বিভিন্ন কারণে ছাত্রজীবন হুমকীর সম্মুখীন হয়। এজন্য ছাত্রকে নানাবিধ গুণে গুণান্বিত হতে হয়। তবে প্রশ্ন হল কীভাবে পড়া মনে রাখা যায়? দেখা গেছে, আমাদের দেশের যে ছাত্র-ছাত্রীটি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করেন; সে বেশ কিছু বিষয় মনে রাখেন। যা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না; কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলেই একজন ভাল ছাত্র হতে পারেন? অনেক বিষয় মনে রাখতে পারেন।

www.pathagar.com

বিশেষ করে এস. এস. সি. ও এইচ. এস. সি পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য মনে রাখার গুরুত্ব অনেক বেশী। শুধু এস. এস. সি. নয়; বরং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও আপনি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে অনেক থিউরিক্যাল বিষয় মনে রাখতে পারেন।

হয়ত আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, পড়া মনে রাখার সহজ কৌশল কি?

আসলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত বিশ্বের তুলনায় কিছুটা ব্যতিক্রম। এদেশে ভাল রেজাল্টের জন্য মুখস্থ বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

একথা না বললেই নয় যে অনেক শিক্ষকমণ্ডলী হুবহু বই দেখে ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা কাটেন। এতে নকল করে পরীক্ষা দেওয়া ছাত্রেরই সুবিধে হয়; কারণ, সেও হুবহু বই দেখে পরীক্ষা দিয়েছে। শুধু মুখস্থ বিদ্যার জোরে মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লেখার অর্থই জ্ঞান অর্জন নয়। তা মূলতঃ সার্টিফিকেট অর্জন। কথায় আছে;
"Certificate is nothing but knowledge is power"

খালি তোতা পাখির মত মুখস্থ করলেই চলবে না। তার মর্ম অনুধাবন করতে হবে। যথাযথভাবে বুঝতে হবে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপমার দ্বারা আয়ত্ত্ব করতে হবে। তবেই ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। আর আমাদের সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হল। আমাদের শিক্ষানীতিতে বেশ কিছু অনিয়ম বিরাজমান।

যেহেতু আমাদের দেশে মুখস্থ বিদ্যার প্রয়োজন অনস্বীকার্য; সেহেতু নিম্নে কিছু কৌশল উল্লেখ করা হল— যে বিষয়টি মুখস্থ করবেন তার মূলভাব বের করুন। মনে করুন আপনি একটি কবিতা, একটি গল্প, একটি নাটক এগুলোর প্রশ্ন মুখস্থ করবেন, তাহলে আপনার করণীয় হচ্ছে—ওগুলো বার বার পড়ে মূলভাব জেনে নিন; তবেই তাড়াতাড়ি করে মুখস্থ করতে যে কোনো প্রশ্নই আপনার পক্ষে সহজ হবে এবং পড়াও মনে থাকবে। বিশেষ করে মনে মনে পড়ার চাইতে একটু শব্দ করে পড়া, মনোযোগ দিয়ে পড়া এবং পঠিত বিষয়টি বার বার অনুশীলন করলে তা সহজেই মনে থাকে। তবে মনে রাখার কৌশলগুলোর মধ্যেও কিছুটা চাতুর্যতা আছে। যেমন—শিক্ষণীয় বিষয়ের সাথে আনুষঙ্গিক বিষয়ের সামঞ্জস্যতা স্থাপন করা। হয়ত বিষয়টি এখনও আপনার বোধগম্য হয়নি?

তাহলে লক্ষ্য করুন; বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা মনে করলেই পাক হানাদার বাহিনীর কথা মনে পড়ে। আবার বঙ্গবন্ধুর কথাও মনে পড়ে যায়।

বার বার আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি অনুশীলন করা।

বেশী বেশী পড়াশুনার মাধ্যমে গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর মূলভাব পৃথক পৃথক আলোচনা করা। ব্যাকরণ অথবা ম্যাথমেটিকের টার্মের বিষয়বস্তুর

www.pathagar.com

সূত্রসমূহ কাজে লাগিয়ে নিখুঁত ভাবে বার বার চর্চা করলে সহজেই মনে থাকে। বিষয়বস্তুর মর্ম অনুধাবন পূর্বক মনোযোগ সহকারে মুখস্থ করার চেষ্টা করা এবং মুখস্থ বিষয়টি বার বার অথবা রুটিন মাফিক নিয়মিত চর্চা করা। অধ্যবসায়ের গভীর আগ্রহের সাথে মনোনিবেশ এবং জিদ্দি মনোভাব থাকা; যে অবশ্যই আমাকে মুখস্থ করতে হবে।

বার বার শব্দ করে পড়ার মাধ্যমে মুখের জড়তা কেটে ফেলা এবং উচ্চারণের সঠিক বাচনভঙ্গির দিকে নজর দেয়া।

কোনো বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানা গেলে বেশী বেশী মনে থাকে এবং আংশিক জানলে বেশীদিন মনে থাকে না; তাই পুরোপুরিভাবে জানার চেষ্ট করা।

যে বিষয় আপনার মনে রেখাপাত করবে তা সহজেই মনে থাকবে।

অর্থপূর্ণ ভাবে খেয়াল করা, যুক্তিসংগত ও সুশৃঙ্খল শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে মুখস্থ করা সহজ এবং তা সুন্দরভাবে পঠনের দ্বারা সহজেই মনে থাকে।

সর্বশেষ কথাটি হল, আপনার ইচ্ছাশক্তিই আপনার মাঝে গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

আত্মবিশ্বাসের সাথে কর্মে কঠোর উদ্যমী হতে হবে। তাহলে কঠিন বিষয়টিও আপনার কাছে সহজ বলে মনে হবে। আর তখনই মুখস্থ করার স্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। ও মুখস্থ সহজে ভুলবেন না।

উপরোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করে আপনি অতি সহজেই আপনার পড়া মুখস্থ করতে পারেন মা সহজেই ভুলবেন না।

www.pathagar.com

সময় ও জীবনের কথা

জীবন গতিশীল। সময়ের সাথে তার পাল্লা, সময় ও জীবন দু'জনেই বন্ধুত্ব রক্ষা করে অন্তকালের দিকে যাত্রা করেছে। অত্যন্ত নির্মম ও নির্দয়তাই এর বৈশিষ্ট্য। টিক, টিক, টিক ঘড়ির কাটার সাথে তাল মিলিয়ে সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, মাস, বছর, যুগ ও শতাব্দী তার আপন গতিতে ছুটে চলেছে। এ চলার কোনো আদি অন্ত নেই।

বলতে পারবেন, কবে, কীভাবে এ চলার শুরু হয়েছিল?

জানি এ প্রশ্নের উত্তর আপনি কেন, জগতের কেউ-ই দিতে পারেন না। আর কবে যে এর শেষ হবে তাও কেহই জানেন না। এবার হয়ত আপনাকে দারুণ অসহায় মনে হবে। কারণ, জগতের সবকিছু আপনার দ্বারা সম্ভব হলেও মাত্র একটি সেকেন্ড সময়কে ধরে রাখার ক্ষমতা আপনার নেই। এমনকি পৃথিবীর কোনো রাজা-বাদশা, বৈজ্ঞানিক ও সবচাইতে ধনী ব্যক্তিগণও তা পারেননি। সময়ের সমষ্টি নিয়েই আপনার জীবন। সময় আপনার জীবনকে শিশু থেকে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে স্রষ্টার ইচ্ছায় এক সময় আপনাকে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে।

সময় তো থেমে নেই, আপনার জীবন তার সাথে পাল্লা দিয়েছে; কিন্তু কেউ কাউকে অতিক্রম করতে পারছে না। দু'জনেই একই সাথে চলেছে। কারণ, জীবন সময়ের ফ্রেমে বাঁধা। আর তাই আপনাকে কিছু করতে হলে; জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে; প্রথমে যে গুণটির প্রয়োজন, তাহল সময়ের সদ্ব্যবহার।

আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শাসনকর্তা। আপনার দাপটে সকলেই ভয় পায়। আপনার কথায় বিশ্বের সকল রাষ্ট্র উঠা-বসা করে। আপনার ক্ষমতার অধীনে সবাই কাজ করে।

আপনার এত দাপট! এত ক্ষমতা! একটি মুহূর্তের কাছে কিছুই না। কারণ, আপনার দাপট; আপনার ক্ষমতা একটি মুহূর্তকে ধরে রাখতে পারেনি বরং আপনার দাপট ও ক্ষমতা মুহূর্তের হুকে বাঁধা। দেখবেন ক্রমে ক্রমে আপনি বৃদ্ধে পরিণত হয়েছেন। মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিয়েছে আপনাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্তগুলো। কোথায় গেল আপনার ক্ষমতার দাপট।

www.pathagar.com

সত্যিই এ জীবনের কোনো মূল্য নেই! অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ও স্বল্পতাই এর পরিধি। এবার আরো অসহায় মনে হচ্ছে আপনাকে। তাহলে মূল্য কিসে? সবই তো সময় কেড়ে নিয়েছে। আপনার নিজস্ব কি আছে? যার দ্বারা আপনি সময়ের মূল্যায়ন করতে পারবেন। তাহলে আপনার করণীয় কিছুই নেই।

ঘাবড়াবেন না। মানুষ কি জন্মগ্রহণের পর অর্থ সম্পদ, যশ, খ্যাতি এসব সঙ্গে নিয়ে আসে। এ বিষয়গুলো কাল্পনিক ড্রামা সিরিজের মত লাগছে। আপনি হয়ত সিনেমা অথবা নাটক দেখেছেন?

নাটক ও সিনেমার ভিতর কীভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই একজন কোটিপতি হচ্ছেন, তা অবশ্যই খেয়াল করেছেন? কত কঠিন কঠিন বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নায়ক নায়িকাগণ দুর্লভ কিছু উদ্ধার করছেন; কিন্তু সিনেমার জীবন আর বাস্তব জীবন কি একই রকম?

না একই রকম নয়। তারা শুধু আপনার জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতগুলো চিহ্নিত করছেন; বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে। আর এগুলোকে ফুটিয়ে তোলার জন্য কাল্পনিক, বাস্তব ও অসম্ভব কিছুরও আশ্রয় গ্রহণ করছেন, সিনেমার কলা-কুশলীগণ।

আপনি বাস্তবে ওসব করতে যান? তাহলে মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। তার পরেও আপনি সফল হবেন কিনা তার নিশ্চয়তা দিতে পারছিনা।

আবার লক্ষ্য করুন কাল্পনিক, বাস্তব ও অসম্ভব যাই হোক না কেন; সিনেমার নায়ক নায়িকাকেও কিন্তু বেশ পরিস্থিতির মোকাবেলা করে ছবিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হচ্ছে, এটাও অবশ্য আপনার অদেখা নয়?

আপনার নিজস্ব যে প্রশ্ন পূর্বেই আপনাকে করেছিলাম কি আছে আপনার? যদি বলি আপনার কিছুই নেই? হয়ত বলবেন কিছু নেই মানে... আমার বাবার একমাত্র সন্তান আমি। তার বাড়ী-গাড়ী, অর্থ-সম্পদ, প্রতিপত্তি এসব কিছু তো আমার। ভবিষ্যতে আমিই এগুলোর মালিক।

কে বলেছে আমার কিছু নেই?... কিন্তু এগুলো তো আপনার নয়? যা আছে সবই আপনার বাবার অর্জিত। তাহলে আপনি কি অর্জন করেছেন? যা আপনার একান্তই নিজের। প্রশ্নটা বেশ ভাবনায় ফেলে দিল; কারণ আপনার একান্তভাবে নিজের অর্জিত কিছুই নেই। এখনও কোনো কিছুই অর্জন করতে পারেননি, যে পরিচয়টুকু আপনি কাউকে দিতে পারবেন; বাবার পরিচয়ে হাত-পা গুটিয়ে না থেকে নিজের পরিচয় গড়তে চেষ্টা করুন; তাহলে আপনার মাধ্যমে আপনার বাবার পরিচয় আরো বিকশিত হবে। আপনার জীবন আরো অর্থবহ হবে। কিন্তু আপনার অবহেলায় দ্বারা, অপকর্মের দ্বারা, আপনার বাবার পরিচয়ও একদিন মুছে যেতে পারে। তা কি কখনও ভেবেছেন?

www.pathagar.com

আবার লক্ষ্য করুন। আরেক জনের বাবার কিছুই নেই। তার বাবা তার জন্য কিছুই রেখে যেতে পারেননি? রেখেছেন সুস্থ সবল বুদ্ধিদীপ্ত একটি সন্তান। যে তার আপন কর্মের দ্বারা অধ্যবসায়ের মাধ্যমে, জ্ঞান, যশ, অর্থ-সম্পদ বাড়ী-গাড়ী সবকিছুই অর্জন করেছেন। এগুলো তার একান্ত নিজের। কারণ, সে নিজের পরিশ্রমের দ্বারা এগুলো অর্জন করেছেন। তার নিজের কিছু আছে বলে পরিচয় দিতে গর্ব হচ্ছে। কিন্তু আপনার কি লজ্জাবোধ করে না; যে আপনার একান্ত নিজের অর্জিত কিছুই নেই?

উন্নত বিশ্বগুলো এভাবেই পরিচয় দিয়ে থাকে বলেই, তারা পরিশ্রম ছাড়া কিছুই বোঝেন না। এজন্যই তারা এত উন্নত।

তবে আপনি এটুকুই বলতে পারেন। আমার দুহ্বটি হাত, দু'টি চোখ, দু'টি কান, দু'টি পা, এমনকি সমস্ত শরীর; এটা একান্তই আমার নিজের এবং আমি সুস্থ্য সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী। ব্যস; আপনার আর কিছুই লাগবে না। শুধু এটুকু হলেই চলবে।

কাজ করার জন্য স্রষ্টা আপনাকে দু'টি হাত দিয়েছেন, চলা ফেরার জন্য দু'টি চোখ দিয়েছেন। শ্রবণ করার জন্য দু'টি কান দিয়েছেন। আপনার দেহকে সুন্দরভাবে গঠন করেছেন। সমস্ত শরীরের লিডার বানিয়েছেন আপনার মাথাকে। আপনার নিজেকে জানার জন্য, পৃথিবীকে বুঝার জন্য, মস্তিষ্ক দিয়েছেন; তাতে দিয়েছেন ঘিলু বা ব্রেইন। তাতে তিনি স্থাপন করেছেন ভাব, ভাষা, কর্মশক্তি, কর্মপ্রেরণা, মানবিক-অমানবিক সব রকমের কর্ম প্রবৃত্তির উৎস। তিনি মস্তিষ্ককে নানা রহস্যে রহস্যমান করেছেন। যার রহস্য বিজ্ঞানীদের কাছে আজও অজ্ঞাত। মাথা কতগুলো ছোট হাড়ের টুকরোর সাহায্যে গঠন করেছেন। সেখানে মস্তিষ্ক সযতনে সুরক্ষিত আছে। ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, টেম্পোরাল ইত্যাদি নামের এই হাড়গুলো এমনভাবে তিনি খাপে আটকিয়েছেন; মনে হয় কেউ সুঁচ-সুতো দিয়ে মজবুত করে সেলাই করে রেখেছেন।

আপনার মস্তিষ্ককে সুস্থ্য সবল ও কর্মক্ষম রাখতে তিনি প্রতি মিনিটে প্রতি একশো গ্রাম ব্রেইন টিসুতে, পঞ্চান্ন মিলি লিটার রক্ত, ৫.৫ মিলিগ্রাম গ্লুকোজ এবং ৩.৫ মিলি লিটার অক্সিজেন সংবহনের ব্যবস্থা করেছেন। যা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।

সৃষ্টিকর্তা আপনাকে এতকিছুর সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। যেমন—স্মৃতিশক্তির ভাণ্ডার, মনঃসংযোগের ক্ষমতা, চিন্তার প্রসার ও বিকাশ, জ্ঞান-বুদ্ধির সীমাহীন শক্তি। কিন্তু এসব আপনার মস্তিষ্কে অবচেতন অবস্থায় লুকিয়ে আছে। তাকে আপনার

www.pathagar.com

জাগ্রত করতে হবে। স্রষ্টা আপনার যে শক্তি দিয়েছেন তার যথাযথ ব্যবহারে আপনি হতে পারেন জগতের সর্ব সেরা। আপনার মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তির ভাণ্ডার থেকে মেধাশক্তির সঞ্চার করতে হবে। সেই শক্তির মাধ্যমে আপনাকে সকল কিছুই অর্জন করে নিতে হবে। মনে রাখবেন, জীবন স্থবির নয়। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে জীবনও অনন্তের পথে যাত্রা করেছে। আর উন্নতির ক্রমধারায় কালের আবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে বিশ্বজগত। তাই গত পৃথিবী ও বর্তমান পৃথিবী এক নয়। অতীত পৃথিবীতে আদিম মানুষের চলাফেরায় ছিল অসন্তোষ ভাব। আর আজকের পৃথিবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে আধুনিকতার চরম শিখরে উপনীত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দী হয়ে উঠেছে আবিষ্কার মুখর উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ যুগ। এ শতাব্দীতে আমরা যা পেয়েছি অতীতের শতাব্দীগুলোতে তা কল্পনার বস্তু ছিল। আদিম সভ্যতার পরিবর্তন সাধন হয়ে এ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্য থেকে শুরু করে সকল পর্যায়েই প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

দিগন্ত উন্মোচনকারী নতুন নতুন আবিষ্কারের প্রয়াস ও চেতনার দ্বারা মানুষ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কেরোসিনের প্রদীপের পরিবর্তে ইলেকট্রিক বাতি; লাকড়ির চুলার পরিবর্তে গ্যাস, রেডিও-টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার, কম্পিউটার, টেলিফোন, ফ্যাক্স, মানব জাতির প্রভূত সমস্যার সমাধান করেছেন।

নব নব আবিষ্কারের দ্বারা মানুষ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এসব কিছুই শ্রম ও সাধনার দ্বারা সম্ভব হয়েছে।

আলস্যের জন্য পৃথিবী নয়, অধ্যবসায়ী, কর্মঠ, পরিশ্রমী ও কঠোর সাধনায় আত্মোনিয়োগকারীদের জন্য এই পৃথিবী।

আপনার মনে করা উচিত? একজন মানুষ হিসেবে আপনার করণীয় কাজটি কি? বিধাতা আমাকে পৃথিবীতে কেন পাঠিয়েছেন? কোনো মহামানব কি ঘরে বসে জীবন যাপন করেছেন? তিনি কি কাজ করেননি, এসব প্রশ্নের উত্তর জানলেও আপনার বলতে লজ্জাবোধ হচ্ছে হয়তো; কারণ; আস্ত অলস, মূর্খতাই আপনার র্ম। কাজের কথা শুনলে শরীর শিহরে ওঠে। কাজকে খুব ভয় পান না?.... এ বৈশিষ্ট্যগুলো অপদার্থের লক্ষণ। যদি জীবনকে জানতে চান? উন্নতির পথে আসীন হতে চান? জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে চান?... তাহলে আর সময় নষ্ট করবেন না, কারণ জীবন স্থিতিশীল নয়; সময়ের সাথে সাথে সেও আপনাকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠাই করে দিচ্ছে। সেদিন আপনার মৃত্যু হবেই। থাকবে শুধু কর্মগুলো। আর আপনি অমরত্ব লাভ করবেন, কর্মের মাঝে। এটাই জীবনের পূর্ণতা।

www.pathagar.com

পরিকল্পিত জীবনের কথা

সুন্দর জীবনের জন্যই নিয়ম; অনিয়ম জীবনের অবনতির কারণ। পৃথিবীর সর্বত্রই নিয়মের রাজত্ব। আকাশের দিকে তাকালে বুঝতে পারবেন; চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই নিয়মের অবাধ গতি চলছে।

হয়ত বিজ্ঞানে পড়েছেন পৃথিবী আপন কক্ষপথে ঘুরছে, সূর্য পূর্বে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায়। ষড়ঋতু পর্যায়ক্রমে ঘুরে আসে। রাতের পর দিন আসে; দিনের পর রাত। কোনো কিছুই নিয়ম-শৃঙ্খলার বাইরে নয়। সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়মের উৎপত্তি এবং সৃষ্টির শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ নিয়ম তার আপন গতিতেই চলতে থাকবে।

Nepoleon বলেছেন; "Discipline is th key stone to success which is compulsory to follow to balance the systems."

নিয়মানুবর্তিতা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে সুন্দর করে তোলে। নিয়ম ব্যতীত সামাজিক জীবন চলতে পারে না। বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান; যেমন—বিবাহ অনুষ্ঠান; পূজা-পার্বণ, খাওয়া-পরা সবকিছুই নিয়ম মাফিক হয়ে থাকে। নিয়ম না থাকলে অর্থাৎ অনিয়ম দেখা দিলে যেমন সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করে না; তেমনি ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনেও কোনো উন্নতি আসে না।

সমাজে কঠোর নিয়ম আছে বলেই আমাদের সমাজে অন্যায়-অবিচার ও খারাপ কাজের প্রবণতা কম। আর নিয়ম-শৃঙ্খলার আওতায় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব মিলে সুখ-সাচ্ছন্দ্যে বসবাস ও পারিবারিক জীবন নির্বাহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেছে।

আপনি একজন ছাত্র। ছাত্রজীবনে নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন সর্বাধিক। নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষার ও অভ্যাসের উপযুক্ত সময় হচ্ছে— ছাত্রজীবন। একজন ছাত্র হিসেবে আপনাকে নিয়ম মাফিক লেখাপড়া করতে হবে। দিন-রাত জেগে জেগে প্রত্যহ নিয়মের মাঝে লেখাপড়ার কাজ সেরে নিতে হবে।

নিয়ম-শৃঙ্খলার ভিত্তিতে স্কুল, কলেজ করতে হবে। তাদের দেয়া নিয়ম অনুযায়ী চলতে হবে। এভাবে নিয়ম অনুসারে প্রত্যহ পড়ার টেবিলে বসতে হবে। সকল কর্মেই শৃঙ্খলা মেইনটেন করতে হবে। নিয়ম পালন ব্যতীত ছাত্রজীবনে সার্থকতা অসম্ভব।

www.pathagar.com

নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের ফলাফল সর্বদাই অশুভ। ব্যক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে, পারিবারিক জীবনে কিংবা জাতীয় জীবনে; যে কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে পরিণতি যে মারাত্মক বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ; আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করে মুসলিম বাহিনী ওহুদের যুদ্ধে বিশৃঙ্খলভাবে শত্রুর উপর আক্রমণ চালাতে গিয়ে চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল।

নিয়ম ও শৃঙ্খলার অভাবে প্রতিভাশালী মানুষের জীবনও ব্যথ হয়ে যায়। যার জ্বলন্ত উদাহরণ মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

আপনি যদি পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকান; তাহলে দেখতে পারবেন, তাঁদের শক্তি, ধন, জ্ঞান ইত্যাদির মূলে রয়েছে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলাবোধ।

নিয়মানুবর্তিতার ব্যত্যয় ঘটলে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়, যা মানুষকে পদে পদে বিপদের সম্মুখীন করে তোলে।

এজন্যেই M. K. Ghandi বলেছেন;—

"Discipline maintains systems. Systems maintain development. Development vibrates humnan life. So, dicipline must be followied."

www.pathagar.com

সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব

সাহিত্য শাশ্বত সৌন্দর্যবোধের উৎস। পৃথিবীতে যা কিছু চিরন্তন ও মহৎ তাই সাহিত্যের অবলম্বন। সাহিত্যকে যদি জীবনের ছবি বলি তাহলে জীবন হবে তার ফটোগ্রাফ। জীবন ও সাহিত্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই তো সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি।

মানুষের চিত্ত বৃত্তির নানা দিক সম্পর্কে জানার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন সাহিত্য; কারণ, হিংসা-দ্বেষ-শত্রুতা একদিকে যেমন সাহিত্যের উপজীব্য, অন্যদিকে প্রেম ভালবাসা, স্নেহ-মমতাও সাহিত্যের উপজীব্য।

মানুষ সংঘবদ্ধভাবে সম্মিলিত ঐক্যে পরস্পরের প্রতি প্রীতি-ভালবাসা ও বন্ধুত্ববোধ নিয়ে বাঁচতে চায়? তাই সে গড়ে তোলে সমাজ; আর সমাজ জীবনে সে আপন সত্ত্বার বিকাশ চায়; তার এ চাওয়া-পাওয়ার প্রতিচ্ছবি, জীবনের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, রীতি-নীতি, আচর-ব্যবহার ও কৃষ্টির রূপই সাহিত্য।

জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা প্রতিফলিত হয় তার সাহিত্যে। সাহিত্য জীবনের সমালোচনা। জাতীয় জীবনে আমাদের উত্থান-পতন, প্রেম-ভালবাসা, শোক-দুঃখের কাহিনীই সাহিত্য। সাহিত্যের মধ্যেই জাতির অগ্রগতি। জাতির সত্ত্বা বিকশিত হয় সাহিত্যের মাধ্যমে। তাই মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও তার সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের পক্ষে সাহিত্যই অগ্রদূত।

মানুষ সংকীর্ণতার মধ্যে পরিপূর্ণতা চায়; সমীমের মধ্যে অসীমের সন্ধান চায়। জীবনে যা পাওয়া গেল না, তাকেই সে খুঁজে। হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা সমভাবে বিকশিত করার সুযোগ সে পায় না। তার এ ব্যাকুলতা সাহিত্যের মানবদণ্ডে জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং তখনই জাগতির হয় একটি সচেতন জাতি।

তাই—"কোনো জাতিকে জানতে হলে প্রথমে তার সাহিত্যকে জানতে হয়। আবার, কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে হলে সর্বাগ্রে তার সাহিত্যকে ধ্বংস করে দিতে হয়।"

প্রত্যেক জাতির সাহিত্যেই তার স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। তেমনি বাঙালী জাতির চিন্তাধারাই বাংলা সাহিত্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কিন্তু এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে চিরতরে স্তব্ধ করার জন্য, বাঙালী চিন্তা-চেতনাকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে, শোষণ, বঞ্চনা, খুন-যখম, নির্যাতন-নিপীড়নের যাঁতাকলে বাঙালী জাতিকে নিষ্পেষিত ও ধ্বংস করতে চেয়েছিল পাক হানাদার বাহিনী; কিন্তু তাদের চক্রান্ত আমাদের ধ্বংস করতে পারেনি। অবশেষে তারাই এদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল।

www.pathagar.com

ব্যাপকভাবে না হলেও বিক্ষিপ্তভাবে আমাদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন ঘটেছে। রচিত হয়েছে; গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, নাটক ও প্রবন্ধ ইত্যাদি। সাহিত্য জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির অবর্ণনীয় ইতিহাস। যে ইতিহাসের মাধ্যমে জাতি সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি ভিন্ন করে স্বীয় লক্ষ্যে অগ্রসর হয়। বিশ্বের বুকে জাতীয় স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে চির স্মরণীয় হয়ে রয়। "যে জাতি যত বেশী উন্নত; তার সাহিত্যও তত বেশী উন্নত।"

আবার, সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করলে সাহিত্য, সংগীত, ললিতকলা, চারুকলা এর সবগুলোই পাওয়া যায় এবং জাতীয় কার্যধারার সকল অগ্রগতিই সংস্কৃতির উৎস। সংস্কৃতির মূল কথা হচ্ছে সুন্দরভাবে বাঁচা, প্রেমে-পূণ্যে বাঁচা, মানবিক গুণাবলীকে বিকশিত করে বিচিত্রভাবে মানুষের অন্তরের সাথী হয়ে বাঁচা।

"যে মানুষ হিংসা থেকে দূরে, প্রেম ও করুণার ধারক, সত্য ও সুন্দরের উপাসক, সেই-ই সংস্কৃতির সেবক।" সংস্কৃতি জাতির আত্মার খাদ্য তথা জীবন যাত্রার বাহন; যার মাঝে বিরাজমান জাতীয় আকাঙ্ক্ষার "স্বপ্ন", সংগীত, চেতনা ও উন্নতির অগ্রগতি।

একটি জাতির দীর্ঘদিনের জীবনাচরণের ভেতর দিয়ে যে মানবিক মূল্যবোধ সুন্দরের পথে, কল্যাণের পথে এগিয়ে চলে তাই সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি স্থবির নয়। এগিয়ে চলাই এর ধর্ম। তাই সংস্কৃতিকে কোনো নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা কঠিন। আবার, সংস্কৃতি শুধুমাত্র সুকুমার কলার চর্চা নয়; সংস্কৃতি হল একটি জাতির আত্মবিশ্বাস ও আত্মোপলব্ধির এক প্রভাবশালী প্রত্যয়। বিভেদ যেখানে সংস্কৃতি সেখানে নেই। হিংসা-দ্বেষ যেখানে সেখানেও সংস্কৃতি নেই।

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালী জাতির শ্লোগান ছিল; সুন্দরভাবে বাঁচার অধিকার, প্রাণের দাবী ছিল বাঁচার আন্দোলন। এ আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল ভালবাসা, দেশকে ভালবাসা, দেশের মানুষকে ভালবাসা; নিজেদের ভাষা, কৃষ্টি ও লালিত আচার আচরণকে ভালবাসা। আমাদের সংস্কৃতি চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ এক বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী অনুপ্রেরণা।

মুক্তিযুদ্ধে আমরা ত্যাগ শিখেছি, বিভেদ ভুলে একতার গান গাইতে অনুপ্রাণিত হয়েছি; তাই' আজ আমরা একটি স্বাধীন স্বার্বভৌম দেশ পেয়েছি। আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আজ যে জাগরণ এসেছে এর মূলে রয়েছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ত্যাগ আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়ে গেল, তার উপরই গড়ে উঠেছে আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির পরিমণ্ডল।

জাতির বিশ্বাস, অনুভূতি, ছন্দ, প্রেম বিসর্জন ইত্যাদিই সাহিত্য এবং সাহিত্যের মাঝেই সংস্কৃতি বিজড়িত। সাহিত্য তার কার্যকলাপের দ্বারাই সংস্কৃতিতে পরিণত হয়, এবং সংস্কৃতি স্বীয় ধারাকে অব্যাহত রেখেই সাহিত্যের প্রকাশ করে। সুতরাং

www.pathagar.com

সাহিত্যের প্রতিচ্ছবিই সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতির অগ্রগতিই সাহিত্য। এ বর্ণনামতে একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। আর সাহিত্য ও সংস্কৃতি মিলেই তৈরী হয় একটি জাতি। যার প্রতিষ্ঠা লাভ হয় এ দু'টির মাধ্যমে। শব্দ দু'য়ের নাম বিচার-বিশ্লেষণ করলে একক ধারা পাওয়া যায়। যে ধারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতিকে যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। যার মূলে রয়েছে সাহিত্য ও সংস্কৃতি। ইহা দেশ, কাল, জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের প্রত্যেকটি জাতির অগ্রগতির উৎস।

যার ধারা বন্ধ হলে জাতি অচল ও অসার হয়ে যায়। গতিময় নদীস্রোতের ন্যায় এর স্বভাব। গতিময় নদীর স্রোত অনবরত চললে যেমন সেখানে শৈবাল ও ছত্রাক জন্মায় না, তেমনি যে জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি চলমান সে জাতিকে জীর্ণ লোকাচার ও বাধা-বিপত্তি কখনই গ্রাস করতে পারে না। অন্যথায় নদীর স্রোত বন্ধ হলে যেমন সেখানে শৈবাল ও ছত্রাক জন্মে, জল অপবিত্র ও দূষিত হয় এবং নানান রোগ-জীবানুর সৃষ্টি হয়।

নদীর এ অবস্থার সাথে সেই জাতির তুলনা করা হয়েছে। যার সাহিত্য ও সংস্কৃতির পথ উন্মুক্ত নয়। অপরপক্ষে, "কোনো জাতির সাহিত্য যতদিন গতিশীল থাকে; ততদিন তার সমৃদ্ধিকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না।"

আবার, কোনো কারণে যদি তার সাহিত্য অচল হয়ে যায়, তখন সে জাতির জীবনে দেখা দেয় নানা কুসংস্কার, যা তার জীবন ও অগ্রগতিকে পঙ্গু করে দেয়।

গতিশীলতাই জীবনের চলমান ধারা পরিবর্তনের মধ্যে জাতিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। যদি কোনো কারণে, তার সাহিত্যের গতি বিঘ্নিত হয়। যদি ব্যাহত হয় সংস্কৃতির জয়যাত্রা, তখন জাতীয় জীবনে আসে অশান্তির প্রভাব, জড়তা ও শ্রমবিমুখতার আবর্তে পতিত হয় তার জীবন।

পৃথিবীর প্রতিটি জাতিরই চলার একটি নিজস্ব ছন্দ আছে, ধারা আছে, সে ধারাতেই তার পরিচয়। সে ছন্দই তার জীবনে আনে নব নব সমৃদ্ধির জোয়ার। যার ছন্দ ও ধারাই সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব। কিন্তু কোনো কারণে যদি জাতি তার এ ধারাকে, চলার ছন্দকে হারিয়ে ফেলে, তখন জড়তা এসে তার জীবনকে গ্রাস করে। আর সে জড়তাই তার কর্মবিমুখতা ও ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

বদ্ধ জলাশয় যেমন দুর্গন্ধময় রোগ জীবাণু সৃষ্টি করে; তেমনি জড়তাময় জাতির জীবনে দেখা দেয় নানা লোকাচার-কুসংস্কারের দূষিত আবর্জনা। তখন জাতি হয় দিশেহারা। উন্নতির পথ হয়ে যায় রুদ্ধ। অবনত ও কলুষিত ব্যাকুলতায় হারিয়ে ফেলে তার হিতাহিত জ্ঞানকে। চতুর্দিক হয়ে পড়ে অন্ধকার। তখন তার ধ্বংস অনিবার্য।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশ্বজনীন। ইহা বিশ্বের প্রভাবধারায় এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আনবিক-পারমাণবিক তথা পৃথিবীর সকল শক্তির উর্ধ্বে যার শক্তি বিস্তৃত। এতেই

www.pathagar.com

রয়েছে জাতীয়তার সার্বজনীন উপকরণ। যা দ্বারা জাতি হবে চিরস্মরণী; ইতিহাস হবে চিরজাগ্রত এবং চলার গতি হবে উন্মুক্ত। যেখানে থাকবে শুধু শক্তি ও সমৃদ্ধির জোয়ার। যা উন্নতির বন্যায় জাতিকে প্লাবিত করে দেবে। তৈরী করবে অগ্রগতির সোনালী অধ্যায়! তাই প্রগতিশীল জাতির মূলে রয়েছে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব; যাকে তারা বাহন ও প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহার করে।

আমরা একদিন পরাধীন ছিলাম। পরাধীনতা আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছিল। বাধ্য করেছিল যুদ্ধ করতে। মানুষ হিসেবে আমরা বাঁচতে চেয়েছি। স্বাধীনভাবে বাঁচাই ছিল আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। এ বাঁচার চেতনা আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সৈনিকে রূপান্তর করেছিল। কিন্তু যে চেতনা ও সাহসিকতার সাথে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার প্রতিফলন হয়ত এখনও ঘটেনি বরং জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে আজ মিথ্যার মলিনতা বিদ্যমান। ফলে আমাদের সেই গৌরব যেন ঢেকে যেতে বসেছে।

মানবিক মূল্য আজ প্রায় নিঃশেষিত ও বিপন্ন। বিবেক ও মনুষ্যত্ব আজ লাঞ্ছিত ও অপমানিত। এমতাবস্থায় প্রশ্ন?... লাখো শহীদের রক্তে ভেজা ও হাজার হাজার মা-বোনদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কতটুকু অটুট ও অক্ষত থাকতে পারবে?

সুদীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী অবরুদ্ধ বাংলাদেশে যে অমানবিক নির্যাতন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার কোনো স্মৃতি আমাদের কাছে আছ কি?

নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের কতটুকু স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা আমরা হস্তান্তর করেছি?... এর প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছি? তাই আজকের প্রজন্ম মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালীর শক্তি, সাহস ও ত্যাগ-তিতিক্ষার সেই বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস প্রায় ভুলতে বসেছে।

আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার ফসল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। বিশ্বের প্রতিটি উন্নয়নশীল জাতির প্রতিটি মুহূর্তেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা পরিলক্ষিত। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি শক্তিশালী ছিল বলেই, এ দু'য়ের প্রতি অগাধ ভালবাসা জন্মেছিল বলেই, এর প্রভাব আমাদেরকে মুক্তির শ্লোগানে উদ্বুদ্ধ করেছিল তার ফলশ্রুতিতে আমাদের এ স্বাধীনতা।

অতএব সাহিত্য এ সংস্কৃতিই জীবন যাত্রার বাহন ও অগ্রগতির প্রধান উৎস।

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্ব ও মানবতার বিকাশ

ব্যক্তি বলতে ব্যক্তিত্ব নয়; কিন্তু ব্যক্তিত্ব বলতেই ব্যক্তি। আর তাই ব্যক্তি বলতে কোনো সাধারণ একজন মানুষকে বুঝায়।

হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে তাহলে ব্যক্তিত্ব কি? ব্যাপক অর্থে ঃ সত্য-নিষ্ঠা, মনুষ্যত্ব-মানবতা অর্থাৎ চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত বিবেক-বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিই ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এ কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে ব্যক্তিত্ব অর্জন সাপেক্ষ।

আবার, মানুষ বলতে মানবতা নয়; কিন্তু মানবতা বলতেই মানুষ। মানবীয় সকল গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিই মানবতার ধারক ও বাহক।

মানুষ যেখানে ব্যক্তিত্ব ও মানবতা সেখানে। কিন্তু মানুষ যেখানে নেই; ব্যক্তিত্ব ও মানবতা সেখানে নেই। কথাটি ভাববার বিষয়।

ব্যক্তিত্বকে বিশ্লেষণ করলে যে গুণগুলো পাওয়া যায়; মানবতাও ঠিক সেগুলোর সমন্বয়ে গঠিত। নাম দু'টি ভিন্ন হলেও ধারা মূলত—'একই'। মানব জীবনের সবক'টি গুণাবলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল ব্যক্তিত্ব ও মানবতা। কারণ, মানব জীবনকে বিকশিত করতে, কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে যে গুণগুলোর প্রয়োজন সবগুলোই এ দু'য়ের মাঝে বিরাজমান। ব্যক্তিত্ব ও মানবতা মানব জীবনকে অবিস্মরণীয় করে তোলে। ইহা মানব কল্যাণে ও জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। কোনো জাতির আত্মোপলব্ধি ও সূক্ষ্ম ধারণার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে জাতীয় ঐতিহ্য ও গৌরবগাঁথা ভূমিকায় ব্যক্তিত্ব ও মানবতা অপরিহার্য। এর অভাবে অতীতে নানা কারণে বাঙালী জাতি তার ঐতিহ্য ও ইতিহাসের চোরাবালিতে বার বার মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফলে, স্বাধীন চিন্তা, আশ্রয়ী ইতিহাস রচনা, ইতিহাস লেখকদের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয়নি। ইতিহাস রচয়িতাগণ ক্ষমতাসীনদের মনতুষ্টি বিধানে তৎপর ছিলেন বলেই অসংখ্য ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্য এবং প্রকৃত ঘটনাবলী, হীন স্বার্থের পাষাণস্তূপে চাপা পড়ে চিরতরে হারিয়ে গেছে; ব্যক্তিত্ব ও মানবতাহীনতায়।

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্ব ও মানবতার অভাবে কলঙ্ক কালিমাময় জীর্নাবরণ গায়ে পরিহিত থাকার দরুন বাঙালী ঐতিহ্য জাতীয় জীবনে প্রাণ-প্রবাহ সৃষ্টিতে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন মীর জাফরের বিশ্বাস ঘাতকতায় এক ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা ইংরেজদের নিকট পরাজিত হন। সেখান থেকেই বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। বাঙালী জাতি চলে আসে ইংরজ শাসনাধীনে। প্রায় দু'শত বছর তারা রাজত্ব চালায়। বিজাতীয় শাসন, শোষণ, বঞ্চনা আর নিপীড়নের যাঁতাকলে বাঙালী জাতি নিষ্পেষিত হয়েছিল। একমাত্র মীর জাফরের ব্যক্তিত্ব ও মানবতার অভাবে।

ব্যক্তিত্ব ও মানবতাবোধসম্পন্ন মানুষ কখনই নিজের স্বাধীনতাকে বিকৃত করতে পারে না। নিজের দেশ ও জাতির সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করতে পারে না।

মহান আল্লাহর পবিত্র কুরআন শপথ করেও মীর জাফর নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল মন্যুষত্ববোধ না থাকার দরুন।

ব্যক্তিত্ব মানব জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। ব্যক্তিত্বহীন সমাজ ব্যবস্থায় জীবন অর্থহীন। ব্যক্তিত্ব একটি আদর্শ, একটি দর্শন ও চারিত্রিক গুণাবলী। এ আদর্শ, দর্শন ও গুণাবলী প্রতিষ্ঠায় যুগে যুগে মহামানবগণ তাঁদের জীবনকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করেছেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়—পৃথিবীতে যেসব মহামানব স্বীয় জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন, তাঁদের মূলে ব্যক্তিত্ব ও মানবতার প্রভাব পরিলক্ষিত। তাই ব্যক্তিত্ব ছাড়া মানব জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে না। ব্যক্তিত্বের প্রভাব না থাকলে জীবনের অস্তিত্ব ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। ব্যক্তিত্বহীন জীবনে আসে কুসংস্কার ও জীর্ণ লোকাচার। যা সুন্দর জীবনকে করে দেয় ধ্বংস এবং হৃদয়কে করে দেয় কলুষিত।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনই মানব জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। ব্যক্তিত্বহীন লোক অনুকরণের যোগ্য নয়; তাই ব্যক্তিত্বহীন লোক ও পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

কথায় আছে, প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয় কিন্তু মন না থাকরে মানুষ হয় না। জগতের অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষেরও প্রাণ আছে। মানুষ যেমন নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীতে বাস করে, মৃত্যুবরণ করে; পশু পাখিও তেমনি। কিন্তু মানুষের নিকট যে বিবেক-বুদ্ধি জ্ঞান আছে, ব্যক্তিত্ব ও মানবতা আছে অন্যান্য প্রাণীর মাঝে তা নেই। তাই মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব বলা হয়।

ব্যক্তিত্ব মূখ্যতঃ আচার-ব্যবহার ও চারিত্রিক মাহত্বের উৎকর্ষ সাধন। যার হৃদয় থেকে হীনমন্যতা নির্বাসনে গিয়েছে, কু-প্রবৃত্তি নির্মূলিত হয়েছে। তাঁকেই

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্বশালী বলা হয়। নিরলস সাধনা ও কঠোর সংযমের মাধ্যমে যিনি চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করেছেন এবং হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করেছেন তিনিই প্রকৃত অর্থে ব্যক্তিত্বশীল।

ব্যক্তিত্ববোধ এখানেই পরিলক্ষিত হয়। যিনি কর্মশক্তির মাধ্যমে আত্মার পরিবর্তন সাধন করেন। অন্তরকে বিকশিত করেন এবং দেশ ও সমাজের কল্যাণে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। ব্যক্তিত্ব মানুষের চরিত্রের পরিছয় বহন করে। যে গুণটি মানুষকে মহত্ত্বের স্বর্ণশিখরে আরোহন করে তার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বের সারকথা, "জাগ্রত বিবেককে, সচেতন মানবকে, শুভ ও কল্যাণময় পথে পরিচালিত করা।" "মানুষের এ কল্যাণবোধ আত্মকেন্দ্রিক বা আত্মসর্বস্ব নয়। অপরের শোকে সান্ত্বনা দান, রোগে শুশ্রূষা করা এবং সর্বহারা আশাহতকে প্রাণবন্ত করাই মানব ধর্ম।

বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কল্যাণ কামনা। অপরাপর, প্রাণীর প্রতি সহজাত মমত্ববোধ মানুষকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করে তোলে। তাই মানুষকে হতে হয় পরার্থপর ও অপরের হিতৈষী। পরার্থে যথাসর্বস্ব উজাড় করে দেয়ার মধ্যেই ব্যক্তিত্ব ও মানবতার বিকাশ ঘটে।

যদি মানবতা শব্দকে বিশ্লেষণ করা হয়। মানবতা শব্দের বিকাশ বা প্রকাশস্থল মানুষ থেকে; অর্থাৎ ব্যক্তি হতেই মানবতা শব্দের ব্যুৎপত্তি। মানবতা মানব চরিত্র বা জীবনাচরণের অন্যতম বাহন। মানবতার মাঝে যে গুণটি পরোক্ষভাবে কাজ করে সেটি হচ্ছে; মনুষ্যত্ববোধ অর্থাৎ 'জ্ঞানের সেবা' এবং প্রত্যক্ষটি হচ্ছে; মানবতাবোধ অর্থাৎ 'মানব সেবা'।

মানবতা ও ব্যক্তিত্ব এ দু'য়ের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। দু'টিই পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানবতা ও ব্যক্তিত্ববোধ না থাকলে জীবনের অস্তিত্ব হুমকীর সম্মুখীন হয়। আর মানুষ তখনই পশুতে পরিণত হয়। সমাজ জীবনে তার মর্যাদা ও সম্মান হ্রাস পেতে থাকে। কোনো এক সময় জীবন চলার পথে অন্ধকার নেমে আসে। অবনতির কালো ধোঁয়ার প্রতিভাস পড়ে তার জীবনে; যা উন্নতির প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, আর তখনই প্রতীয়মান হয় যে মানবতা ও ব্যক্তিত্ব মানব জীবনকে কতটুকু বিকশিত করে তোলে।

ব্যক্তিত্ব ও মানবতা মানব জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। যে লক্ষ্য অর্জনের ভিতর দিয়ে জীবনযাত্রা প্রসারিত ও প্রভাবিত হয়। সাফল্যের বিকাশ সাধন হয়। মনুষ্যত্বের মানবদণ্ডে ব্যক্তিত্ব ও মানবতাকে বিশ্লেষণ করলে এর গুণ ও বিস্তৃতির পরিধি নির্ণয় সাধারণ জ্ঞানে কিছুতেই সম্ভব নয়। যার তুলনা সে নিজেই।

www.pathagar.com

সমাজের মধ্যে এমন কতক লোক আছেন; যারা হঠাৎ বড় হয়ে আভিজাত্যের বড়াইয়ে বা কোনো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ব্যক্তিত্ব ও মানবতাকে হারিয়ে ফেলেন এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় বয়ে আনেন দুর্যোগ ও দুর্গতি। যার ফলে অধীনস্থ সকলকে অকল্যাণ ও হতাশা নিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হয়। তখন প্রশাসন ব্যবস্থার অবনতি ঘটে। উচ্চপদস্থগণ ন্যায়-অন্যায়ের সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটন কল্পে মাথা ঘামান না। তখন যার মুখে যে কথা শুনেন তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং পরের কথায় সত্যবাদীকে অপরাধী ভেবে তার জবানবন্দী না নিয়েই দূরে তাড়িয়ে দেন। এর প্রধান কারণ হচ্ছে; পারদর্শিতা ও ব্যক্তিত্ব মানবতার অভাব। আর যেখানে ব্যক্তিত্ব ও মানবতা নেই; সেখানে পারদর্শিতার কোনো লক্ষণও নেই।

ব্যক্তিত্ব ও মানবতাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি কখনোই কোনো কান কথায় বিশ্বাসী নন; বরং সত্য ও প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধানী।

এ দু'য়ের ছাপ যার হৃদয়ের অভ্যন্তরে পৌঁছে গেছে, তার অন্তরের কাম; ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য ইত্যাদি রিপুগুলো ধ্বংস হয়ে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। হৃদয়ে জাগ্রত হয়েছে প্রাণ; সঞ্চারিত হয়েছে নব নব সমৃদ্ধির জোয়ার।

মানব ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়; মানব জীবনে ব্যক্তিত্ব ও মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশ যুগে যুগে পৃথিবীতে সাফল্যের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছিল।

www.pathagar.com

নিজেকে উপস্থাপন করার দক্ষতা অর্জন

আমরা কখনো নিজেদের নিয়ে ভাবি। সিদ্ধান্ত নেই, আবার কখনো এসব মাথায় আনি না। জীবনে চলার পথে মানুষ কত ভুল করে বসে তার ইয়াত্তা নেই। আমরা প্রতিনিয়তই ভুল করি। অনুতপ্ত হই। স্রষ্টার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি; আবার সৎ পথে নিজেকে পরিচালিত করতে চাই। আমাদের এই ইচ্ছা অনিচ্ছা সবই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। তেমনি আমাদের জীবনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা হল—নিজেকে উপস্থাপন করার দক্ষতা অর্জন।

আমাদের সমাজে, রাষ্ট্রে ও সবকিছুতে যা কিছু ঘটছে-রটছে সবকিছু জেনে-বুঝেই নিজেকে উপস্থাপনের দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

আমাদের দেশে ঘন ঘন ত্রাস হচ্ছে; রাস্তা-ঘাটে, শহরে-বন্দরে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, গ্রামে-গঞ্জে মোট কথা সকল স্থানেই। কিন্তু কে বা কারা ত্রাস করছে তা হয়তো আপনার ও প্রশাসনের অজানা নেই।

হতে পারে আপনার ছেলে, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, পরশী এদেরই একজন কিন্তু আপনার, আমার আমাদের কারোই কি কিছু করার নেই। খবরের কাগজ খুললেই খুন, ধর্ষণ অপহরণ, ডাকাতি-রাহাজানি আরও কত জঘণ্য খবর। যার বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়।

এদেশে চৌদ্দ কোটি মানুষ। আর ত্রাস করছেন, হাতে গোনা কয়েক জন মানুষ।

যেহেতু প্রশাসন নীরব। ঘুষ, দুর্নীতি আর স্বজন প্রীতিতে ভরে গেছে দেশ। আমরা তো জনসংখ্যায় অনেক বেশি। আমরা সোচ্চার হলে সকল জনগণ একতাবদ্ধ হয়ে, যেখানে সন্ত্রাস হচ্ছে কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের চিহ্নিত করে, প্রশাসনের আশায় না থেকে গণ পিটুনির প্রচলন করলে, এ সন্ত্রাস ঠেকানো সম্ভব। তাহলে কেউ ভুলেও সন্ত্রাস করতে চেষ্টা করবে না। কিন্তু প্রশাসনকে ঘুষ দিয়ে অথবা বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের হাত করে সন্ত্রাসীমহল দিন দিন তাদের অপকর্মের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছেন। এভাবে চলতে দিলে একদিন এ জাতি ধ্বংসের দিকে পা বাড়াবে।

www.pathagar.com

ভীরু আর কাপুষদের জন্ম হবে এ সমাজে; যা একদিন বৃহত্তর জাতিতে রূপ নেবে। সেই সুযোগে সন্ত্রাসীমহল তাদের রাজত্ব বিস্তার করবে।

আইনের পোষাক পরে মানুষরূপী জানোয়ারের দল ঘুষ খেয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হবে। গুষের পরিস্থিতি লক্ষ্য করতে হলে সরাসরি গিয়ে দেখুন রাজধানী প্রাণকেন্দ্রের কয়েকটি জানজটপূর্ণ রাস্তায়।

পরিস্থিতি দেখলেই বুঝতে পারবেন কারা দুর্নীতি করার সুযোগ সৃষ্টি করছে। এখানে আমার বলার কিছুই নেই। এতক্ষণ যা বলেছি, সবই সত্য ও প্রকৃত ঘটনা। এগুলো অস্বীকার করার শক্তি আপনার আমার কারোরই নেই।

আপনি কেন ঘুষ খেয়ে নীরবতা পালন করছেন? আইনের পোষাক পরে কেন আইনকে অপব্যবহার করছেন? কেন সরকারকে ধোকা দিচ্ছেন? মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যা প্রচার করে জনগণকে প্রতারিত করছেন?

কেন ত্রাসকারীদের সাহায্য করছেন? আপনিই তো বড় সন্ত্রাস। কাকে দমন করবেন? এখন দেখছি আপনাকেই দমনের প্রয়োজন। আপনার মত দু'চার জনের কারণে পুরো প্রশাসনকেই অপবাদের ঘানি টানতে হচ্ছে। আবার আপনার মত এমন অপদার্থের সংখ্যাও কম নয়।

আপনি জানেন কি? যদি এদেশে রাজাকার মহল তৈরী না হত। বাঙালী নামের কলঙ্কিত পাষণ্ডরা যদি রাজাকারী না করত। পাকিস্তানী বাহিনীর কাছে গোপন খবরা খবর না পৌঁছাত। তাহলে অনেক আগেই এদেশ স্বাধীন হত। এত মা-বোনকে ইজ্জত হারাতে হত না। এত মা-বোনদের কোলও খালি হত না। তেমনি আপনি যতদিন ত্রাসকারীদের, ঘাতকদের ও দুষ্কৃতিকারীদের সাহায্য করবেন; ততদিন এদেশে কোনো শান্তি আসতে পারে না।

তাহলে আমাদের স্বাধীনতার মূল্যবোধ কোথায়? দেশ স্বাধীনের অর্থ আপনার আমার ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার, ভাষার অধিকার, মুক্তবুদ্ধি চর্চার অধিকার, বাঙালী চিন্তা-চেতনা ও ঐতিহ্য বিকাশের অধিকার। এবার লক্ষ্য করুন কোন অধিকারটি সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে। ভোটের অধিকারের কথা বলছেন। ভোট চুরি হচ্ছে। ব্যালটে রায় দিতে গিয়ে অনেকেই সন্ত্রাসের চাপে ফিরে আসছেন। আর এরই ফাঁকে জাল ভোটের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

ভাতের অধিকারের কথা ভাবছেন? যারা দুর্গম কষ্টে মাঠে ফসল ফলাচ্ছেন। তাদের ন্যায্য পাওনা তারা পাচ্ছেন না। তারাই মূলতঃ বছরে দু'বার ভাতের কষ্টে ভুগছেন।

আবার, চেয়ারম্যান, মেম্বার ও এম. পি. এরা জনগণের প্রতিনিধি। আমরা ধর্মে মুসলমান। পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট জাতি।

পবিত্র কোরআনে আছে—"ইন্নাদ্বীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম।"

www.pathagar.com

ইসলামী শরীয়াতের ভাষায় প্রতিনিধি হচ্ছেন খলিফা। যেমন—হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)।

একজন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের সকল জনগণের প্রতিনিধি। একজন সংসদ সদস্য তার স্থানীয় প্রতিনিধি। একজন চেয়ারম্যান তার ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং মেম্বার তার ওয়ার্ডের প্রতিনিধি। এবার প্রশ্ন হল কোন্ প্রতিনিধি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন?

কথাগুলো শুনতে বেশ খারাপ লাগছে। জানি অনেকেই রেখে যেতে পারেন। কিন্তু কিছুই করার নেই; সাহিত্য রচনাই আমার কাজ। কারো ভাল লাগবে, আর কারো খারাপ লাগবে তা দেখা আমার কাজ নয় অন্যথায় সাহিত সৃষ্টি হবে না, বরং স্বার্থান্বেসী মহলের সন্তুষ্টি বিধান হবে।

ইসলাম আমাদের কি শিখিয়েছেন? সন্ত্রাসী তৈরী করতে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করতে, নাকি রাষ্ট্রের সকল জনগণের অধিকার নিশ্চিত করতে। তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে আপনি প্রধানমন্ত্রী। আপনার মূলনীতিতে কি আছে। আপনার সংসদ সদস্যরা কি তা করছেন? কথাটি গায়ে বাঁধার নয়; বরং স্মরণ করিয়ে দেয়ার ভূমিকা রাখছি।

আপনি যেমন প্রতিনিধি। হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন একজন প্রতিনিধি। হয়ত প্রতিক্রিয়া হতে পারে যে হযরত উমর (রাঃ)-এর সাথে আমার তুলনা করা এটা কি সম্ভব? তবে হ্যাঁ, ইসলাম তাঁদের থেকে আপনাকে শিক্ষাগ্রহণ করতে বলেছেন। তাঁর সাথে তুলনা করিনি বরং আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। ভুলে যাবেন না রাষ্ট্রের বিশাল জনগোষ্ঠীর অধিকার রয়েছে আপনার প্রতি। কারণ আমি তাদের প্রতিনিধি। আপনার স্থানীয় প্রতিনিধিদের প্রতি কড়া নজর রাখতে হবে। যাতে তারা আপনার অর্পিত দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করেন। ব্যক্তিস্বার্থে যেন কোনো কিছু হস্তক্ষেপ না হয়। যদি আপনি নিজেই দুর্নীতিতে জড়িয়ে যান, তাহলে কিছুতেই সুস্থ সমাজ, সুস্থ জাতি গঠন করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।

আপনি প্রধানমন্ত্রী হন আর যাই হন। কথাটি চিরসত্য। ক্ষমতা দিয়ে ক্ষমতার সৃষ্টি করা যায়। আপনার দাপট ও দাম্ভিকতা দিয়ে প্রসাশনকে নাচানো যায়; কিন্তু সুস্থ সমাজ ও সুন্দর জাতি গঠন করা যায় না। সামরিক আইন জারি করেও কেও ক্ষমতায় থাকতে পারেনি, আবার পুলিশ, বিডি আর দিয়ে পিটিয়েও কেউ জনগণকে স্তব্ধ করতে পারেনি, তাতে বরং ক্ষমতার অপব্যবহারই করা হয়। এগুলো সংবিধানে আছে কিনা তা আমার জানা নেই; তবুও বলতে হয় এগুলো বর্বরতা ছাড়া কিছুই নয়।

হযরত উমর (রাঃ) প্রায় অর্ধ পৃথিবীর শাসনকর্তা হয়েও অতি সাধারণভাবে জীবন নির্বাহ করেছেন। নিজের পিঠে আটার বস্তা বহন করে এক দরিদ্র কুটিয়ে

www.pathagar.com

গিয়েছেন। গভীর রাত্রে ছদ্মবেশে প্রজাদের খোঁজ নেয়া তার চরিত্রের আরেক বৈশিষ্ট্য ছিল। তেমনি একদিন রাত্রে বেরিয়ে পড়ে দেখলেন দু'টি শিশু ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছেন। মা তাদের সান্ত্বনার জন্য পানির পাত্র চুলোয় বসিয়ে রান্নার ভান করছেন।

খলিফা উমরের চোখে পানি এসে গেল। আমার রাজ্যে, আমার প্রজা না খেয়ে থাকতে পারে না। কাল কেয়ামতে আল্লাহর কাছে আমি কি জবাব দেব। সেই দরিদ্রের কুটিরেই তিনি নিজে খাদ্যের বস্তা বহন করেছিলেন।

আরেক দিনের ঘটনা আমীরুল মু'মেনীন হযরত উমর (রাঃ) জেরুজালেমবাসীর আমন্ত্রণ পেয়ে একজন ভৃত্যকে সাথে নিয়ে জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে রওয়া করলেন। তাদের সংবর্ধনা গ্রহণের জন্য।

জেরুজালেমের পথ ছিল দীর্ঘ এবং মরুভূমিতে পথচলা খুবই কষ্টের। তাই তিনি স্থির করলেন এদের সাথে পালাবদলের মধ্য দিয়ে এ পথ অতিক্রম করবেন।

ভৃত্যের হাতে ছিল উটের লাগাম আর হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন উটের পিঠে। এভাবে কিছু পথ যাওয়ার পর তিনি ভৃত্যকে দাঁড়াতে বললেন—ভৃত্য দাঁড়িয়ে গেল; আমেরুল মু'মেনীন তাকে উটের পীঠে আরোহনের আদেশ করলেন, হযরত উমর (রাঃ) নিচে নেমে উটের লাগাম ধরতে উদ্দত হলেন।

ভৃত্য হতবাক হয়ে বললেন ঃ "না, এ হয় না, আমীরুল মু'মেনীন, ভৃত্য উটের পিঠে বসবে আর স্বয়ং খফিফা উমর (আখেরী নবীর দক্ষিণ বাহু; অর্ধ পৃথিবীর শাসনকর্তা) লাগাম টানবে। আমাকে মাফ করবেন হুজুর! আমি আপনার গোলাম একজন দাস মাত্র!"

হযরত উমর (রাঃ) উত্তর করলেন ঃ "না, মানুষ কখনই মানুষের গোলাম হতে পারে না। মানুষ একমাত্র সৃষ্টিকর্তার গোলাম। মানুষ মানুষের সেবক তথা সাহায্যকারী মাত্র।

ভৃত্যের চোখে পানি এসে গেল। দয়াল নবীর শিক্ষা ও আদর্শ হযরত উমর (রাঃ) জীবনে এক উজ্জ্বল ভাস্কর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাই হয়ত নবীজী একথা উচ্চারণ করেছিলেন? "মোর পরে যদি নবী হত কেউ; হত সে এক উমর।" কাজী নজরুল ইসলামের উমর ফারুক কবিতার এই লাইন।

ভৃত্যের কোনো জবাব ছিল না। কণ্ঠ নির্বাক হয়ে গেল, হযরত উমর (রাঃ)-এর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার ভাষা ছিল না তার। উমরের আদর্শ ও ভালবাসার নজীরে ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। গোলাম অতঃপর আমীরুল মু'মেনীনের আদেশ মানতে বাধ্য হয়ে, তাকে উটের পিঠে আরোহন করতে হয়েছিল। স্বয়ং খলিফা উমর উটের লাগাম ধরে টানতে লাগলেন।

আপনার আদর্শ কোথায়? অথচ একই নবীর উম্মত আপনি, আমি আমরা সবাই। আমরা সবাই এক জাতি কিন্তু একই রকম বিধান আমাদের কাছে নেই। ইসলামের

www.pathagar.com

বিধানগুলো কি আপনার মাঝে আছে? এ প্রশ্নের উত্তর তো আপনার মাঝে নেই বরং অন্য ধর্মের প্রচলিত যেসব বিধান আছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তাও আপনার মাঝে নেই। কারণ তারাও ইসলামের বিধি-নিষেধ মান্য করে। সমর্থন করে এর নীতিকে। এ বিধানগুলোর অংশবিশেষ তাদের মাঝে দেখা যায় কিন্তু আপনার মাঝে তাও নেই।

আমাদের দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, একক প্রচারণা, আপন স্বার্থ উদ্ধার এসব এক নতুন সংবিধানে পরিণত হয়েছে।

আমাদের সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধিগণ কি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন? কেউ কি কখনো স্ব-ইচ্ছায় পায়ে হেঁটে গ্রামে গিয়ে জনগণের সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করছেন? যদিও গিয়ে থাকেন; সেটা নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। বছরে দু'একবার বের হলেও তাও আবার কোনো কিছুর উপলক্ষে। যাতে আগামীতে তিনি জনগণের প্রতিনিধি হতে পারেন।

আবার ভোটের আগে সব জায়গাতেই তাদের দেখা যায়; কিন্তু নির্বাচিত হলে যদি ভুল করে সেখানে যান।

আপনি হয়তো কথাটি মানেন, 'ধর্ম ছাড়া পৃথিবীতে কোনো মানুষ নেই। যার ধর্ম যাই হোক না কেন? কিন্তু এটা মানতেই হবে কোনো ধর্মের বিধান এরকম নয়। তাহলে আপনার এ নীতি কোথায় পেলেন? আপনি নির্জনে ভাবুন তো বিশাল জনগোষ্ঠী আপনাকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন; তাদের মৌলিক অধিকারসহ নিরাপত্তা নিশ্চয়তার জন্য। কিন্তু তা কি আপনি করছেন?

ধর্মের বিধান হয়তো আপনার কাছে নেই; তাই তা বাদই দিলাম কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে; মনুষ্যত্বের দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে তো আপনাকে ছেড়ে দেয়া যায় না। এবার জবাব দিন। আপনার কোন্ দায়িত্বটি সঠিকভাবে পালন করেছেন?

কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগতে পারে। আবার অনেকের রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে, কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারোর নেই। অথবা কথাগুলো বুঝার ও ভাবার সময় হয়তো আপনার নেই। তাই বিষয়টি এড়িয়ে চলছেন? অথচ এটি এড়িয়ে চলার মত বিষয় নয় বরং আপনার দেশ ও জাতির মৌলিক অধিকারের বিষয়।

আপনি একজন সন্ত্রাসী, মাস্তান, চাঁদাবাজ। আপনি কেন এসব করছেন? এ প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছ থাকলেও দেয়ার মত নয়। আর দিলেও আমি তা গ্রহণ করব না। কেন? এছাড়া কি অন্য কোনো কাজ নেই।

আপনি দেশ, জাতি ও সমাজের কতটুকু ক্ষতি করছেন তা কি জানেন?

www.pathagar.com

জাতি আপনার কাছে কি চায়? সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, মাস্তানী, নাকি সুনাগরিক। কিন্তু সে আদর্শ কি আপনার আছে? কি করে থাকবে। আপনি এখন সন্ত্রাস করছেন? সন্ত্রাসীদের জন্ম দিচ্ছেন। সন্ত্রাসের রাজত্ব বিস্তারে সাহায্য করছেন। একজন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আপনার হাতে কাগজ কলম থাকা দরকার ছিল কিন্তু তা নেই, আছে অস্ত্র।

কাকে কখন ঠেকাবেন, কারে কোন্ ফাঁদে আটকালে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়া যাবে। কোন্ আদর্শবান লোককে অপবাদ দিয়ে সমাজে ছোট করে রাখবেন? কোন্ সম্মানী ব্যক্তিকে দুর্বল পয়েন্টে আঘাত করলে, কীভাবে স্বার্থ উদ্ধার হবে এ ব্যাপারে সারাক্ষণ শলাপরামর্শ করার সময় জোটে আপনার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে। কিন্তু ভাল কথা শোনার, ভাল কাজ করার সময় মোটেও আপনি পান না বরং রেগে যায়।

মনে করতে পারেন, আমার অনেক দাপট, অনেক ক্ষমতা, সবাই আমাকে মান্য করে, মূল্যায়ন করে। কিন্তু আপনার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, সব মিথ্যে। আপনাকে অন্তর দিয়ে কেউ ভালবাসে না; কেউ শ্রদ্ধাও করে না বরং ঘৃণা করে। উপরে উপরে যা দেখছেন, তা শুধু পরিস্থিতি ও পরিণতির জন্য। আপনি একজন প্রথম শ্রেণীর ক্যাডার। হয়তো ভাবছেন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মণ্ডলীরা যখন আমাদের মূল্য দেয়, তাহলে তো আমাদের স্থান বেশ উর্ধ্বে। এবার আমি আপনাকে আস্ত গর্ধব বলব।

শুধু মানুষের ঘরে জন্মালে যেমন মানুষ হওয়া যায় না; তেমনি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লেই আদর্শবান ছাত্র বা জ্ঞানী হওয়া যায় না। যারা সন্ত্রাস ও দুর্নীতি করছেন; তাদের সিংহ ভাগই তো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র। এবার বিষয়টি ভেবে দেখুন। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস কেন?

একজন শিক্ষকের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। শিক্ষক মানুষ তৈরীর কারিগর। সুস্থ, আদর্শবান ও শিক্ষিত সমাজ একমাত্র শিক্ষকরাই উপহার দিতে সক্ষম। একথা অস্বীকার যোগ্য নয় যে, প্রাইমারীর শিক্ষকের কাছেও আপনি ঋণি। এখন আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রাইমারীর সেই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাগুরুর কথা কি আপনার মনে পড়ে? একবার ভেবে দেখুন, তখনকার জীবন কত সুন্দর! কত পবিত্র! যারা সন্ত্রাস করছেন। আপনারাও তো এভাবে প্রাইমারীর ছাত্র ছিলেন। সেই সময়ের আদর, স্নেহ, ভালবাসার বন্ধন ভুলে কেন সন্ত্রাসীর খাতায় নাম লিখলেন। কত মধুর জীবন ছিল আপনার! এখন আর ঘুম নেই। চারিদিকের চীৎকার। অন্যায় অবিচারের তাণ্ডবলীলা। এভাবে কতদিন চলবে। কেন আপনাকে গর্ধব বলেছি তা শুনবেন না?

www.pathagar.com

আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আসলে শিক্ষকমণ্ডলীগণ আপনাকে ভয় পান না। ভয় পান একমাত্র নিজের মান সম্মানকে। আর এ মান-সম্মান বজায় রাখার জন্য। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা আপনাকে সাহায্য করে থাকেন। আপনার তো মান ইজ্জত নেই; কিন্তু একজন শিক্ষক, একজন শিক্ষাবিদ ও সম্মানী লোকের অপমান মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ।

আপনার কেউ শার্টের কলার ধরলে, হয়তো গায়েই লাগবে না; কারণ কারো কলার ধরা, আর কেউ আপনার কলার ধরা, এটা আপনার কাছে নতুন কিছু নয়, কিন্তু একজন শিক্ষকের শার্টের কলার তো দূরের কথা দু'চারজনের সামনে আঙ্গুল তুলে অপমানজনক দু'তিন বাক্য শুনালেই অথবা ধমক মারলেই তার বাঁচা মরা সমান হয়ে ওঠে। আর এ কারণেই তারা পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আপনার ক্রিয়াকলাপকে ভয় করেন।

এমতাবস্থায় আপনার ধারণা যে সন্ত্রাসী বলে শিক্ষক আমাকে ভয় করেন। একরম মনোভাবের কারণেই আপনাকে গর্ধব বলেছি। ব্যাপারটা হয়তো এবার বুঝতে পেরেছেন?

আপনি একজন শিক্ষিত সচেতন যুবক। আপনার তো সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজী, মাস্তানী করার কথা নয়। আপনাকে ওসব মানায় না।

জাতি আপনাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে? কারণ, আপনার মত তরুণ শিক্ষিত যুব সমাজরাই আগামী দিনে জাতিকে নেতৃত্ব দেবে। আপনিতো তাদেরই দলে।

আবার আপনি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত একজন ছাত্র।

এবার আপনার নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন? এখনও সন্ত্রাস করবেন, নাকি জাতির মঙ্গলের জন্য আদর্শ পথে পা বাড়াবেন। এটা একান্তভাবে আপনার বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন।

আপনি জাতিকে কি দিয়েছেন? কি কি দিতে পারবেন? আপনার সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপে সমাজ কতটুকু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এটুকু চিন্তা করলেই আপনার সঠিক উত্তর পেয়ে যাবেন।

ব্যক্তিত্বের বিকাশে মুক্তবুদ্ধির অনুশীলন

পৃথিবীতে ব্যক্তিসত্ত্বা বড় জিনিস। আর চিন্তার স্বাধীনতা থেকেই ব্যক্তিসত্ত্বার সৃষ্টি হয়। অন্যের উপর নির্ভর করে কখনো মুক্তবুদ্ধির বিকাশ ঘটানো যায় না, তাতে বরং নিজেকে ছোট বলে মনে হয়।

আবার নিজেকে কখনো সামাজিক ক্রিয়াকলাপে জড়াবেন না । তাহলে আপনার কোনো ব্যক্তিসত্ত্বা থাকবে না। দুঃখ-কষ্ট হলেও নিজের ক্ষমতানুযায়ী আপন পরিবেশ গঠন করলে যেমন—স্বাধীনতা থাকে তেমনি আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করা যায়।

www.pathagar.com

মানুষ মূলত আভ্যন্তরীণ শক্তির সাহায্যে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন; কিন্তু এ পথটুকু খুবই কঠিন। খুবই নির্মম। তবুও আপনাকে পদে পদে বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে নানা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে মহত্ত্ব অর্জন করতে হবে। অলস, কাপুরুষ ও দুর্বলরা কখনোই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। তারা সর্বদাই পরনির্ভরশীল থাকেন।

আপনার ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ ঘটাতে হলে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করতে হবে। আপনার সুতীক্ষ্ণ গবেষণা. পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্য ও ন্যায়ের সুচিন্তিত মতবাদই মুক্তবুদ্ধির অনুশীলন।

কোনো দেশের শিক্ষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মহল যখন যুক্তি নির্ভর, বিশ্বাসযোগ্য সত্য ও প্রকৃত জীবন চরিত মতামত প্রকাশের দ্বারা দেশ ও জাতির মঙ্গলের পথে ব্রতী হন; তাই মুক্তবুদ্ধির চর্চা।

আমাদের সমাজে এখনও অন্ধবিশ্বাস ও পুরাতন প্রথা বিদ্যমান যা ঘুণে ধরা সংস্কারে আবদ্ধ। পৃথিবীতে অনেক সভ্যতার বিলীন হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে নিত্য নতুন সভ্যতা। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে আজকের পৃথিবী। এক নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ নিয়ে।

এগিয়ে চলার নতুন সুর শুনতে পারলেও এ সমাজ পুরাতন জড়তা কাটিয়ে গতিময় করে তুলতে পারছে না ব্যক্তিসত্ত্বাকে। বিকাশ ঘটাতে পারছে না সমাজে। সমাজ আজ চিন্তার নিকট বন্দী। এ বন্দীদশা থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র পথ মানসিক শক্তি ও বলিষ্ঠ চতনা।

চারদিকে আজ শাসনের দেযাল, শোষণের দেয়াল, মিথ্যার দেয়াল। সমাজের মাঝে আজ যে অন্ধ-বিশ্বাসের মতবাদ ও ধর্মীয় গোড়ামীর শৃঙ্খল পাথর চেপে বসে আছে তা ঘুরিয়ে সমাজকে গতিময় করে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

এ সমাজকে প্রকৃত ও বাস্তবমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে মুক্তবুদ্ধি চর্চার অধিকার নিশ্চিত করতে পারলেই ব্যক্তিসত্ত্বার ঘোষণা করতে সক্ষম হবে। নিজেদের সাহিত্য সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে পারবে।

অনেকেই ইংরেজি শিক্ষাকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে পরিপন্থী মনে করেন। মহামানবদেরকে জাতিভেদে আবদ্ধ করে রাখেন। আবার কাজী নজরুল ইসলামকে মুসলমানদের কবি এবং রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুদের কবি বলে প্রচার করেন; কিন্তু একথা সত্য যে মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়—এ সহজ সত্যটিও তারা উপলব্ধি করতে অক্ষম।

আপনার জীবনকে গতিশীল করতে, আপনার ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ ঘটাতে মুক্তবুদ্ধির চর্চা একান্ত আবশ্যক। বর্তমান উন্নত সভ্যতার পেছনে চিন্তাশীল মনীষীদের যুক্তিনির্ভর মুক্তচিন্তার অফুরন্ত অবদান বিদ্যমান।

www.pathagar.com

উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালেই এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সকল সভ্য মানুষের জন্য চিন্তার স্বাধীনতা বা মুক্তবুদ্ধির চর্চা একান্ত আবশ্যক; যা দ্বারা আপন ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ সাধিত হবে।

বুদ্ধিজীবী মহলগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের দোষত্রুটি সমালোচনার মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান দেন। সত্যের বাণীকে নির্ভীকভাবে প্রচার করেন। তাঁদের এই আন্দোলনেই সুস্থ ও সুন্দর সমাজ তৈরী করে। অতএব, মানুষের ভেদবুদ্ধি দূর করে মানবিক আচরণকে মর্যাদা দিতে হলে মুক্তবুদ্ধির অনুশীলনই একমাত্র পথ। তাই এ অশুভ চিন্তার জগতে সুস্থ জীবনবোধ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মুক্তবুদ্ধির চর্চা অপরিহার্য।

প্রকৃতপক্ষে, মুক্তবুদ্ধি চর্চার অধিকারীরাই মানব সভ্যতার রূপকার। তাঁদের গভীর মননশীলতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই মানব সভ্যতা আজকের এ উন্নত স্তরে এসে পৌছতে সক্ষম হয়েছে। বিকাশ সাধিত হয়েছে এক সুন্দর ব্যক্তিসত্ত্বার।

চিন্তাবিদগণের সুচিন্তার ফলেই বর্তমান বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি এত প্রসারতা লাভ করেছে। এ জন্য মুক্তবুদ্ধি চর্চার মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ ঘটিয়ে জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত করতে এগিয়ে আসুন। যোগ দিন চিন্তার স্বাধীনতা ও মুক্তবুদ্ধি অনুশীলনকারীদের দলে।

www.pathagar.com

Chapter Four

অধ্যায় ৪

- ☆ বিজ্ঞানের যৌক্তিক ব্যাখ্য
- ☆ স্বল্পবুদ্ধি থাকার কারণ কি?
- ☆ বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে কি আই-কিউ নির্ভুলভাবে বের করা যায়?
- ☆ 'জড়বুদ্ধি বলতে কাদের বোঝায়?'
- ☆ আমরা স্বপ্ন দেখি কেন?
- ☆ শিশুরা দেয়ালা করে কেন?
- ☆ ভোরের স্বপ্ন কি সত্যি হয়?
- ☆ শারীরিক ও মানসিক অবস্থিতির সময়ে লোকে বেশি স্বপ্ন দেখে কেন?
- ☆ সদ্যোজাত শিশুদের কি বোধবুদ্ধি থাকে?
- ☆ শিশুরা বড়দের অনুকরণ করে কেন?
- ☆ শিশুর মুখে ভাষা ফোটে কীভাবে?
- ☆ কোন্ বৈশিষ্ট্যের ফলে মানুষ কথা বলতে পারে?
- ☆ সব মানুষের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ কি এক রকম?
- ☆ এক আদর্শ মহাপুরুষের কথা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের যৌক্তিক ব্যাখ্যা

বিজ্ঞানের শেষ কথা বলে কিছু নেই। আজ যা প্রমাণিত সত্য, আগামীকাল আরো উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা আবিষ্কৃত হতে পারে আরেক সত্য। তখন বাতিল হয়ে যায় গতকালের কথা।

তেমনি ইতিহাসেরও চিরসত্য বলে হয়তো কিছু থাকতে নেই। ইতিহাস কখনো উল্টে যাবে না, এমন কোনো কথা নেই। আজকের ইতিহাসে যাকে সত্য বলে জানি কাল আরো সূক্ষ্ম গবেষণায় তা বাতিল হতে পারে, সেখানে সামনে এসে দাঁড়াতে পারে আরেক সত্য। আরেক নতুন কথা, নতুনরূপে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তেমনি পুরোনো সত্যকে আঁকড়ে ধরে নতুনকে বরণ না করারও কোনো যুক্তি নেই।

এমনি করে পরিবর্তিত হতে হতেই এক সময় আমরা পৌছে যাব শেষ সত্যে। তাই সে পথে পা বাড়াতে ভয় করার কিছু নেই। দ্বিধা থাকারও কথা নয়।

ইতিহাসে কতকাল ধরেই লেখা ছিল আমেরিকা আবিষ্কারের কথা। আমেরিকা আবিষ্কারের কথা উঠলেই সবার আগে যাঁর নামটি মনে পরে তিনি হলেন দুঃসাহসিক নাবিক কলম্বাস। আমরা জেনে এসেছি, এই নাবিক কলম্বাসই আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন। তিনিই প্রথম সভ্য সমাজের সামনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন একটি অজ্ঞাত ভূখণ্ডকে, একটি বিশাল মহাদেশকে। তাই আমেরিকা আবিষ্কারের মূল কৃতিত্ব তাঁরই।

তবু অতি সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিদদের গবেষণার ফল ভিন্ন রকম দাঁড়াতে শুরু করেছে। কেউ কেউ বলছেন, কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন বটে। হয়তো কলম্বাসের পর থেকেই আমেরিকার অস্তিত্ব ব্যাপকভাবে সভ্য জগতের কাছে প্রচারিত হতে থাকে।

তাঁরা বলতে চাইছেন, কলম্বাস ১৪৯২ সালে আমেরিকা গিয়ে পৌছান। কিন্তু ওটাই ইউরোপীয়দের সর্বপ্রথম আমেরিকা পদার্পণ নয়, এর আগেও কেউ না কেউ ইউরোপ বা এশিয়া থেকে এখানে এসেছিলেন। হয়তো তাঁদের আগমন ততটা

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এতটা ব্যাপক প্রচার লাভও করেনি। হয়তো তাঁরা আবিষ্কারার্থেও সেখানে যাননি? কেউ গিয়েছিলেন একান্তই ব্যক্তিগত কৌতূহলে, কেউ গিয়েছিলেন দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে। তাই সে কথা লেখা হয়নি ইতিহাসের পাতায়। গুরুত্ব পায়নি আবিষ্কার বলে।

তবু সেই অতীতের নিবু নিবু প্রদীপের শিখা আবার জ্বলতে শুরু করেছে। ধূসর দিগন্তের আলো দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আধুনিক কালের প্রত্নতত্ত্ববিদদের। ইতিহাসের পাতায় আবার নতুন করে লেখা হচ্ছে সেই সব বিস্মৃত কালের কিছু কিছু অজ্ঞাত অখ্যাতদের নাম। সেই সাথে সৃষ্টি করেছে কিছু কিছু ঐতিহাসিক বির্তকেরও।

বির্তক হল—যদি আমেরিকায় কলম্বাস ইউরোপ, এশিয়ার প্রথম মানুষ না হন তা হলে কে সেই প্রথম মানুষ? সে কোন্ ব্যক্তি বা কোন্ দেশ প্রথম আমেরিকায় পৌছানোর গৌরবের অধিকারী, অবশ্য এর কোনো সঠিক মীমাংসা আজো হয়নি। ঐতিহাসিকদের মধ্যে আছে মতপার্থক্য। আছে যুক্তিতর্ক। এ তর্কের শেষ নেই।

তবে বিজ্ঞানের যৌক্তিক ব্যাখ্যার আলোকে প্রমাণিত বিষয়গুলো যুক্তিতর্কের মানদণ্ডে বিশ্লেষিত—তাই এ ধরনের নানা প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার নাম বিজ্ঞানের যৌক্তিক ব্যাখ্যা। আমরা প্রতিনিয়তই এ রকম নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হই যার সঠিক ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই। তাই পাঠককে জানিয়ে দেওয়ার জন্যেই আমার এবারের আয়োজন বিজ্ঞানের যৌক্তিক ব্যাখ্যা।

স্বল্পবুদ্ধি থাকার কারণ কি?

স্বল্পবুদ্ধির কোনো বাচ্চা কখনো কখনো আমাদের নজরে আসে। এর কি কোনো কারণ আছে?

বুদ্ধির মাপকাঠিতে যারা শেষের সারিতে থাকে এমন সব বাচ্চাদের বলা হয় **'মঙ্গোল বাচ্চা'** এদের চোখ দু'টি ছোট ছোট, চোখের পাতা পুরু, মাথার পিছন এবং মুখের গড়ন চ্যাপ্টা; প্রায় সব সময়েই এরা চোখ পিটপিট করে। এদের যাবতী উপসর্গের জন্য জিন এবং ক্রোমোজোম সংক্রান্ত গণ্ডগোলের ফলে এদের শরীরের মধ্যকার পরিপাক ক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়—ফলে এদের মস্তিষ্কের গঠন সম্পূর্ণ হয় না। স্বাভাবিক মানুষের প্রতিটি কোষের মধ্যে যেখানে ২৩ জোড়া অর্থাৎ ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে— সেখানে মঙ্গোল বাচ্চাদের থাকে ৪৭টি ক্রোমোজোম।

www.pathagar.com

জন্মানোর সময়ে শিশু মাথায় আঘাত পেলে তার থেকেও মানসিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে। আবার মাতৃগর্ভে থাকার সময়ে অথবা জন্মানোর অব্যবহিত পরেই রোগ জীবাণুর সংক্রামণ ঘটলে শিশুটির মানসিক প্রতিবন্ধীতে রূপান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

উদাহরণ হিসেবে জার্মান মিজলস বা এনকেফেলাইটিসের কথাই বলা যায়। এ ছাড়া ক্ষতিকর কিছু রাসায়নিক পদার্থ গর্ভকালীন অবস্থায় মায়ের শরীরে ঢুকলে তা গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধির বিকাশে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এই সব রাসায়নিকের মধ্যে রয়েছে কার্বন মনো-অক্সাইড এবং সিসের নানা ধরনের যৌগ। এগুলো আবার শহরের দুষিত বাতাসে যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে থাকে। মানসিক প্রতিবন্ধকতার জন্য পরমাণু বিকিরণকেও অনেকে দায়ী করে থাকেন।

মানসিক প্রতিবন্ধকতার পেছনে মানসিক এবং সামাজিক কারণও কিছু কিছু থাকে। যেমন দেখা গেছে; উচ্চবিত্ত লোকদের ছেলেমেয়েদের যেখানে শতকরা মাত্র ১ থেকে ২ জন মানসিক প্রতিবন্ধী সেখানে নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানসিক প্রতিবন্ধীর সংখ্যা শতকরা ২০ জন বা তারও বেশী। শুধুমাত্র পুষ্টির হেরফেরেই যে এমনটা ঘটে তা নয়। নিম্নবিত্ত পরিবারের বাচ্চা হওয়ার সময়ে মায়েদের দিকে কম নজর দেওয়া হয় এবং তার ফলে জন্মানোর সময়ে শিশুর মস্তিষ্কে আঘাত লাগার ঘটনাও বেশী ঘটে বলে এই সব শিশু স্বল্পবুদ্ধির শিকার হয়।

আর্থিক সঙ্গতি একেবারে কম, এমন পরিবারের শিশুরা সাধারণত বাড়ীতে পড়া শুনার আবহাওয়া বা পরিবেশ পায় না। অনেক সময়েই এরা বই, খবরের কাগজ বা রেডিওর সঙ্গে প্রায় অপরিচিত থেকেই বড় হয়ে ওঠে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে,—শহরের বস্তি অঞ্চলের মানুষের কথাবার্তা অপ্রচলিত, অর্থহীন শব্দের মধ্যে অনেক সময়ে বাঁধা পড়ে থাকে। ফলে এই পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুরাও ভাব আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গেও এদের যোগাযোগ ঘটে কম। এই সব কারণেই আর্থিক সঙ্গতিহীন পরিবারের শিশুদের কেউ কেউ মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়।

www.pathagar.com

বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে কি আই-কিউ নির্ভুলভাবে বের করা যায়?

আমরা বুদ্ধির পরিমাপ করি আই-কিউয়ের সাহায্যে, কিন্তু আই-কিউ কি নির্ভুলভাবে বুদ্ধির পরিমাপ করতে পারে?

মানুষের বুদ্ধি পরিমাপের জন্য যে-সব ইনটেলিজেন্স টেস্ট চালু রয়েছে সেগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা আছে।

প্রথমত, কেউ যদি নিজের আই-কিউ জানার ব্যাপারে আদৌ আগ্রহী না হয়, তবে সে দায়সারাভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। এতে তার সঠিক বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। তেমনি যদি কেউ আগে টেস্টের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় বার বা তৃতীয় বার উত্তর দেওয়ার সময়ে সে কম সময় নেবে এবং ভুল উত্তরও তুলনামূলক কম হবে। ফলে একই অভীক্ষা বা টেস্ট প্রয়োগ করে দ্বিতীয় বার বা তৃতীয় বার যে আই-কিউ বেরোবে তাও তার বুদ্ধির সঠিক পরিমাপ হবে না। এইচ জে আইশেঙ্ক-এর তৈরী অভীক্ষাটির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রথম বার প্রয়োগের পর যে মানুষটির আই-কিউ বেরিয়েছে ১১০, দ্বিতীয় বার প্রয়োগের পর তা হয়েছে ১১৬ এবং তৃতীয় বারে ১২০।

এ-ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত মানুষের উপযোগী কোনো বুদ্ধির অভীক্ষা এখনো পর্যন্ত তৈরী করা সম্ভব হয়নি।

অভীক্ষায় যে-সব প্রশ্নগুলো থাকে তার কম-বেশী সব ক'টিই বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষের সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল। যে-অভীক্ষাটি মার্কিন ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ভাল খাটে, তা বাংলাদেশী ছেলেমেয়েদের বুদ্ধ্যঙ্ক বের করার ক্ষেত্রে শতকরা একশো ভাগ সফল নাও হতে পারে। ধরা যাক, বিদেশী কোনো বুদ্ধির প্রশ্নে একটি বাচ্চার কাছে জানতে চাওয়া হল;—চার্চ আর স্কুলের মধ্যে মিলটা কোথায়?

এ ক্ষেত্রে সে বলবে, 'চার্চ এবং স্কুল-দু' জায়গাতেই ঘণ্টা বাজে'—তাকে হয়তো পুরো নম্বর দেয়া হবে। এখন এই প্রশ্নটা যদি বাংলাদেশী কোনো শিশুর কাছে রাখা হয় এবং যদি এমন হয় যে, সে কখনো চার্চ দেখেনি—তবে তার পক্ষে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া অসম্ভব। আবার বাংলাদেশী ছেলেমেয়েদের উপযোগী করার উদ্দেশ্যে যদি প্রশ্নটার ধরন পাল্টানো যায়—বলা হয় মসজিদ এবং মন্দিরের মধ্যে মিল কোথায়? এ কথায় বলা যায়—উভয় জায়গাতেই প্রার্থনা করা হয়।

এ জন্যেই বুদ্ধি পরিমাপের ব্যাপারে ভাববর্জিত অভীক্ষাগুলো অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। আবার প্রশ্নের মধ্যে অনেক রকম বৈচিত্র্য আনতে হলে ভাষার সাহায্য না নিয়েও উপায় থাকে না। এই সব কারণেই বুদ্ধ্যঙ্ককে বিশেষ কোনো সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ না করে—তা সাধারণের তুলনায় কতটা বেশী বা কম তা প্রকাশের ওপরই এখন জোর দেওয়া হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

'জড়বুদ্ধি বলতে কাদের বোঝায়?

বুদ্ধির খানিকটা ঘাটতি দেখলেই আমরা সহজেই জড়বুদ্ধি কথাটা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে বড় বুদ্ধি কাদের বলে?

'জড়বুদ্ধির' ব্যাকরণগত অর্থ—যাদের বুদ্ধি জড়বৎ। কোনো মানুষেরই বুদ্ধির ভাঁড়ার বেবাক ফাঁকা হতে পারে না। সুতরাং কারও ক্ষেত্রেই এই আপত্তিকর শব্দটা প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

চলতি কথায় আমরা যাদের জড়বুদ্ধি বলি, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ মানুষের তুলনায় কম; ফলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলায় এরা অক্ষম। এরা হল এক ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধী—যাদেরকে স্বল্পবুদ্ধিও বলা চলে। জন্মের সময়ে বা জন্মের দু'তিন দিন পরেও আর পাঁচটা স্বাভাবিক শিশু থেকে এদের আলাদা করা মুশকিল। তবে যতই এদের বয়স বাড়ে, ততই এদের বুদ্ধির ঘাটতিটা বেশী করে ধরা পড়ে।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের বুদ্ধির তারতম্য বোঝানো হয় 'বর্ডার লাইন,' 'মাইল্ড,' 'মডারেট' এবং 'সিভিয়ার'—এই চার ধরনের শ্রেণীর সাহায্যে। বুদ্ধ্যঙ্কের তারতম্য অনুযায়ী মানসিক প্রতিবন্ধীদের এর যে কোনো একটি বিভাগে ফেলা হয়।

সাধারণ বাচ্চাদের আই-কিউ যেখানে ৯০ থেকে ১১০, সেখানে যাদের আই-কিউ ৭০ থেকে ৯০-এর মধ্যে তারা তাকে বর্ডার লাইনে। হাব-ভাব, আচার-আচরণ দেখে এদের অনেককেই স্বাভাবিক বাচ্চাদের থেকে আলাদা করা মুশকিল। সাধারণ ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পড়া-শুনা করলেও এরা পরীক্ষার ফলাফলে সবার তুলনায় পিছিয়ে থাকে এবং এদের অনেকেই স্কুলের শেষ ক্লাস অবধি পৌছাতে পারে না। এদের পরের দলটার আ-কিউ ৫০ থেকে ৭০-এর মধ্যে থাকে। এই ধরনের একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের বুদ্ধির বহর অনেকটা ৮ থেকে ১১ বছরের বাচ্চার সমান।

আই-কিউ যাদের ৩৬ থেকে ৫০-এর মধ্যে তাদের মানসিক বয়স ৪ থেকে ৫ বছরের বেশি আর বাড়ে না। এদের চেহারার মধ্যে সব সময়ে একটা জড়সড়, জবুথবু ভাব লক্ষ্য করা যায়। আর ৩৫-এর চেয়েও আই-কিউ যাদের এদের সংখ্যা খুবই কম; সমস্ত মানসিক প্রতিবন্ধীর শতকরা দশ ভাগের বেশী নয়। মোটামুটি এক হিসেবে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে স্কুলে যাওয়ার মত বয়স হয়েছে এমন শিশুদের শতকরা দশজন মানসিক প্রতিবন্ধী। তবে এদের বৃহত্তর অংশই বর্ডার লাইনে এবং সেদিক থেকে এরা স্বাভাবিকতার নাগালের মধ্যে রয়েছে—এই যা ভরসা।

www.pathagar.com

আমরা স্বপ্ন দেখি কেন?

আমরা সকলেই অল্পবিস্তর স্বপ্ন দেখি। কিন্তু স্বপ্ন দেখার কারণটা কি?

শরীর বিজ্ঞানীরা ঘুমকে দু'টো পর্যায়ে ভাগ করে থাকেন—একটা হল—Rapid Eye Movement বা REM পর্যায়: ঘুমের এই অবস্থায় চোখের তারা দ্রুত নড়াচড়া করে। দ্বিতীয় পর্যায়টির নাম—No Rapid Eye Movement—সংক্ষেপে NREM; ঘুমের এই অবস্থায় চোখের তারা থাকে স্থির। REM ঘুমের সময়েই আমরা সাধারণত স্বপ্ন দেখে থাকি।

মানুষের স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানী সিগমণ্ড ফ্রয়েড বলেছিলেন—আমাদের চেতন মনের গভীরে আছে একটা অবচেতন মন। আমরা যখন জেগে থাকি, তখন আমাদের ভাবনা-চিন্তা, আবেগ-অনুভূতি থাকে চেতন মনের নিয়ন্ত্রণে। যেই আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, অমনি আমাদের অবচেতন মনে অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের রূপ ধরে মনের চেতন স্তরে উঠে এসে পরিতৃপ্তির রাস্তা খোঁজে।

উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক—একটি ছেলে এক ঘর সহপাঠীর সামনে কারও কাছে অপমানিত হল। হয়তো ছেলেটি শারীরিক বা আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ার দরুন সেই মুহূর্তে অপমানের প্রতিশোধ নিতে অক্ষম। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে ছেলেটি তার অপমানের কথা ভুলে গেলেও তার অবচেতন মনে অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা রয়ে যেতে পারে। রাত্রে সে হয়তো স্বপ্নে দেখবে— যে ছেলেটি তাকে অপমান করেছিল তাকে যেন সবাই মিলে মারছে কিংবা সে ছেলেটির বিরাট কোনো ক্ষতি হয়েছে। অনেক সময় ছেলেটিকে সরাসরি না দেখে তার মত চেহারার কাউকেও স্বপ্নে দেখা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হচ্ছে আংশিতভাবে।

আর এক ধরনের স্বপ্ন লোকে প্রায়ই দেখেন, যেগুলোকে বলা যায় ভয় বা উদ্বেগের স্বপ্ন। যেমন— আমাদের কারও প্রিয়জন হয়ত খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন; ডাক্তারও বেশী ভরসা দিতে পারছেন না। সে-ক্ষেত্রে আমরা হয়ত স্বপ্ন দেখব, পাহাড়-চূড়ো অথবা উঁচু বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে যেন গড়িয়ে পড়ছি। প্রিয়জনকে ঘিরে উদ্বেগের কারণেই এ জাতীয় স্বপ্ন আমরা দেখি। যদি আমরা উদ্বেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি—তবে এ রকম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

www.pathagar.com

শিশুরা দেয়ালা করে কেন?

শিশুরা দেয়ালা করে, এসব সকলেরই নজরে আসে। কিন্তু কেন?

ঘুমের ঘোরে শিশুর মুখে আনন্দ বা ভয়ের অভিব্যক্তিকে আমরা বলি দেয়ালা—শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলে 'দেবলীলা।' এই দেবলীলা আসলে স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ। শিশুর একান্ত মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলো দেয়ালার মধ্য দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় ফুটে ওঠে।

নজজাত শিশুর বিচার-বিশ্লেষণী ক্ষমতা না থাকলেও কিছু কিছু সহজাত প্রবৃত্তি তার থাকেই। খিদে-তেষ্টা না মিটলে শিশু কাঁদে। আবার খিদের মুখে দুধ পেলে বা নিঃসঙ্গতার থেকে মায়ের সান্নিধ্যে এলে শিশু খুশি হয়, হাসে।

সম্প্রতি গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে যে, জন্মের কয়েকদিনের মধ্যেই শিশু তার আশ-পাশের মানুষের মুখে হাসি-কান্নার অভিব্যক্তিকে আলাদা করে ধরতে পারে। শুধু তা নয়, বড়দের হাসিমুখ দেখার ফলে সময় বিশেষে শিশুর চোখে মুখেও হাসির ছাপ ফুটে উঠতে দেখা যায়। জন্মের পর থেকেই নতুন সব অভিজ্ঞতা শিশুর মস্তিষ্কের স্মৃতিভাণ্ডারে জমা হতে থাকে। জেগে থাকার সময়ে চারপাশে যে-সব ঘটনা ঘটে যায়, সেগুলো ঘুমের মধ্যে স্মৃতিভাণ্ডার থেকে উঠে এলেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী প্রতিক্রিয়াগুলোর ছাপ পড়তে থাকে শিশুর চোখে মুখে। ছোট শিশুর দুনিয়ায় হাসি-কান্না আর ভয় ছাড়া অন্য কোনো প্রতিক্রিয়ার স্থান নেই বলে তাদের ঘুমের মধ্যে শুধুমাত্র হাসি আর ভয়ের অভিব্যক্তি ফোটে উঠে। জটিল সব মানসিক প্রতিক্রিয়া, যেমন—সন্দেহ, বিষণ্নতা, অভিমান—এ সবের অভিব্যক্তি শিশুদের দেবলীলার মধ্যে ধরা পড়ে না।

ভোরের স্বপ্ন কি সত্যি হয়?

আমাদের অনেকের ধারণা, ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়।

সত্যিই কি তাই?

বিজ্ঞানের যৌক্তিক ব্যাখ্যায় এর যুক্তি কি হতে পারে?...

শুধু ভোরের স্বপ্ন কেন, কোনো স্বপ্নই যে বাস্তবে হুবহু মিলে যাবে এমন কথা কখনোই বলা যায় না। (আমরা স্বপ্ন দেখি কেন পর্বটি পড়ে জেনে নিন)

দেখা গেছে, ঘুমের REM পর্যায়ে অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে যখন চোখের মনি নড়াচড়া করে— সে-সময়টাই স্বপ্ন দেখার সময়।

www.pathagar.com

খুব ছোট শিশুরা তাদের ঘুমের শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ সময় থাকে REM অর্থাৎ স্বপ্ন দেখার অবস্থায়। শিশুরা যে ঘুমের মধ্যে প্রায় সব সময়ই দেবলীলা করে তার কারণ, ঘুমের প্রায় পুরো সময়টাই তাদের কাছে REM পর্যায়ে। ক্রমশ শিশুর বয়স যত বাড়তে থাকে ঘুমের পরিমাণ তত কমে আসে।

দশ বছর বয়সের পর থেকে বাকি জীবনে REM ঘুমের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় পুরো ঘুমের কম-বেশি ২৫ শতাংশে। সাধারণতঃ ঘুমিয়ে পড়ার ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই REM বা স্বপ্নপর্ব শুরু হয়।

১০ থেকে ২৫ মিনিট কাটে স্বপ্নের মধ্যে, তার পরে ঘণ্টা দেড়েকের জন্য NREM বা স্বপ্নহীন অবস্থা। এইভাবে REM আর NREM পর্ব ঘুরে ঘুরে আসে। সাধারণতঃ ভোরের দিকের স্বপ্নপর্বের মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে গেলে স্বপ্নটা অনেক সময় হুবহু মনে পড়ে যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ কেউ পরীক্ষার দিন ভোর রাতে স্বপ্নের মধ্যে পরীক্ষার প্রশ্ন আগাম জেনে ফেলেছেন বলে দাবি করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার আগের রাতে পড়া তৈরী করার সময়ে বিশেষ কয়েকটি প্রশ্ন যাতে পরীক্ষায় আসে সেটাই সে হয়তো কামনা করে থাকেন। আর স্বপ্নের তাড়নায় তার এ কামনা অলৌকিকভাবে পূর্ণ হয়। অর্থাৎ ভোরের স্বপ্নে সে দেখল যে, ওই প্রশ্নগুলোই এসেছে। পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রশ্নগুলোকে সত্যি সত্যিই পেয়ে গেলে সেটা হবে অলৌকিক পাওয়া বা নিতান্তই কাকতালীয় ব্যাপার।

ঘুমের মধ্যে অনেকে স্বপ্নাদেশ পায় বলে দাবি করে থাকেন—এটা একেবারে নিছক নয়—আসলে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের জন্য অবচেতন মনে অলৌকিক প্রভাবের ফলে এররূপহয়।

শারীরিক ও মানসিক অবস্থিতির সময়ে লোকে বেশি স্বপ্ন দেখে কেন?

যখন শরীর ভাল থাকে না এবং মনও খারাপ থাকে—তখনই অনেক সময়ে আমরা বেশী স্বপ্ন দেখি। কিন্তু কেন?

বিজ্ঞানের যৌক্তিক ব্যাখ্যায় এর বিশ্লেষণ কি হতে পারে—

ঘুমের REM পর্যায়ে অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে যখন চোখের মনি চড়াচড়া করে সে সময়টাই স্বপ্ন দেখার সময়। আবার এই পর্যায়ে ঘুমটাও থাকে পাতলা—একটু জোরে শব্দ হলেই তা ভেঙ্গে যায়। কোনো জায়গায় জ্বালা-যন্ত্রণা বা হজমের গণ্ডগোল হলে শরীরের বিভিন্ন স্নায়ু মারফত শারীরিক অবস্থিতির খবরটা পৌঁছে যায় মস্তিষ্কে। এ অবস্থায় ঘুম আসতে চায় না বা ঘুম এলেও তা বার বার ভেঙ্গে যায়। খেয়াল

www.pathagar.com

করলে দেখা যাবে, ঘুমানোর সময়ে চোখে আলো পড়লে বা রেডিও জোরে বাজতে থাকলে ঘুমানোর অসুবিধে হয়। এর কারণ ঘুমের জন্য মস্তিষ্ককে বাইরের উদ্দীপক (Stimulus) থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এখন শারীরিক অবস্থিতির সময়ে ঘুমটা পাতলা থাকে বলে এ সময়ে চোখের মনি নড়াচড়া করে অর্থাৎ শারীরিক অবস্থিতির সময়ে ঘুমের প্রায় পুরোটাই থাকে REM পর্যায়ে। ফলে ঘন ঘন স্বপ্ন দেখাটাই স্বাভাবিক। উৎকণ্ঠ, উদ্বেগ বা মানসিক অবসাদের সময়েও একই ঘটনা ঘটে। এ সময়েও ঘুমটা গাঢ় হয় না এবং পাতলা ঘুমের জন্যই স্বপ্ন দেখেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষটি।

সদ্যোজাত শিশুদের কি বোধবুদ্ধি থাকে?

মানুষ বলতে তো বোধবুদ্ধি থাকবেই। কিন্তু শিশুদের তা আছে কি?

সদ্যোজাত শিশুদের কতটা বোধবুদ্ধি আছে?

প্রাণী জগতের সেরা জীব মানুষ। কিন্তু সে যখন কেবলমাত্র জন্মায় তার চেয়ে অসহায় বোধহয় কেউ থাকে না। মাতৃ জঠরে যে আরামদায়ক পরিবেশে সে ছিল তার মধ্যে থেকে হঠাৎ করে বাইরের আলো-হাওয়ায় এসে পড়লে শিশুটির অবস্থা রীতিমত অস্বস্তিকর হবেই। উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার মত কতকগুলো সহজাত গুণ তার অবশ্যই থাকে। যেমন— খিদে পেলে সে কাঁদে, চোখে আলো পড়লে তার চোখ বুঝে আসে, আঘাত পেলে সে চেঁচায়। সেই মুহূর্তে এবং তার পরেও বেশ কিছুদিন পৃথিবীতে সে একেবারে একা; তার শারীরিক চাহিদাগুলোই তখন তার দেহ-মন জুড়ে থাকে। নিজেকে বাদ দিলে, এ-সময়ে মা-ই তার সবচেয়ে কাছের জন—যিনি তার খিদে পেলে তা মেটান, শরীরের উত্তাপ দিয়ে অসহায়ত্ব দূর করেন।

এর পরে আমরা দেখি শিশুটির বয়স যত বাড়ছে, ততই তার মস্তিষ্ক পরিণত হচ্ছে, শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সুসংবদ্ধ হয়ে উঠছে। শারীরিক বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে শিশুর মানসিক বিকাশও হতে থাকে ধাপে ধাপে। সে সঙ্গতিপূর্ণ আচার-আচরণ করতে শেখে।

দুর্বোধ্য আওয়াজের বদলে অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করে। মা এবং নিজেকে বাদ দিয়ে আর পাঁচজনের অস্তিত্ব ধরতে পারে। তার বুদ্ধি বাড়ে, আবেগ-অনুভূতির ইচ্ছেগুলো রূপ নিতে থাকে। শিশুটি ক্রমশ নিজেকে নানা ধরনের পরিস্থিতিরি সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শেখে। এইভাবে ধীরে ধীরে সে সামাজিক হয়ে ওঠে। সারা জীবন ধরে যে মানসিক এবং সামাজিক বিকাশের ধারা আমরা মানুষের মধ্যে দেখতে পাই তার শুরুটা হয় জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

সংলগ্ন মেডিক্যাল স্কুলের এক দল মনোবিজ্ঞানী দেখেছেন, শিশুরা তাদের জন্মের মাত্র ৩৬ ঘণ্টা পরেই বিষাদগ্রস্ত এবং সুখি মানুষের মুখগুলোকে আলাদা আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারে। ওরা দেখেছেন, হাসি-হাসি মুখে দেড়-দিনের শিশুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যদি কেউ নিজের মুখটাকে হঠাৎ গম্ভীর কিংবা কাঁদো কাঁদো করে তোলেন, শিশুটির মুখের ভাবও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায়।

শিশুরা বড়দের অনুকরণ করে কেন?

ছোটরা দেখা যায় বয়স্কদের অনুকরণ করে।

কিন্তু এর কারণ কী?

বিজ্ঞানের যৌক্তিক ব্যাখ্যায় এর বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, ...

শিশু-মনস্তত্ত্ববিদ জ্যঁা-পিয়াজের ধারণা ছিল, আট থেকে বারো মাস বয়সের মধ্যে শিশুরা প্রথম বাবা-মা এবং অন্যদের আচার-আচরণকে নকল করা শুরু করে। পরবর্তীকালে অ্যান্ড্রু মেলটফ্ এবং এম কিথ মুর নামে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই মনোবিজ্ঞানী জ্যঁা-পিয়াজের মতামতকে নস্যাৎ করে দেন। দীর্ঘদিন ধরে নবজাত শিশুদের আচার-আচরণ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ওঁদের ধারণা হয়েছে, বয়স্ক লোকের দেখাদেখি মাত্র ১২ দিনের শিশুও নিজের জিভ বের করতে চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, জন্মের মাত্র ৪২ মিনিট পরেই একটি শিশুর মধ্যে বড়দের অনুকরণ করার চেষ্টা লক্ষ্য করেছিলেন তাঁরা।

বড়দের নকল করার মধ্য দিয়ে শিশু সামাজিকভাবে প্রথম পাঠ নেয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বাবা-মায়ের আচরণ, অঙ্গভঙ্গী এমনকি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোও ফুটে উঠতে থাকে। শৈশবাবস্থায় ছেলেরা সাধারণতঃ তাদের বাবা এবং মেয়েরা তাদের মার সঙ্গে একাত্মবোধ করে থাকে।

মায়ের গুণের প্রশংসা হলে মেয়ের চোখে-মুখে খুশি উপচে পড়ে— যেন তার নিজেরই প্রশংসা হচ্ছে। ছেলের বেলায়ও বাবার ক্ষেত্রে একই অনুভূতির প্রকাশ পায়। আবার একটা ছোট ছেলে যখন সামনে খবরের কাগজ মেলে ধরে পড়ার ভান করে তখন সে আসলে মনে মনে নিজেকে বাবার জায়গায় বসিয়ে দেয়। শৈশবের প্রথম এক-দেড়টা বছর কেটে যাওয়ার পরে শিশু যত বড় হয়, বাবা-মার পাশাপাশি আশেপাশের বয়স্ক মানুষ—তা সে চাচা-চাচি, দাদা-দাদি, নান-নানিই হোন আর শিক্ষক-শিক্ষিকা হোন—তাঁদের হাব-ভাব, আচার-আচরণকে অনুকরণ প্রিয় করে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই শিশুরা তাদের পছন্দসই মানুষদেরই অনুকরণ করে। ওদের এই অনুকরণ-স্পৃহা ফুটে ওঠে। ওদের কথাবার্তা, হাঁটা-চলা এমনকি হাতের লেখার

www.pathagar.com

ভঙ্গিমাতেও তাই হয়। অন্যকে অনুকরণ করতে করতে শিশু যখন কৈশোরে এসে পৌছোয় তখনই তার মধ্যে নিজেকে অন্য সকলের কাছ থেকে আলাদা করে নেওয়ার, নিজেকে নিজের মত করে গড়ে তোলার তাগিদ প্রথম দেখা দেয়। সামাজিক দিক থেকে বড় হয়ে ওঠার প্রথম ধাপটা তখন সে পেরিয়ে আসে।

শিশুর মুখে ভাষা ফোটে কীভাবে?

শিশুর মুখে ভাষা ফোটে, আমরা সবাই জানি। কিন্তু সে-ভাষা সঠিক ফোটে কেমন করে? বিজ্ঞানের যৌক্তিক ব্যাখ্যায় চলে যাচ্ছি—

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন—আমরা যখন কোনো ভাষা আয়ত্ত করি, তখন সেই আয়ত করার ব্যাপারটা ঘটে ধাপে ধাপে, আমাদের মানসিক বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে। জন্মাবার পরে মাস চারেক পর্যন্ত একটি মানব শিশুর ভাষা বলতে সম্বল কান্না, চিৎকার কিংবা অর্থহীন কিছু আওয়াজ। সাধারণতঃ পাঁচ মাস বয়সে শিশু কিছু কিছু ধ্বনির পুনরাবৃত্তি করতে শেখে। যেমন—দা-দা-দা কিংবা মাম-মাম-মাম, লা-লা-লা ইত্যাদি উচ্চারণ—এভাবে জন্মাবার পর প্রায় ছ'মাস বয়স অবধি পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির শিশুরা প্রায় একই ধরনের আওয়াজ বা শব্দ করে থাকে। শিশু মনস্তাত্ত্বিকদের মতে, শিশুরা তাদের ৮ থেকে ১০ মাস বয়সের মধ্যে কিছু কিছু শব্দের মানে বুঝতে শেখে। তাদের সামনে যখন কেউ কোনো কথা বলে তখন সেই কথাগুলোর মধ্য থেকে শিশুরা তাদের পরিচিত শব্দগুলোকে আলাদা করতে পারে। ভাষা আয়ত্ত করার এটাই হল শিশুদের প্রথম ধাপ। এই বয়সটায় শিশু যে—ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে, সেটা অন্যদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে। যেমন—দুধের বোতলকে সে হয়তো প্রতিবারই বলবে 'দা-দা'।

সাধারণতঃ এক থেকে দু'বছর বয়সের মধ্যে শিশু সঠিকভাবে অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করতে শেখে। তবে এক বা দু'য়ের বেশী শব্দ সে একবারে উচ্চারণ করতে পারে না। যেমন—শিশুটিকে হয়ত বলতে বলা হল, 'আমার বাবা বাড়ী নেই।' শিশুটি বলবে, 'বাবা নেই'। দেখা গেছে বড়দের কথাগুলোর সঠিক উচ্চারণ করতে না পারলেও বছর দু'য়েক বয়স থেকেই শিশু মোটামুটিভাবে ব্যাকরণ মেনে কথা বলে। মনোবিজ্ঞানীদের একদল বলে থাকেন, পৃথিবীর সব ভাষাভাষী শিশুরাই যে একেবারে ছোট বেলাতেই ব্যাকরণ মেনে কথা বলতে শেখে, সেটা সম্ভব হয় তাদের জন্মগত বিশ্লেষণ-শক্তির জন্য। আবার ভাষা আয়ত্ত করার পেছনে দৈনন্দিন অভ্যেসের বড় সড় ভূমিকা থাকতে পারে বলে বহু বিশেষজ্ঞের ধারণা। ইংরেজিতে একেই বলে 'অপারেন্ট কন্ডিশনিং' (Operant conditioning) অর্থাৎ, ছ'-সাত

www.pathagar.com

মাস বয়সে শিশু যখন মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য আওয়াজ করে, বাবা-মা কিংবা আশে-পাশের অন্য কেউ তখন তার দিকে নজর দেন বা সেই আওয়াজকে নকল করেন। এর ফলে শিশুটির মধ্যে আওয়াজ করার ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা আসে। এটাকে বলা যায় ভাষা আয়ত্ত করার প্রাক-পর্ব। এর পরের ধাপে, আরও কয়েক মাস পরে হয়তো বাবা-মা তাদের শিশুর সামনে একটা বই রেখে বললেন, 'বই'। এ ভাবে কয়েক বার বলার পরে শিশুটিও এক সময়ে বলল, 'বই'। শিশুটি ঠিক ঠিক বলতে পেরেছে দেখে বাবা-মা হয়তো তার গাল টিপে আদর করলেন কিংবা হাসলেন। শিশুটির কাছে এটা তার সাফল্যের পুরস্কার। এই পুরস্কারটা সে পেল বলেই শিশু বার বার 'বই' শব্দটা বলতে থাকল, বার বার 'বই' শব্দটা বলতে থাকলে এবং 'বই' শব্দটা তার আয়ত্তে এসে গেল।

এভাবেই শিশুদের মুখে ভাষা ফোটে।

কোন বৈশিষ্ট্যের ফলে মানুষ কথা বলতে পারে?

আমরা কথা বলি। কিন্তু কোন্ বৈশিষ্ট্যের জোরে কথা বলতে পারি তা জানা আবশ্যক।

আমাদের কথা বলার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ভূমিকাই সবচেয়ে বড়। কিন্তু শরীরের আরও কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন কণ্ঠনালী, বুকের মাংসপেশী, মুখগহ্বর, জিভ, ঠোঁট—এ সবের ভূমিকাও নেহাত কম নয়। খুব চড়া সুরে গান গাওয়া বা কথা বলার সময়ে আমাদের কণ্ঠনালীর মুখটা সরু হযে আসে। আর ফিস ফিস করে যখন কথা বলি তখন কণ্ঠনালীর ফাঁকটা থাকে বড়। স্বরবর্ণ উচ্চারণের সময়ে কণ্ঠনালী ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ কিছু করার থাকে না। আবার ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের সময়ে কণ্ঠনালী থেকে বেরিয়ে আসা বাতাসকে ধাক্কা দেয় জিভ আর ঠোঁট।

জিভের নড়াচড়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখে মস্তিষ্কের যে বিশেষ অংশটি তার নাম 'ব্রোকার' অঞ্চল। যে-বিজ্ঞানী প্রথম প্রমাণ করেছিলেন, মস্তিষ্কের এক বিশেষ অংশ আমাদের সবাক রেখেছে, তাঁরই নামে ওই বিশেষ অঞ্চলটির নাম রাখা হয়েছে।

মনুষ্যেতর কোনো প্রাণীর মস্তিষ্কে এই বিশেষ অঞ্চলটির সন্ধান মেলেনি। অথচ দীর্ঘ প্রশিক্ষণের পরে একাধিক ক্ষেত্রে শিম্পাঞ্জীরা মানুষের ভাষা অল্পস্বল্প আয়ত্ত করতে পেরেছ। সে-জন্যেই একমাত্র 'ব্রোকা'র অঞ্চলই আমাদের কথা বলতে সাহায্য করে, এমন সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

ভাষা আয়ত্ত করার পেছনে স্মৃতি, অর্থাৎ মনে করা বা মনে রাখার একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কাকাতুয়া বা ময়নার জিভ এবং কণ্ঠনালীর গড়ন-গঠন এমনই যে, তারা সময়ে সময়ে মানুষের কথাকে হুবহু নকল করতে পারে; কিন্তু তাদের স্মৃতি অত্যন্ত দুর্বল বলে ভাষা আয়ত্ত করা তাদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব।

কথা বলতে পারার পেছনে স্মৃতি ছাড়াও যুক্তি-বুদ্ধি এবং চিন্তা-ভাবনারও একটা দিক আছে। এ-সবকে হিসেবে আনলে, মানুষের কথা বলতে পারার পেছনে তার মস্তিষ্কের বেশ কয়েকটি অঞ্চলের বিশেষ ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মস্তিষ্কের সামনের অংশ মানুষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উন্নত বলে ভাষা আয়ত্ত করার মূল চারিকাঠিটি রয়েছে মস্তিষ্কের এই বিশেষ অংশেই।

গবেষণাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এখনো অবশ্য এটা পুরোপুরি সত্যি বলে প্রমাণিত হয়নি।

বিজ্ঞানীদের এক দলের মতে, ভাষা আয়ত্ত করার কৌশলটি মানুষের জন্মসূত্রে পাওয়া। কোন ভাষা সে কতটা আয়ত্ত করবে সেটা অবশ্য পরিবেশের ওপরেও বেশ খানিকটা নির্ভর করে। সে-পরিবারে বয়স্করা নিজেদের মধ্যে কম কথাবার্তা বলেন, সেখানে শিশুরা দেরিতে কথা বলতে শেখে। আবার এটাও লক্ষ্য করার মত যে, একটা শিশু যত তাড়াতাড়ি একটা ভাষাকে আয়ত্ত করতে পারে ঃ একজন পূর্ণবয়স্ক লোক তত তাড়াতাড়ি তা পারে না।

সব মানুষের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ কি এক রকম?

পৃথিবীতে নানান ধরনের, নানান জাতের মানুষ রয়েছে। এক এক মানুষের ক্ষেত্রে আবেগ-অনুভূতি কি এক এক রকমের? বিজ্ঞানের যৌক্তিক ব্যাখ্যায় কি বলে—সেটা আগে দেখা যাক।

আবেগ-অনুভূতির ব্যাপারে মানুষে মানুষে খুব একটা তফাৎ না থাকলেও তার বহিঃপ্রকাশ এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকমের হয়ে থাকে।

অহংকারে আঘাত লাগলে, অন্যের কাছে হেয় হয়ে গেলে আমরা সাধারণতঃ কম-বেশী রেগে যাই। তেমনি প্রিয়জন আমাদের ছেড়ে চলে গেলে কার না কষ্ট হয়? অতিরিক্ত আবেগের সময়ে আমাদের প্রায় সকলেরই চেতনা কোনো বিষয়ে আবদ্ধ থাকে বলে পারিপার্শ্বিক জগতের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। আমাদের কাছে সময়ে সময়ে আবেগ যে বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে ফেলে সেটাও আমরা কে না অনুভব করি?

www.pathagar.com

তবে বিশেষ ধরনের আবেগ বা অনুভূতিতে সবাই একই রকম আচরণ করবে, এমন কথা নেই। শুধুমাত্র মুখের ভাবভঙ্গি দেখে কোনো মানুষের রাগ, দুঃখ না আনন্দ হয়েছে, তা বোঝাও বেশ মুশকিল। মুখের ভাবভঙ্গি দেখে কোনো মানুষের বিশেষ কোনো আবেগকে চেনা যায় কিনা তা জানার উদ্দেশ্যে এখন থেকে অনেক বছর আগে এক মজার পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। কিছু মানুষকে গান শুনিয়ে অ্যামোনিয়া শুঁকিয়ে, হাতের ওপর ব্যাঙ ছেড়ে দিয়ে, বৈদ্যুতিক শক দিয়ে এবং আরও নানা উপায়ে আনন্দ, বিরক্তি, ভয় ইত্যাদি নানা ধরনের আবেগ সৃষ্টি করা হয়। পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে প্রত্যেকটি মানুষের মুখের বিভিন্ন অংশে কতকগুলো কালো দাগ দেওয়া হয়েছিল এবং আবেগের মুহূর্তগুলোতে তাদের মুখের ফটো তোলা হয়। পরে ওই সব ফটো বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, একই ধরনের আবেগে বিভিন্ন মানুষের মুখের পেশীগুলো বিভিন্ন ভাবে কুঁচকেছে। ফলে প্রত্যেকটি মানুষের মুখের ওপর যে কালো দাগগুলো দেওয়া হয়েছিল তাদের পারস্পরিক দূরত্ব এক এক জনের ক্ষেত্রে এক এক রকম দাঁড়িয়েছে।

মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে শিম্পাঞ্জীদের নিয়েও একই ধরনের পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। তাতেও দেখা গেছে, মানুষের মত শিম্পাঞ্জীদের আবেগের বহিঃপ্রকাশও এক এক জনের ক্ষেত্রে এক এক রকম।

শুধু কি মুখের ভাবভঙ্গি? রাগের সময়ে কারোর কথা আটকে যায়, কারো বা মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়, কারো চোখের রঙ হয়ে ওঠে টকটকে লাল।

আবার কোনো লোকের মুখের ভাবভঙ্গি দেখে বোঝাই যায় না, সে হাসছে, না কাঁদছে। সেই কারণেই মানুষের অঙ্গভঙ্গি, আচার-আচরণ দেখে আবেগের স্বরূপটিকে চিনে নেওয়া মোটেই সহজসাধ্য নয়।

এক আদর্শ মহাপুরুষের কথা

পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের জন্ম হলেও সকল মানুষের কর্ম এক নয়। কেউ মানব সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেও আত্মতৃপ্ত হতে পারেন না। তার পরেও অনেক কিছুর সন্ধান করে থাকেন।

পরের শোকে কাতর, অপরকে ভালবেসে আপন করে নেয়া। দুঃখ-দুর্দশায় পাশে দাঁড়ানো এবং সার্বক্ষণিকভাবে সাহায্য করা এ বৈশিষ্ট্যের মানুষ জগতে খুবই কম। আর তাদেরই একজন হলেন মৌলভী মুহাম্মাদ তমিযুদ্দীন (রহঃ)। ট্যাক্সের

www.pathagar.com

হাটের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ছোট একটি পল্লী তালপুকুর নামক স্থানে তার জন্ম হলেও রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার অন্তর্গত ৮ নং রামনাথপুর ইউনিয়নের রহমতপুর গ্রামেই তাঁর বাল্য, যৌবন ও শেষ জীবন অতিবাহিত হয়।

এক সুন্দর ব্যক্তিসত্তার মাধ্যমে দুঃখ-কষ্টকে ভেদ করে তিনি সকলের সেবা করতেন, সকলকে ভালবাসতে এগিয়ে এসেছেন সারাটি জীবন। এর জন্য তাঁকে অবমাননা ও গঞ্জনার গ্লানিও টানতে হয়েছে; তবুও তিনি পিছপা হননি। পদে পদে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে নানা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে মহত্ত্ব অর্জন করেছেন।

বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক অজোপাড়া গাঁয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি; পরেছিলেন এক মাটির কাঁফন।

স্নেহ-ভালবাসার পাহাড় রচনা করে গেছেন তিনি সবার মাঝে; যার স্মৃতি সকলের হৃদয়ে ভাসমান হযে আছে।

কোনো ভেদাভেদ; কোনো মতবাদ ছাড়াই তিনি অকাতরে সকলকে ভালবেসে গেছেন। শুধু তাই নয়। আপন খেয়াল করার সময়ও তার জোটেনি।

পরের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে নিজেকে বিসর্জন দেওয়ার মাঝেই তিনি আত্মসুখ খুঁজে গেছেন তাঁর সারাটি জীবন। তাঁর সকল কাজের মূলে ছিল মানব সেবা। মানব সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীবের সান্নিধ্য লাভের আশায় কেটেছে তাঁর সমস্ত জীবন।

আর এ দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তিনি নেদায়ে ইসলামের একজন সেবক হয়ে। চাঁদপুর জেলার আল ওয়াইসীয়া ফরাযী কান্দীতে এর অবস্থান। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে নেদায়ে ইসলাম শিরোনামের অনেকগুলো অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান।

ফরাযী কান্দীই সকল প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল। জাতীয় ভিত্তিক নিবন্ধীকৃত, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান ও কৃষিভিত্তিক উচ্চ শিক্ষার একটি আধুনিক অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যা নেদায়ে ইসলাম সেবা সংস্থার অন্তর্ভুক্ত। যার প্রতিষ্ঠাতা ও স্বপ্নদ্রষ্টা ইমামুত ত্বরীক্বাত হযরত আল্লামা শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মদ বোরহানুদ্দীন উয়েসী (রাঃ)।

বর্তমানে পরিচালনা করছেন তাঁরই সুযোগ্য রূহানী সন্তান পীরে কামেল হযরত আল্লামা শায়খ মানযূর আহ্মাদ, আল-আহ্মাদী, উয়েসী, রেফায়ী (পি. এইচ. ডি. গবেষক) তাঁরই সংস্পর্শে একান্ত সহযোগিতায় মৌলভী মুহাম্মদ তমিযুদ্দীন (রহঃ) প্রতিষ্ঠা করেছেন মাদ্রাসা, হেফজখানা, এতীমখানা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, পোস্ট অফিস ও মৎস চাষসহ জনকল্যানমূলক অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান। তার পরিকল্পনা ছিল নেদায়ে ইসলাম শিরোনামের আওতায় ১৭টি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান চালু করবেন। সে

www.pathagar.com

উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন তিনি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বর্তমানে দাখিল মাদ্রাসা, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মৎস চাষ এগুলো চলছে আর বাকী সবগুলো মঞ্জুরীকৃত হলেও স্থগিত আছে।

অবশ্য কোনো এক সময় শত শত ছাত্র ছিল হেফজ খানায়। মক্তবে পড়তে আসতো গ্রামের সকল ছেলে মেয়ে। তাদের কলরবে পরিপূর্ণ ছিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ।

প্রায় হাজার ছাত্রের সমাগম ছিল মাদ্রাসা, এতীমখানা ও হেফজখানায়। শরীর চর্চার কেন্দ্র হিসেবে পি. টি প্যারেড চালু ছিল। সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল সাথে বহু পরিকল্পনাও প্রণয়ন করা হয়েছিল।

দেশের বিভিন্ন জেলার ছাত্ররা পড়তে আসতো এই রহমতপুর গ্রামের মাদ্রাসা, এতিমখানা ও হেফজখানায়। বাড়ীতে বাড়ীতে লজিং-এর প্রচলন ছিল বেশ। তখনকার জীবনযাত্রার মান ছিল অনেক নিচু কিন্তু তবুও আলোর জাগরণ উঠেছিল সেখানে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা ছাত্রের সংখ্যা দু'চার গ্রামে তেমন ছিল বলে আমার জানা নেই। থাকলেও তার সংখ্যা অতি নগণ্য। অন্ধকারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত পল্লী ছিল পুরো অঞ্চল। স্বাভাবিকভাবে মানুষগুলোও ছিল তার আওতায়। এসব মানুষকে আলো দেখাতে; আলোর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন যে মানুষটি দিনের পর দিন রাতের পর রাত অঘাত পরিশ্রমের দ্বারা ভবিষ্যৎ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পথ তৈরী করতে উন্নত সমাজ গঠন করতে; ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে যিনি আপন সংসার ভুলে সার্বক্ষণিক সময় প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যয় করেছেন তিনিই হলেন নিঃস্বার্থ, নির্ভীক মানব প্রেমিক মৌলভী মুহাম্মাদ তমিযুদ্দীন (রহঃ)।

বিনিময়ে তিনি কারো কাছে কিছু চাননি। চেয়েছেন সকলের ভালবাসা আর চেয়েছেন আলোর সন্ধান দিতে; কিন্তু স্বার্থপর মানুষগুলো তার ঘোর বিরোধিতা করেছেন। বিভিন্নভাবে তার কার্যক্রম বন্ধ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা নয়, বরং নিজের সঙ্গে নিজেরাই প্রতারণা করেছেন। যার ফল এখন ভোগ করছেন।

শেখ বোরহানুদ্দীন (রাঃ) প্রতিষ্ঠিত ডঃ আল্লামা শায়খ মানযুর আহ্মাদ পরিচালিত ওয়াইসীয়ান সৈনিক হয়ে নেদায়ে ইসলাম (শান্তির ডাক)-এর পতাকাতলে লোকদের আহ্বান করতে গিয়ে পাগল নামের গঞ্জনা আর অবমাননার শিকার হয়েছেন বহুবার এই মহান মানুষটি। তবুও আশা ছাড়েননি। মোর্শেদ ক্বিবলার নজর ছিল তার প্রতি। এমন লোক আমার চোখে কখনো পড়েনি। মাটির মত মন। কোনো ক্রোধ, কোনো মোহ, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার এসবের কিছুই ছিল না তার মাঝে।

প্রচলিত স্বার্থান্বেসী মতবাদকে হজম করে তিনি এক সময় নেদায়ে ইসলামের জাগরণ ঘটিয়েছিলেন পুরো রংপুর অঞ্চলের আনাচে-কানাচে। যার স্মৃতি এখনো

www.pathagar.com

বর্তমান। সরদারনী বুড়ীর সম্পত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত সকল প্রতিষ্ঠান। তাই সরদারনী বুড়ীর মাদ্রাসা নামেও এর সুনাম ছিল বেশ। বাৎসরিক মাহফিল হত জাঁকজমক ভাবে। এক নামে সবাই চিনত এ মাদ্রাসাকে। দলে দলে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন মাহফিলে অংশ নিতেন।

আবার এখানকার লোকজন দলবেঁধে চলে যেতেন চাঁদপুরের আল-ওয়াইসীয়া ফরাযী কান্দীতে বাৎসরিক মাহফিলে যোগদানের জন্য।

জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাসে বিশ্বাসে নেদায়ে ইসলাম নামটি উচ্চারণ করেছিলেন তিনি। বাৎসরিক মাহফিল, হাফেজের বেতন, প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার ও কিছু এতিম ছাত্রদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ এসবের ব্যয় নির্বাহ করার জন্যেই বদরগঞ্জ থানার প্রতিটি ইউনিয়নে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অনেকেরই তা সহ্য হত না। যিনি রাতদিন পরিশ্রম করে দূর-দূরান্ত থেকে সাহায্য এনে প্রতিষ্ঠানের উন্নতির ও এলাকার উন্নয়নের কথা ভেবেছেন ঠিক সেই মুহূর্তে স্বার্থপর মহল ভেবেছিল অন্য কথা, তমিযুদ্দীন এসব কেন করছেন? তার নাম ছড়িয়ে পড়ছে। তার স্বার্থ উদ্ধার হচ্ছে ইত্যাদি নানান মন্তব্যে লিপ্ত থাকতেন।

অথচ যিনি এসব করেছেন। সেই মানুষটি কখনও নিজের স্বার্থের দিকে তাকাননি। নিজ সংসার ও ভালমন্দ নিয়ে কখনো ভাবেননি; যাদের জন্য এসব করতেন বরং তারাই নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের কথা ভাবতেন। আর তারাই মুখে মুখে উচ্চারণ করতেন ভিক্ষা উপাধী। তাদের থেকেই ক্রমে ক্রমে মৌলভী মুহাম্মাদ তমিযুদ্দীন (রহঃ) নাম ছড়িয়ে পড়ল ভিক্ষা মৌলভী হিসেবে কিন্তু এ মানষটি কখনই তার প্রতিবাদ করেননি বরং নিজেকে এ পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেছেন।

এ রকম বৈশিষ্ট্যের মানুষ দ্বিতীয়টি আছে বলে আমার জানা নেই। আশ্চর্য এ মানুষটির চাল-চলন, আচার-আচরণ, ভাব-ভঙ্গিমা সবই ছিল অদ্ভুত ধরনের। রাস্তায় বের হলে তার অপরিচিত কেউ নেই। সালাম দিয়ে আর ছালামের জবাব দিয়ে কুশল বিনিময় করতেই দূরত্বের তিনগুণ সময় ব্যয় হত। তবে অল্প সময়ে অধিক কাজ করতেন তিনি। কেন জানি পুরো এলাকা জুড়ে তাকে দেখা যেত। আমার স্পষ্ট মনে আছে। একদিন পাশের গ্রামে গিয়ে তাকে এক বাড়ীতে দেখতে পেলাম। আবার বোনের বাড়ীতে গিয়ে দেখি সেখানেও তিনি। অল্প সময়ের ব্যবধানে রাস্তায় এক বন্ধুর কাছে শুনতে পেলাম তিনি নাকি তাদের বাসায়ও গিয়েছিলেন। আবার বাজারে গিয়ে সেখানেও সেই মানুষটিকে দেখে আমার কম্পিউটার ম্যানের মত মনে হল। খুবই ভাবনায় পড়লাম। এত সিনসিয়ার সূক্ষ্ম প্রকৃতির মানুষ আর কখনো দেখিনি। শুধু আমি কেন? হাজার মানুষের মনে একই প্রশ্ন জমে আছে। কিন্তু এ উত্তরটি একান্তই তার কাছে যিনি মৌলভী মুহাম্মাদ তমিযুদ্দীন (রহঃ)।

www.pathagar.com

এত বড়, এত পরিষ্কার মনের অধিকারীও কখনও চোখে পড়েনি। মনে হয় মহান আল্লাহ তাঁকে আলাদা মাটি দিয়ে গড়েছেন। নইলে তাঁর সমস্ত কিছুই সকলের থেকে আলাদা কেন?

রক্ত গোস্তের মানুষ যে এত নম্র এত ভদ্র! এত মহৎ ও চরিত্রবান আদর্শে জীবন্ত হতে পারে তা জীবনে প্রথম দেখেছি।

আমাকে খুব ভালবাসতেন তিনি। তাঁর কথাগুলো মিষ্টি মধুর লাগত। ডাঙ্গাপাড়ার মেইন রোডের ধারে তাঁর একটি দোকান ছিল। কত ছেলে মেয়েকে আদর করে কত খাবার বিলাতে দেখেছি তার হিসেব নেই। অনেক সময় বাড়ী থেকে ভাত পাঠালে, নিজে না খেয়ে মেহমানের অপেক্ষায় বসে থাকতেন। কখন কে আসবেন রাস্তা দিয়ে তাকে খাইয়ে তিনি আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন।

এভাবে প্রায় দিনই তাকে মেহমান সঙ্গে নিয়ে খেতে দেখেছি। পরিচিত কেউ সামনে পড়লেই হয়েছে। তাকে না খাইয়ে আর ছাড়ছেন না। বাধ্য হয়ে খেতেই হয়। শুধু এখানেই নয়। বহুদিন তার বাসায় গিয়ে দেখেছি মেহমান। এভাবে প্রতিদিন কারো দেখা হলে কাকুতি-মিনতি করে বাসায় নিয়ে যেতেন। নিজে না খেয়ে হলেও তাকে মেহমানদারী করাতে ব্যস্ত থাকতে দেখতাম।

বাসায় উপস্থিত কিছু না থাকলে স্ত্রী হঠাৎ মেহমান দেখে রেগে গেলে তিনি বলতেন কেন, আমার খাবার আছে না বরং আমি খাব না সেগুলো দিয়েই মেহমানদারী করতেন। দোকানে বসলেও একই অবস্থা করতেন। কাউকেই কিছুতে না করতে পারতেন না। ইচ্ছেমত যে যা চাইত তাই দিতেন। হয়ত বাকিতে আবার মুশকিল ব্যাপার হল টাকাও চাইতে লজ্জা পেতেন। কত টাকা কতজনে দেননি তারও হিসেব নেই। কারণ টাকার অঙ্কটা কম হলে খাতায়ও লিখতেন না। কেমন করে যে তার সংসার চালাতেন সে চিন্তাই আমি করতাম। আবার মানুষটিই বা কি করে এসব সামলিয়ে চলতেন। আশ্চর্যের বিষয় হল তার অপরিচিত এমন মানুষ কখনো আমি দেখিনি। লাখো লাখো মানুষ এক নামে তাকে চিনতেন।

রহমতপুরের মানুষ এই মহান মানুষটিকে চিনতে পারেননি। তার স্বপ্ন ছিল নেদায়ে ইসলাম শিরোনামের ১৭টি প্রতিষ্ঠান এখানে চালু করবেন কিন্তু একান্তভাবে কেউ এগিয়ে আসেননি। যে দু'চারজন এসেছেন তারাও অনেক সময় স্বার্থের কথা ভাবতেন আবার টিকতে পারেননি বরং তারাই এ মানুষটিকে এক সময় অবমূল্যায়ন করেছেন। সরে গিয়েছেন কার্যক্রম থেকে। নইলে যে জাগরণ উঠেছিল। যে শিক্ষার বিকাশ ঘটতে শুরু করেছিল সেখানে, আজ হয়ত নতুন সভ্যতা তৈরী হত। শিক্ষার আলো জ্বলত। ইসলামী শিক্ষার বিস্তার লাভ করত।

www.pathagar.com

এত বড় একজন সেবকের নাম মুছে যেতে দেয়া যায় না। যার প্রতিটি নিঃশ্বাসে-বিশ্বাসে মানুষের ভালবাসা ও এক সুমহান আদর্শের ছাপ ফুটে উঠেছিল সারাটি জীবন। আজ তিনি প্রশংসার উর্ধ্বে।

রহমতপুরের সেই মহান মানুষটি আর নেই। সকলের হৃদয়কে খালি করে চলে গেছেন তিনি পরজগতে। সেদিনের সেই জনপদও আর নেই। আছে তার স্মৃতি বিজড়িত প্রতিষ্ঠানগুলো। যদি সময় হয় তাঁর মাযারে গিয়ে সালাম দেয়ার আমন্ত্রণ রইল। রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার অন্তর্গত ট্যাক্সের হাটের উত্তরে চৌরাস্তা থেকে ২০০ গজ সামনেই মেইন রোডের পাশে মৌলভী পাড়া নামক নতুন গ্রামে শুয়ে আছেন তিনি। ১৯৯৪ সালে তার নতুন বাসভবনে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং এখানেই তাকে কবরস্থ করা হয়।

তাঁর জানাযায় এত লোকের উপস্থিতি ছিল যে, প্রত্যক্ষ দর্শীরা বলেছেন, তাদের জীবনে কখনো কারো জানাজায় এত মানুষের উপস্থিতি দেখেননি আর এত মানুষের ভালবাসার নজীরও কোনোদিন পাননি। যা মাওলানা মুহাম্মাদ তমিযুদ্দীন (রহঃ)-এর জীবনে ঘটেছিল। শ্রেষ্ঠ সেবক হিসেবে তিনি নেদায়ে ইসলাম কর্তৃক মরোনোত্তর পদক পেয়েছেন। আর তাই হয়ত কবি তাঁর প্রেমে মত্ত হয়ে রচনা করেছেন—

শ্রেষ্ঠ সেবক

নেদায়ে ইসলামের অগ্র সৈনিক
শান্তির আহ্বানে ভাই,
তমিযুদ্দীন শ্রেষ্ঠ সেবক
মানব সেবায় তাই।

যেদিন হতে সামিল হল
ওয়াইসীয়ানদের দলে,
আহ্বান করল চলে এসো সবাই
শান্তির পতাকাতলে।
অনেকেই তারে পাগল বলল
শুনল না সে কথা,
মানব প্রেমিক মহান সেবক
তবুও পায়নি ব্যথা।

www.pathagar.com

বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে
চলল আপন পথে,
সেদায়ে ইসলাম পৌছে গেল
নিত্য নতুন দিকে।

হাজার মনের মধ্যমণি
ইহ জগতে নাই,
সকলের মনে ঝড় তুলে সে
স্বর্গে দিলেন ঠাঁই।

সুন্নতি লেবাস, ওয়াইসীয়ান টুপি
থাকতো সারাটা দিন
ব্যস্ত সদাই মত্ত্ব সেবক
আল্লাহ-রাসুলের দ্বীন।

হাজার মানুষের হৃদয় মাঝে
ঠাঁই করেছিলেন তিনি,
আজকে সেথায় হাহাকার উঠেছে
সাহারার মরুভূমি।
ঘুমিয়ে আছেন ট্যাক্সের হাটের
মেইন রোডের পাশে,
মৌলভী পাড়া নতুন গ্রামে
তার নাম মিশে আছে।

একবার হলেও দেখতে এসো
তার মাযারটাই
এমন পাগল মানব প্রেমিক
হয়তো কোথাও নাই।

নেদায়ে ইসলাম মূলতঃ 'খেদমাতে খালক; খেদমাতে খোদা, অর্থাৎ 'সৃষ্টির সেবাই স্রষ্টার সেবা,' মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী।

www.pathagar.com

হয়তো নেদায়ে ইসলাম সম্পর্কে আপনার জানতে ইচ্ছে করে। আসলে নেদায়ে ইসলাম সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই। ১৯৪৯ সাল থেকে শুরু হয় নেদায়ে ইসলামের সেবামূলক কার্যক্রম। চাঁদপুরের আল-ওয়াইসীয়া ফরাযী কান্দী কমপ্লেক্স এর মূল ক্যাম্পাস। ঢাকায় পরিচালিত শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসহ অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত এ সংস্থা সমগ্র বাংলাদেশসহ বহির্বিশ্বেও এর কার্যক্রম বর্তমান। ডঃ আল্লামা শায়খ মানযূর আহ্‌মাদ (পি. এইচ. ডি. গবেষক) এ কার্যক্রমের চেয়ারম্যান।

একজন মানুষ হিসেবে আপনাকে জানতে ইচ্ছে করে। আপনি নিজেকে কতটুকু জানেন?

আপনি তরুণ, যুবক ও বলিষ্ঠ চেতনার অনুরাগী। নেদায়ে ইসলাম আপনাকেই খুঁজছেন।

নেদায়ে ইসলামের রয়েছে সুদূর প্রসারী বিজ্ঞান ও গবেষণামূলক কার্যক্রম। নেদায়ে ইসলাম রিচার্স সেন্টার। এখানে রয়েছে ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র, ফরাযী কান্দী ওয়াইসীয়া আলীয়া মাদ্রাসা। মহিলা মাদ্রাসা, জিলানীয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল। পীর প্রফেসর আব্দুল খালেক মেমোরিয়াল লাইব্রেরী। এতিমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিং। পরিকল্পনায় রয়েছে আল ওয়াইসীয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

নেদায়ে ইসলাম যুব সংস্থায় যোগ দিয়ে আপনিও এ কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেন।

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত বই সমূহ-

আপনার রূপ, প্রসাধন ও ডায়েট
প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ
দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন
Word Book
ইংরেজি শিখতে 2000 Words
৪৫ দিনে ইংরেজী শিক্ষা
৩৩ দিনে ইংরেজী শিক্ষা
মাত্র ৩ সপ্তাহে ইংরেজী শিখুন
৬০ দিনে আরবী শিক্ষা
যোগ ব্যায়াম
মেয়েদের ব্যায়াম
মালয়েশিয়া ভাষা শিক্ষা
কোরিয়ান ভাষা শিক্ষা
হিন্দি-বাংলা স্পীকিং কোর্স
সহজ উপায়ে সৌদি ভাষা শিক্ষা
আরবী ভাষা শিক্ষা
ফ্রান্স ভাষা শিক্ষা
ইতালি ভাষা শিক্ষা
জার্মান ভাষা শিক্ষা
সিঙ্গাপুর ভাষা শিক্ষা
চায়না ভাষা শিক্ষা